অবাধ্য শিশু ও শিক্ষা সমস্যা

বিভুরঞ্জন গুহ

অবাধ্য শিশু ও শিক্ষাসমস্যা

শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ, এম্. এ

দর্শন অধ্যাপক: শিলচর গুরুচরণ কলেজ,

প্রাক্তন দর্শন অধ্যাপক: কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ,

শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা,

শিক্ষায় পথিকৃৎ ও যষ্টিমধু প্রণেতা

সরস্বতী লাইব্রেরী

৩২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র

৬, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

আমার সন্তান-প্রতিম
অগণিত ছাত্রছাত্রীর উদ্দেশ্যে

মুখবন্ধ

শ্রীযুক্ত বিভুরঞ্জন গুহ বর্তমানে এই কলেজের অধ্যাপক। দীর্ঘদিন অন্যত্র অধ্যয়ন ও অধ্যপনা কার্যে ব্রতী থাকিয়া অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ কয়েকখানা পুস্তক রচনা করিয়াছেন—বিদ্বৎসমাজে তাহা সমাদৃত হইয়াছে। বর্তমান পুস্তকও তাঁহার স্বভাবগত অধ্যয়ন এবং গবেষণারই ফল—এবং বিদগ্ধ সমাজে ইহাও যথোচিত সমাদর লাভ করিবে, এই বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

আমি মনোবিজ্ঞান বা দর্শনশাস্ত্রে কৃতী নই—এই জাতীয় পুস্তক সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের ন্যায় মতামত দিবার অধিকার আমার নাই। তথাপি বিদ্যাদান যাঁহার ব্রত, তিনি অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যয়নও করিতে থাকিবেন এবং শক্তি থাকিলে গবেষণা বা স্বকীয় মনন-শক্তিদ্বারা নির্ণীত সত্যকে পুস্তকাকারে প্রচার করিবেন—ইহা বর্তমানে এতদ্দেশে বিরল হইলেও সর্বথা কাম্য। শিক্ষাব্রতও অন্যান্য ব্রতের ন্যায়ই জীবনব্যাপী সাধনার দাবি করে—কেবল পরীক্ষার কৃতিত্বের দ্বারাই তাহার উদ্‌যাপন হয় না। সেইজন্য যাঁদেরই এই সাধনায় নিমগ্ন দেখি, তাঁদের প্রতিই আমি শ্রদ্ধা পোষণ করি। এই কয়েকটি ছত্র সেই শ্রদ্ধারই নিদর্শন মাত্র—এই পুস্তকের গুণাগুণ বিচারের অনধিকার চর্চা নহে। ইতি

গুরুচরণ কলেজ, শিলচর
১৭ই ফেব্রুয়ারী,—১৯৫৮

যোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী

নিবেদন

সংসারের আনন্দের একটি প্রধান কেন্দ্র শিশু। সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতির সমস্ত সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি শিশুর সুস্থ বিকাশে। কিন্তু দেহে মনে সমস্ত শিশুই সুস্থ সবল হইয়া গড়িয়া উঠে না। শিশুর দেহ রুগ্ন হইলে পিতামাতা উদ্বিগ্ন হন, সাধ্যমত সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু যে শিশু অবাধ্য, দুষ্ট, অপরাধপ্রবণ তাহাকে নিয়া পিতামাতার মনস্তাপের অন্ত নাই। অপরাধের শাস্তি হিসাবে শাসনপীড়ন শিশুকেও কিছু কম ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও ইহা ভগবানের বিধান বলিয়াই প্রায় মানুষ মানিয়া নিয়াছিল। কিন্তু শিশুমনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দেশ সমূহে শিশুর অবাধ্যতার কারণ অনুসন্ধান এবং তাহার প্রতিকারের চেষ্টা চলিতেছে। এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগের কারণ কিছু দিন যাবৎ আমেরিকা এবং ইউরোপের নানা দেশে শিশুর অবাধ্যতা, মানসিক বিকার, অপরাধপ্রবণতা একটি গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে এ সমস্যা কঠিনতর হইয়াছে। কিন্তু ঐ সব দেশ অদৃষ্ট ও ভগবানে দোষারোপ করিয়া নিচেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে নাই। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুসন্ধান চলিতেছে এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আলোকে ব্যবস্থা অবলম্বনও করা হইয়াছে। আমাদের দেশ এ সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়। অথচ এ বিষয়ে সচেতন হইবার প্রয়োজন আছে। বাংলা ভাষায় এ জাতীয় আলোচনা সামান্যই হইয়াছে। যাঁহারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ তাঁহারা অগ্রণী হইলেই উপযুক্ত হইত। অত্যন্ত অসম্পূর্ণ জ্ঞান লইয়া এ বিষয়ে সামান্য আলোচনায় অগ্রসর হইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। তবে এই বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পরে শিক্ষিত জনসাধারণের বিশেষ উৎসাহ লক্ষ্য করিয়াছি এবং সেইজন্যই সে বিষয়ে প্রবন্ধগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া এবং গত দুই বৎসরের মধ্যে লিখিত ও প্রকাশিত শিক্ষা-সম্পর্কিত অন্যান্য প্রবন্ধগুলি যোগ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশে সাহসী হইয়াছি। মন্দিরা পত্রিকার সহ-সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুত সুধীর রায় মহাশয় আগ্রহপ্রকাশ না করিলে হয়তো এ দুঃসাহস করিতাম না। পিতামাতা, শিক্ষক

ও শিক্ষক শিক্ষণের ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ যদি সামান্য পরিমাণেও এ পুস্তক মিটাইতে সক্ষম হয় তবে আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব। এ পুস্তকের উপাদান বা সিদ্ধান্ত কোন বিষয়েই মৌলিকতা দাবি করি না। যে সমস্ত বিদেশী পুস্তকের উপর নির্ভর করিয়াছি, যথাস্থানে তাহাদের ঋণ স্বীকার করিয়াছি। 'শিক্ষক' ও 'মন্দিরা'র সম্পাদকদের ধন্যবাদ জানাই, তাঁহারা তাঁহাদের পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের অনুমতি দিয়া বাধিত করিয়াছেন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আখতার হামীদ খাঁন্ ও শিলচর গুরুচরণ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী মহাশয় এ বিষয়ে পুস্তকাদি সংগ্রহে অনুমতি দিয়া ও উৎসাহ দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। প্রবন্ধগুলির পুনর্লেখন করিয়া দিয়া কন্যা শ্রীমতী সুমিত্রা গুহ বি-এ, ভাগিনেয়ী শ্রীমতী অনামী বসু ও দুহিতোপমা ছাত্রী শ্রীমতী বীণা ক্ষেত্রী আমার পরিশ্রম লাঘব করিয়াছে; তাহাদের আশীর্বাদ জানাই।

যাঁহাদের আনুকূল্যে ইতিপূর্বে প্রকাশিত শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা (২য় সংস্করণ) ও শিক্ষায় পথিকৃৎ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। আশা করি বর্তমান পুস্তকখানাও তাঁহাদের আনুকূল্য লাভে বঞ্চিত হইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুত সুহৃৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া মহদন্তঃকরণের পরিচয় দিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় টিচার্স ট্রেণিং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত কে. কে. মুখার্জি ও শিলচর গুরুচরণ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত যোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী এই পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহাদের উৎসাহবাক্যদ্বারা এ পুস্তকের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

বিভুরঞ্জন গুহ

৭ জে, এস্. আর. দাস রোড,
কলিকাতা-২৬
মার্চ, ১৯৫৮

অভিমত

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভুরঞ্জন গুহ প্রণীত 'অবাধ্য শিশু ও শিক্ষাসমস্যা' বইখানি পড়ে বিশেষ আনন্দ লাভ করলাম। অবাধ্য শিশুদের শিক্ষাসমস্যা নিয়ে আজ পৃথিবীব্যাপী শিক্ষাবিদদের চিন্তা ভাবনার অন্ত নেই।

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষও ক্রমশঃ হয়ে পড়ছে ধর্মহীন, নীতিবোধহীন,—আর তারই ফলে বিচিত্রধরণের অপরাধ-প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। বলাই বাহুল্য, এই অপরাধ-প্রবণতার অঙ্কুর শৈশবেই দেখা দেয়, অবাধ্য শিশুর সংখ্যাধিক্য ঘটে।

মানবশিশুর এই মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার কথা আজ পাশ্চাত্ত্য মনস্তত্ত্ববিদদের একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। এ দেশেও এই রোগের প্রসার ঘটছে, সুতরাং এ দেশের শিক্ষাবিদদের কাছেও এই জাতীয় আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বড় কম নয়। কাজেই প্রত্যেকটি শিক্ষাতত্ত্বের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে এই পুস্তকখানি যে যথেষ্ট প্রয়োজন সাধন করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আর একটা কথা বলতে পারি যে এইসব অবাধ্য শিশুরা যে শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই সমস্যা সৃষ্টি করছে তাই নয়, পারিবারিক এবং সামাজিক বৃহত্তর ক্ষেত্রেও তা আজ যথেষ্ট জটিলতা সৃষ্টি করছে। এই হিসাবে পুস্তকখানি প্রত্যেক পিতামাতা এবং দায়িত্বশীল নাগরিকের অনেক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে।

ইংরাজীতে অবশ্য এই জাতীয় বই-এর অভাব নেই। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে ব'লে আমার জানা নেই।

জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয়টি লেখকের রচনা-কৌশলে প্রসাদগুণসম্পন্ন সুখপাঠ্য হয়েছে। পৃথিবীর বহু মনীষীর চিন্তাধারা ও কর্মপ্রচেষ্টার বিচিত্র বিবরণ

গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করেছেন, কিন্তু লেখার গুণে তা কোথাও তথ্য-ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি। এই জাতীয় গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যও বিশেষ সমৃদ্ধ হল বলে মনে করি।

কে. কে. মুখার্জি,
অধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং ডিপার্টমেণ্ট ও
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপার্টমেণ্ট অব্ এডুকেশন,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা
১৩ই মার্চ, ১৯৫৮

ভূমিকা

দু'টি মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর সব দেশেই নানারকমের সমস্যার সৃষ্টি হয়েচে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অব্যবস্থা সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা আগ্রহ সহকারে এই সব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেচেন, নানারকম গবেষণা করেচেন, বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা আনবার সূত্র খুঁজেচেন। যদিও সক্রিয় ভাবে আমাদের দেশ যুদ্ধে যোগদান করেনি তবুও বিশ্বব্যাপী এই অনিশ্চয়তার হাত থেকে সে অব্যাহতি পায়নি ; উপরন্তু স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই নতুন ধরণের অনেক সমস্যার উদ্ভব আমাদের দেশে হয়েচে। চারিদিককার বহু রকমের চাপে সাধারণ লোকমাত্রই পীড়িত হয়ে উঠেচে, অসহিষ্ণু হয়ে পড়েচে, যে কোন রকমে এই কষ্টকর অবস্থা অতিক্রম করবার চেষ্টা করচে। সব সমস্যারই যে আশু সমাধান হয়ে যাবে সে আশা করা অবশ্য সমীচীন নয়। কিন্তু তাই বলে অলসভাবে বসে থেকে, যা হচ্ছে হতে দেওয়াও যুক্তিসঙ্গত নয়। তাই দায়িত্বসম্পন্ন লোকমাত্রই পথের সন্ধানে আজ ব্যস্ত হয়ে উঠেচেন।

একটু বিবেচনা করলে এ কথাটা অনুধাবন করা যায় যে সব রকমের সমস্যাই মূলত মানুষের চিন্তা, ভাব, কার্যপ্রণালীর সমস্যা, কাজের ভেতর দিয়ে মানুষের মনই আত্মপ্রকাশ করে। পরস্পরের কাজের অসঙ্গতিই সমাজের সমস্যা। কাজের সঙ্গতি আনতে হলে পরস্পরের মনের ভাব, চিন্তা-ধারা প্রভৃতির সঙ্গতি আনতে হবে, এ কাজ হঠাৎ একদিনে করে ফেলা যায় না। এর জন্যে চাই যাঁরা কাজের নিয়ন্ত্রণ করবেন তাঁদের গভীর চিন্তা এবং নিরলস চেষ্টা, এবং যাঁদের কাজ নিয়ন্ত্রণ করবেন তাঁদের অক্লান্ত সাধনা।

আজকের ছেলেমেয়েরা কাল সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে—এ কথা অনেকেই অনেকবার বলেচেন এবং এর যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে কারুরই বিশেষভাবে চেষ্টা করবার কোন প্রয়োজন হয় না। গ্রন্থকার বিভুরঞ্জনবাবু বিশেষভাবেই এ সত্য উপলব্ধি করেচেন তাই তিনি সব সমাজসংস্কারের মূলে যে সংস্কারের একান্ত প্রয়োজন সেই শিক্ষাসংস্কারের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেচেন।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে আজকের ছেলেমেয়েদের ব্যবহারের ও আচরণের মধ্যে একটা অবাধ্যতার ভাব, তীব্র উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। অনেক সমস্যার মধ্যে এ ব্যাপারটাও ক্রমশই একটা বড় রকমের সমস্যা হয়ে পড়েচে। স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারের মধ্যে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে এই সত্যটি দেশের তরুণ তরুণীরা উপলব্ধি করতে না পারলে, হৃদয়ঙ্গম করতে না শিখলে, সুশৃঙ্খল সমাজ কখনই গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু কেন তারা আজ এ বিষয়ে উদাসীন? কেন তারা যথেচ্ছ ব্যবহারের দ্বারা তাদের নিজেদের অজ্ঞাতসারেই নিজেদের প্রভূত ক্ষতি করচে, সমাজের অমঙ্গল ডেকে আনচে?

এই সমস্যার কথাই গ্রন্থকার তাঁর এই পুস্তকে বিশেষভাবে আলোচনা করেচেন। শিশু কেন অবাধ্য হয়, অপরাধপ্রবণতা তাদের মনে কেন জাগে উদাহরণের সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তিনি বিশদভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেচেন। অপরাধপ্রবণতা সম্বন্ধে যে সমস্ত মূল্যবান তত্ত্ব প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বর্ণিত হয়েছে এবং তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তার অধিকাংশই তিনি এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করেচেন এবং সেগুলির যথোপযুক্ত বিচার বিবেচনাও করেচেন। শিশুর মন কিভাবে গড়ে ওঠে এবং উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে হলে পিতামাতা, শিক্ষক প্রভৃতিদের কতখানি দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় তা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েচেন। অপরাধপ্রবণতা জন্মগত কিনা, অপরাধের গুরুত্বের মাপকাঠি কি, প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা যেমন বিজ্ঞানসম্মত তেমনই মনোরম। পরিশেষে প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় পিতামাতার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের স্নেহের সম্পর্কের তারতম্যের এবং অপরাধপ্রবণতা এ দুইএর মধ্যে যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে—যুক্তি এবং তথ্যের সাহায্যে তা ভাল করেই দেখিয়ে দিয়েচেন। আশাকরি পিতামাতারা এ বিষয়ে অবহিত হবেন এবং অপরাধপ্রবণতার জন্য শুধু ছেলেমেয়েদের দোষ না দিয়ে নিজেদের আচরণের দিকেও একটু দৃষ্টি রাখবেন।

গ্রন্থকার শিক্ষাব্রতী এবং সুলেখক। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর পুস্তক এবং রচনাবলী পাঠ করবার সুযোগ আমার ইতিপূর্বেই হয়েচে। তাঁর লেখা আমি আগ্রহের সহিত পাঠ করি—তার প্রথম কারণ তাঁর লেখার বিষয়বস্তুর

সঙ্গে আমার একটা আন্তরিক যোগ আছে। আর অন্য কারণ হচ্ছে তাঁর সহজ সরল ভাবে গভীর বিষয়ের আলোচনা করবার ক্ষমতা বাস্তবিকই আমাকে আনন্দ দেয়। উপরন্ত তাঁর সব লেখার মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতার সন্ধান পাই যা শিক্ষা সংক্রান্ত সব রচনায় থাকে না।

অপরাধপ্রবণতা সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় লেখা এ ধরণের তত্ত্ব ও তথ্যবহুল বই বোধ হয় আর নেই। শিক্ষাব্রতী, সমাজনেতা এবং অভিভাবক সকলকেই মনোযোগের সঙ্গে এই বইখানি পড়তে আমি অনুরোধ করি। তাঁদের কাছে বইখানি যে বিশেষ সমাদৃত হবে এবং তাঁরা যে উপকৃত হবেন—এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। গ্রন্থকারকে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। জনসাধারণের মধ্যে বইখানির বহুল প্রচার হোক এবং গ্রন্থকারের সাধু উদ্দেশ্য সফল হোক একান্তভাবে এই কামনা করি।

মনোবিদ্যা বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৬ই মার্চ, ১৯৫৮

সুহৃৎ চন্দ্র মিত্র

অবাধ্য শিশু ও শিক্ষাসমস্যা

অবাধ্য শিশু

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার একটি অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ জীবনের জটিলতা বৃদ্ধি। যেখানেই জীবন জটিল সেখানেই ব্যক্তির পক্ষে এই সমস্যা-সংকুল জটিল সমাজ ও পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলা চেষ্টাসাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য। অধিকাংশের পক্ষে এই খাপ খাওয়াইয়া লওয়া মোটামুটিভাবে সম্ভব হয় বলিয়াই সভ্যতার অগ্রগতিও অব্যাহত থাকে। কিন্তু কিছু সংখ্যক ব্যক্তি নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারে না। ইহারা নিজেরাও সুখী হইতে পারে না, অন্যকেও সুখে থাকিতে দেয় না। সমাজের প্রচলিত রীতি ও বিধি তাহারা ভঙ্গ করে এবং সমাজ কর্তৃক ধিকৃত হয়।

অপরাধী সম্বন্ধে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী

পূর্বে সমাজ ইহাদের বলিত অপরাধী বা criminals, আর বর্তমানে বলে কর্তব্য কর্মে ত্রুটিপরায়ণ—বা delinquent। এই ভাষার পরিবর্তন দৃষ্টিভঙ্গীর একটি মৌলিক পরিবর্তন সূচনা করে।

পূর্বের দৃষ্টি ছিল সমাজের দিক হইতে। যাহারা সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে তাহারা দুষ্ট, কারণ তাহারা সমাজের ক্ষতি করিয়াছে, সুতরাং সমাজ তাহাদের শাস্তি দিবার কথাই চিন্তা করিত। কোন অপরাধে কোন শাস্তি দেওয়া বিধেয় তাহা নির্ধারণ করাই ছিল বিবেচনার বিষয়। কিন্তু মনো-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমান মানুষ অপরাধকে বিচার করে তাহার সামাজিক ফলাফলের দিক হইতে নয়,—অপরাধ যে করে তাহার দিক হইতে; কেন মানুষ অপরাধ করে? সে যে সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিল না—তাহার জন্য তাহার নিজের ভিতরের এবং বাহিরে সমাজের কোন কোন অবস্থা দায়ী?

অর্থাৎ অতীতের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্দেশ্য ছিল অপরাধের বিচার ও শাস্তি, বর্তমানের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্দেশ্য হইল ইহার কারণ অনুসন্ধান এবং সম্ভব হইলে সে কারণ দূরীকরণ দ্বারা ব্যক্তির সংশোধন এবং অপরাধ-নিবারণ। Towle এই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছোট একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা চমৎকার ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—Yesterday we said, "This is a thief. What to do with thieves ?" Today, we say, 'This is a person who steals, and try to understand why he steals.' আগেকার দিনে আমরা বলিতাম, "এ চোর। চোরদের লইয়া আমরা কি করিব ?' এখন বলি—"এ একজন মানুষ, এ চুরি করে। কেন চুরি করে তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে।"

অপরাধের কারণ

অপরাধকে বুঝিতে হইলে ফলাফল দ্বারা তাহা বুঝা যায় না। অপরাধ তো একটা কার্য, তাহার কারণটিকে জানিলেই তাহার প্রকৃত বিচার সম্ভব হয়। শিশু কেন অপরাধ করে ? ইহার মধ্য দিয়া তাহার কোন অতৃপ্ত আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি হয় নিশ্চয়ই। তাহার সমাজপরিবেশের সঙ্গে কেন সে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিল না ? সমাজশৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া সে সমাজকে আঘাত করিতে চায় কেন ? সমাজের কোন দাবী তাহার কাছে অসহনীয় হইয়াছিল ? সমাজের প্রতি তাহার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর কারণ কি ? বর্তমানের সমাজবিজ্ঞানী এই বিবিধ জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে প্রয়াসী।

মা ফাল্গুন মাসের দুপুরের চন্‌চনে উজ্জ্বল রৌদ্রে তাঁহার দামী শাড়ী জামাগুলি মেলিয়া দিয়াছেন। বারে বারে ছেলেমেয়েদের নিষেধ করিয়াছেন যেন সেগুলিতে হাত না দেয়। ছোট খোকা সকাল হইতে মার পিছু পিছু ঘুরিয়াছে, কত হাজারো প্রশ্ন তাহার মনে। কিন্তু মা আজ ব্যস্ত, কোন বিয়ে বাড়ীতে আজ নিমন্ত্রণ, বাড়ীর রান্নাখাওয়া আজ শীঘ্র সারিতে হইবে। কতবার খোকা মার কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে, মা "সর সর" করিয়া সরাইয়া দিয়াছেন —শিশু ক্ষুব্ধ অভিমানে নিজের মধ্যে গুমরাইয়া মরিতেছে। অন্য দিন মা দিনের মধ্যে কতবার আদর করেন, অন্ততঃ একবার হইলেও কোলে করিয়া চুমু

খান। আর আজ? সে যে আছে, তাহার যে ক্ষুধা পায়, তাহার মনের মধ্যে যে হাজারো প্রশ্ন ঘুরিয়া মরিতেছে,—সে কথাই আজ সকলে যেন ভুলিয়া গিয়াছে! এর-ই মধ্যে বাবা অফিসে যাইবেন,—মা তাড়াতাড়ি হাত চালাইয়া মাছের ঝোল নামাইলেন,—একটি বেগুন কাটিয়া ভাজিলেন,—ভাত বাড়িয়া পাখার হাওয়ায় গরম ভাত ঠাণ্ডা করিয়া দিলেন,—সামনে বসিয়া গল্প করিয়া (সেই বিয়ে বাড়ীর নিমন্ত্রণের গল্প!) 'ওটা খাও', সেটা খাও' বলিয়া বাবাকে সাধিয়া খাওয়াইলেন,—খাওয়া হইলে আঁচাইবার জন্য ঘটি ভরিয়া জল আগাইয়া দিলেন,—গামছা দিলেন,—আবার অফিসে যাওয়ার সময় হাসিয়া হুটি পান বাবার হাতে দিলেন,—হাসিয়া বলিলেন, "আজ শীগ্গীর শীগ্গীর অফিস থেকে ফিরো।" এতক্ষণের মধ্যে খোকা কতবার বাবার কাছ দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছে (বাবা যা গম্ভীর!) কিন্তু কই, কেহই তো খোকাকে একবার কাছে ডাকিলেন না।

খোকার মাথায় আগুন ছুটিতেছে! সেও সকলকে দেখিয়া লইবে! ওই তো বাবার টেবিলের উপর দামী কালো কালির দোয়াতটা! সে বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া কালির দোয়াতটা হাতে লইয়া বাহিরে দৌড় দিল—সবটা কালি ঢালিয়া দিল মার সবচেয়ে জমকালো লাল বেনারসী শাড়ীখানার উপরে। তারপর আছাড় দিয়া দোয়াতটা ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া পলাইল! 'বেশ হইয়াছে'—আক্কেল হইয়াছে!

শোর উঠিল, "মা, মা ছাখোসে, ছোট খোকা কি সব্বোনাশ করেছে—তোমার লাল বেনারসী—।" মা ছুটিয়া বাহির হইলেন। দাদা, দিদি, পিসিমা, ঝির সম্মিলিত কলরব! "কি দস্যি ছেলে বাবা, বড় হ'লে এ ছেলে জেলে যাবে"; "কোথায় গেল লক্ষীছাড়া, ওকে মেরে হাড়গোর ভেঙ্গে দেব"; "বাবা এলে দেখো, ওর কি হাল করেন";—"অন্ততঃ দেড়শ টাকার কমে ওরকম শাড়ী আজকাল হয় না"; "কি পরে আজ যাবে নিমন্ত্রণে?" "বাবু এলে তাঁকে কেউ বোল না—যা হবার হয়েছে, কিন্তু কোথায় গেল লক্ষীছাড়া ছেলে? ওরে, তোরা খোঁজ ওকে, সকাল থেকে ওই একটু দুধ রুটি খেয়েছে—ওর নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে",—"ওতো এমন ছিল না—ওই পাশের বাড়ীর বজ্জাত মানকের সাথে মিশে গোল্লায় গেল";—"খোকা! ও খোকা!"

খোকা সিঁড়ির নীচে অন্ধকারে লুকাইয়াছে—সব কথাই সেখান হইতে শোনা যায়—কেমন নাটকীয় ব্যাপার! বুক কাঁপিতেছে ভয়ে—উত্তেজনা উবিয়া গিয়া, হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে—কি মারটাই না জানি খাইতে হইবে! কান্না পাইতেছে—ক্ষুধা পাইয়াছে;—কিন্তু তবু তবুও খোকাকে সকলে ভোলে নাই—খোকা ফ্যালনা নয়—ওই তো মার ডাক—"খোকা! ও খোকা!"

নিশ্চিতই খোকার বিচার হইবে, সে শাস্তি পাইবে, দেড়শ টাকার শাড়ী নষ্ট করিবার জন্য। কিন্তু ইহাও অপরাধ বিজ্ঞানীর দৃষ্টি এড়াইবে না যে খোকার এ অপরাধ স্নেহবঞ্চিত হৃদয়ের ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ—নিজের ক্ষুণ্ণ আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিবার ছেলেমানুষি অদ্ভুত কৌশল।

অন্তর্দ্বন্দ্ব মীমাংসার বিকৃত চেষ্টা—অপরাধ

সমাজ বিজ্ঞানীর কাছে 'অপরাধ' অন্তর্দ্বন্দ্ব মীমাংসার বিকৃত প্রচেষ্টা। ইহা একটি মানসিক অস্থিরতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে—সেই জন্যই ইহার মূল্য। ইহা রোগ নয়—ইহা রোগের বহিঃপ্রকাশ। Merrill সত্যই বলিয়াছেন: 'The delinquent act has for the child a certain dramatic quality that highlights the emotional tensions and stresses of which the act is the resultant. In understanding the delinquent child, the delinquent act is important only as an indication of conflict, a symptom of maladjustment......"

অর্থাৎ শিশুর অপরাধমূলক কাজ তাহার ভাবের আবেগ ও প্রচণ্ডতাকে বিশেষভাবে প্রকট করে। বস্তুতঃ ইহা এই মানসিক অবস্থা হইতে উদ্ভূত হয়। অপরাধ-পরায়ণ শিশুকে বুঝিবার পক্ষে ইহার গুরুত্ব এই যে, ইহা তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের, তাহার চারিত্রিক অসামঞ্জস্যের (maladjustment) লক্ষণ।

কর্তব্যকর্মে ত্রুটিপরায়ণ, অবাধ্য বা ডিলিংকোয়েন্ট কে? ইহা কি জন্মগত? যাহারা এরকম অবাধ্য তাহারা সাধারণ সুস্থ মানুষদের চেয়ে পৃথক কিসে? এই দুই শ্রেণীর মধ্যে গুণগত প্রভেদ আছে কি? দুই দলের মধ্যে

সমাজ ও পরিবেশের প্রভাব, মানসিক গঠন, জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর কি প্রভেদ ? এ সমস্ত প্রশ্নের সর্বজনসম্মত উত্তর পাওয়া যায় নাই। তবে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় এ প্রশ্নগুলি গভীরভাবে ভূয়োদর্শন ও বিচিত্র পরীক্ষার মধ্য দিয়া বিবেচিত হইতেছে। বিশেষ করিয়া সে সব দেশে শিশু-অপরাধীদের সম্পর্কে নিবিড়ভাবে চিন্তা সুরু হইয়াছে—কারণ তাহাদের সমাজ-জীবনে ইহা একটি বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে তাহা যৎসামান্য এবং এ সমস্যা সমাধানের জন্য কোন চেষ্টাই প্রায় হয় নাই বলা চলে। এমন কি, ইহা যে একটা 'সমস্যা' সে বোধই প্রায় জাগ্রত হয় নাই। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের যে ভিত্তির উপর এ সমস্যার আলোচনা এবং ইহার প্রতিকার হইতে পারে, সে ভিত্তিই প্রায় এখনও রচিত হয় নাই। তাই আমাদের সম্পূর্ণভাবেই বিদেশী লেখকদের উপরই নির্ভর করিতে হয়।

অবাধ্য শিশুর সংজ্ঞা

অবাধ্য শিশু বা ডিলিংকোয়েণ্ট কাহাকে বলিব? এ প্রশ্ন লইয়া যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে—অনেক গবেষণা চলিয়াছে কিন্তু মতভেদও এ বিষয়ে প্রচুর। ঠিক কোন জাতীয় কার্যকে অবাধ্যতা বলা যাইবে, কি ইহার বৈশিষ্ট্য, ইহার কারণই বা কি—এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। এ বিষয়ে Cyril Burt এর মতটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার সংজ্ঞা অনেকে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সিরিল বার্ট বলেন: 'A child is to be regarded as technically delinquent when his anti-social tendencies appear so grave, that he becomes, or ought to become, the subject of official action."[১] অর্থাৎ "সেই শিশুকেই আইনগত অর্থে ডিলিংকোয়েণ্ট (বা অবাধ্য) বলা হইবে যাহার মধ্যে এমন গুরুতর অসামাজিক মনোভাব বা ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায় যাহার বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে বা গ্রহণ করা উচিত।"

---

১ Cyril Burt—*The Young Delinquent*. P. 15

কিন্তু কোন্ ব্যবহার গুরুতররূপে সমাজবিরোধী তাহা নিয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মত বর্তমান ; একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। পরের বাগান হইতে ফুল চুরি করা, সকল অবস্থাতেই, বিলাত প্রভৃতি দেশে 'অসামাজিক ব্যবহার'। কিন্তু আমাদের দেশে সরস্বতীপূজার আগের দিন রাত্রে ফুল চুরি অসামাজিক ব্যবহার তো নয়ই, বরং অত্যন্ত ধর্ম কার্য বলিয়া সমর্থিত।

অপরাধের গুরুত্ব বিচার

সমাজ বিরোধী ব্যবহারের বিচিত্রতাও একটা সমস্যা। ঘুমন্ত পণ্ডিত মহাশয়ের টিকির ডগা কাটিয়া নেওয়া এবং দল বাঁধিয়া রাত্রিতে মেয়ে হষ্টেলে হানা দিয়া তাহাদের শাড়ী জামা জোর করিয়া কাড়িয়া আনা, দুইই অসামাজিক ব্যবহার—কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রভেদ কি শুধু পরিমাণগত? অসামাজিক আচরণেও কি জাতিগত ভেদ আছে?

অসামাজিক আচরণের বা অপরাধের গুরুত্বই শিশুকে বিচার করিবার নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি নয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে শিশুর অপরাধটি ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে শিশু সমাজের রীতিনীতি ও দাবীর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারিতেছে না। কিন্তু অপরাধের গুরুত্ব সমাজের সঙ্গে শিশুর অসঙ্গতির গুরুত্ব জ্ঞাপক নহে। মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে অপরাধী শিশুকে তাহার সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের ও পরিবেশের পটভূমিকাতেই বুঝিতে হইবে। Merrill বলিতেছেন: "The seriousness of the offence is no-wise a criterion of the extent of the social maladjustment of the offender. It is a commonsense observation that the delinquent act without the frame of reference of the total personality of the delinquent actor has little psychological meaning."[২]

দুইটি ছেলে অবনী ও ইয়াসিন একত্র হইয়া দরিদ্র কাসেমের গাছ হইতে শীতের রাত্রে খেজুরের রস চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িল। অবনী নীচে ছিল ইয়াসিন গাছে উঠিয়াছিল। টের পাইয়া কাসেম বাহির হইয়া অবনীকে তাড়া

২ Maud Merrill—*Problems of Child Delinquency*. P. 5

করে, অবনী একখানা খোলা ছুরি দিয়া কাসেমকে গুরুতর আহত করে। শোরগোল শুনিয়া লোকজন জড় হইয়া অবনীকে ধরিয়া ফেলে। ইয়াসিনও গাছ হইতে নামিয়া পলাইতে গিয়া ধরা পড়ে। প্রচুর উত্তম মধ্যমের পর তাহাদিগকে থানায় লইয়া যাওয়া হয়। বিচারে অবনীর ২০০৲ টাকা জরিমানা ও একমাস জেল এবং ইয়াসিন-এর ৫০৲ জরিমানা এবং জরিমানা অনাদায়ে ১৫ দিন জেল হয়। অবনীকে শেষ পর্যন্ত জেলে যাইতে হয় নাই। তাহার বাবা ৫০০৲ টাকা জরিমানা দিয়া ছেলেকে ছাড়াইয়া আনেন।

বিচারকের বিচারে অবনীর অপরাধ বেশী গুরুতর, তাহার শাস্তিও তাই বেশী হইল। কিন্তু একথা কি তাহাতে প্রমাণিত হইল যে অবনী অধিকতর অপরাধপ্রবণ, অথবা সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে তাহার অসঙ্গতি ইয়াসিনের তুলনায় বেশী?

এ ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া মনোবিজ্ঞানে উৎসাহী দু'জন সমাজসেবী কর্মী যে তথ্য উহাদের সম্বন্ধে সংগ্রহ করেন, তাহা এই :—

অবনীর বয়স প্রায় ১৪ বৎসর। পিতামাতার একমাত্র সন্তান। পিতা সরকারী চাকরি করেন। বদলির চাকরি। এখানে ছয় মাস পূর্বে আসিয়াছেন। বাপ মা বাহিরে অন্য কোন ছেলের সঙ্গে মিশিতে দেন না অথবা বাহিরের কেনা খাবার কখনো খাইতে দেন না। চাপরাশী গিয়া স্কুলে পৌঁছাইয়া দেয়, ছুটি হইলে নিয়া আসে। স্কুলের ছাত্রেরা 'খুকী' বলিয়া ওকে ঠাট্টা করে। স্কুলে বা পাড়ায় কোন বন্ধু বান্ধব নাই। বাড়ীতে অনেক বাংলা ডিটেকটিভ বই আছে, তাহা সে পড়ে। কোন প্রকার খেলাধূলায় উৎসাহ নাই। মা বৃহস্পতিবার 'লক্ষ্মীর আসন' দেন। তা ছাড়া বাড়ীতে কোন ধর্মালোচনা হয় না। বাসায় রেডিও আছে। মাসে ৩।৪ দিন মার সঙ্গে সিনেমা দেখিতে বাধা নাই।

সেদিন রবিবার সকালে বাসার বারান্দায় দাঁড়াইয়া অবনী ইয়াসিনকে পরম আনন্দে খেজুরের রস কিনিয়া খাইতে দেখে। কিন্তু ভিতরে গিয়া মার অনুমতি চাহিতে গেলে তিনি নিষেধ করেন। যাহা হোক্, বারান্দায় দাঁড়াইয়া ইয়াসিনের সঙ্গে আলাপ হয়—সে পাড়ারই ছেলে, বয়সে তার চেয়ে কিছু বড়। সে বলে, শীতের রাত্রে রস চুরি করিয়া খাওয়া কি রকম মজা! কথায়

কথায় পরামর্শ স্থির হয়। রাত্রে ৩টার সময় ইয়াসিন জানালায় আসিয়া টোকা দেয়। অবনী ভয়ে ভয়ে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসে। তাহার ভয় করিতে থাকে। ইয়াসিন তাহাকে আশ্বস্ত করে এবং জামার পকেটে একটি ছুরি নিতে বলে।

ইয়াসিনের বয়স ষোল। এ পাড়ারই স্থায়ী বাসিন্দা। বাপ রাজমিস্ত্রী। সারাদিনই প্রায় বাড়ীর বাহিরে থাকে। ঘরে বিমাতা। তাহাকে একেবারে দেখিতে পারে না। তাহার সৎমা ও সৎভাই-বোনরা তাহাকে সর্বদাই গালাগালি করে, বাপের কাছে নালিশ করিয়া তাহাকে মার খাওয়ায়। পড়া-শুনা সামান্যই হইয়াছে। এক বিড়ির দোকানে তাহার মত এবং তাহার চেয়ে বয়স্ক বদলোকদের সঙ্গে বসিয়া অশ্লীল গল্প করিয়া বিড়ি পাকায়। বাসায় সে জল খাবার খাইতে পায় না। তবে চুরি করিয়া টাকা ঘরে নিলে তখন তাহার কিছু খাতির হয়। আর তাহারও অংশে বাবা মা ভাগ বসায়। বাবা প্রায়ই তাড়ি খায়। ঘরে ঝগড়াঝাটি মারপিট লাগিয়াই আছে। বোন একটা বিবাহ দিয়াছিল। স্বামী তালাক দিয়াছে। তারপর আর এক দর্জির সঙ্গে সিলেট পলাইয়া গিয়াছে। পাড়ায় তাহার ছোটোখাটো একটি দল আছে। সে-ই সর্দার। নানা উৎপাত করে। তবে দরিদ্রের প্রতি মমতা আছে। কেহ তাহার সাহায্যপ্রার্থী হইলে সাধ্যমত সাহায্য করে।

ইহা হইতে দেখা যাইবে অপরাধের মাত্রা অনেক কম হইলেও ইয়াসিনের 'রোগ' অনেক বেশী জটিল ও গুরুতর এবং তাহার সংশোধনও অনেক বেশী কষ্টসাধ্য। এই প্রকার অনুসন্ধানের ফলে আমরা অবাধ্য শিশুর অপরাধের পটভূমিকা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে পারি। শিশুর মনের উপর সামাজিক কি কি প্রভাব ক্রিয়া করিতেছে (Social pressures), তাহার মনের গঠনটিই বা কেমন ইহা জানিলে তবেই 'অপরাধ'টির প্রকৃত মান নির্ধারণ সম্ভব। এই কঠিন কাজটি সমাজ-সেবী মনোবিজ্ঞানীকে করিতে হয়। আমাদের দেশে শিশুদের বিচারের জন্য আলাদা ব্যবস্থা (Juvenile court) নাই বলিলেই চলে। শিশুদের অপরাধের মনোবৈজ্ঞানিক সহৃদয় বিশ্লেষণ ও অভিভাবক ও শিক্ষকদের অবাধ্য শিশুদের সংশোধনের জন্য উপদেশ দেওয়ার জন্য উপযুক্ত গবেষণাগার ও চিকিৎসালয় তো আমাদের দেশে আরও দুর্লভ।

২

অপরাধপ্রবণতা কি জন্মগত ?

এটি একটি প্রাচীন ধারণা যে অপরাধীরা একটা আলাদা 'জাত'। সুস্থ সুনীতিসম্পন্ন মানুষদের চেয়ে ইহারা আলাদা। জন্ম হইতেই ইহারা মানসিক কোন বিকৃতি নিয়া জন্মে—যেমন দুর্ভাগা মানুষ জন্মে চক্ষুহীন, অঙ্গহীন হইয়া। আবার যাঁহারা ধার্মিক তাঁহারা বলিবেন, ইহারা ভগবানের অভিশাপ —সমাজের কলঙ্ক। ভগবানই ইহাদের এই কলঙ্কের ছাপ (Stigmata) দিয়া পাঠাইয়াছেন।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে কতকটা এই জাতীয় মতবাদ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন Lombroso। তাঁহার মতে মানুষের প্রাচীন পূর্বপুরুষ হইতেছে বন্য পশুরা। সুতরাং কখনও কখনও জন্মগত কোন কারণে পশ্চাদাবর্তন (atavism) ঘটে এবং তখন পশুর মত দৈহিক গঠন ও মানসিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ জন্মগ্রহণ করে—ইহারাই হইতেছে 'জাত অপরাধী' (criminal type)। লোম্ব্রোসো ইহাদের জাতিবিভাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বর্তমানে এ মতবাদ অবৈজ্ঞানিক বলিয়াই প্রমাণিত ও বর্জিত হইয়াছে। William Healy (ইনিই প্রথম মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসাগার স্থাপন করিয়াছিলেন) বহু অনুসন্ধান করিয়াও সম্পূর্ণ নীতিজ্ঞানবিবর্জিত অথচ অন্য দশজনের মত বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের খোঁজ পান নাই।[৩]

কিন্তু কিছুটা সংশোধিত আকারে এই মত বিলাতে এখনও প্রবল এবং বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী Tredgoled কতক পরিমাণে এ মতের সমর্থক। এ বিষয়ে Cyril Burt এর মত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ *The Young Delinquent* এ বিশদভাবে এ প্রশ্নটি আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে অপরাধীর বংশানুক্রমিকতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই—ইহার কোন বংশগত প্রভাব থাকিলে তাহা গৌণ। কিন্তু এই মতবাদ যে এখনও ইংল্যাণ্ডের চিন্তাকে প্রভাবান্বিত

---

৩ William Healy—*The Individual Delinquent*. P. 783,

করিতেছে তাহা তিনি স্বীকার করেন।[৪] ইংল্যাণ্ডের Mental Deficiency Act, 1913, জন্মগত নীতিজ্ঞান বিবর্জিত মানুষের অস্তিত্ব স্বীকার করে—সে আইন বলে "A moral imbecile is a person who from birth or from an early age displays some permanent mental defect, coupled with strong vicious or criminal propensities, on which punishment has little or no deterrent effect."

যদিও আমেরিকায় এ মতবাদ গ্রহণ করা হয় না তথাপি সাম্প্রতিক কালে Hooton এবং Gluecks (স্বামীস্ত্রী) বহু অপরাধীর দৈহিক গঠন পরীক্ষা করিয়া তাহারা যে সাধারণ সুস্থ মানুষদের চেয়ে এ বিষয়ে কিছুটা ব্যতিক্রম তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।[৫] গ্লুয়েক দম্পতি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এ অপরাধীদের মধ্যে একদল শাস্তি বা চিকিৎসার দ্বারা সংশোধিত হয়। ইহারা সাধারণ মানুষদের চেয়ে বেশী তফাৎ নয়। কিন্তু একদল আছে যারা বারে বারেই অপরাধ করে (recidivist) এবং যাহাদের শাস্তি দিয়াও সংশোধন করা যায় না। এ জাতীয় অপরাধীরা শারীরিক গঠনের দিক দিয়া নিকৃষ্ট (biologically inferior) এবং যাহারা বাল্যকালে অপরাধপ্রবণ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল বড় হইয়াও তাহারা অপরাধ করিতেই থাকে।[৬]

এটা অনেক সময়ই আমরা ভুলিয়া যাই যে সামাজিক মানানুগ ব্যবহার শিশুকে আয়াস ও চেষ্টা দ্বারাই শিখিতে হয়। এ জগতের ভাল-মন্দের মাপকাঠি বড়দের প্রয়োজনে তাহাদের দ্বারাই সৃষ্ট। এই বড়দের মানটা শিশুদের কাছে সহজ নয়। কাজেই এ ধারণাটা ভুল যে ভাল হওয়াটাই (অর্থাৎ বড়দের প্রবর্তিত ও প্রচলিত মান অনুযায়ী ব্যবহারটা) শিশুদের পক্ষে স্বাভাবিক। আর তাই যেসব শিশু এ ব্যবহারে অভ্যস্ত হইল না

---

৪ Cyril Burt—*The Young Delinquent*. P. 56 and P. 43.

৫ E. A. Hooton—*The American Criminal—an anthropological study*.

৬ Sheldon Glueck and Eleanor Glueck—*Juvenile Delinquents Grown up*.

তাহাদের প্রতি আমরা বিরক্ত হইয়া ভাবি—ইহারা 'অদ্ভুত', ইহাদের রক্তেই কোন দোষ আছে। ইহাও শিশুর মানসিক বিকাশের ধারা সম্বন্ধে আমাদের যে গভীর অজ্ঞতা আছে তাহাই প্রকাশ করে। বর্তমান কালের শিশু মনোবিজ্ঞানীরা এই কথা বুঝিতে শিখিয়াছেন যে, শিশু জন্ম হইতেই সামাজিক রীতিনীতি ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া জন্মে না। চোখ ও হাতের ব্যবহারের সঙ্গতিও ছোট শিশুর পক্ষে যথেষ্ট কঠিন। অনেক ভুল, অনেক তিরস্কার, অনেক ঠেকিয়া শিখার মধ্য দিয়া শিশু 'মানুষ' হয়। বিভিন্ন বয়সে শিশুরা বিভিন্ন সঙ্গতিতে (adjustment) অভ্যস্ত হয়। এ বিষয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। তবে এই বিকাশের ধারা কতকগুলি সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে।[৭] সমাজের সঙ্গে সঙ্গতির ব্যাপারটা শিশুর পক্ষে যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। দুই তিন বৎসর বয়সের শিশু পরিবারের সকলের আনন্দ ও মনোযোগের বস্তু—তার হাসিকান্না, হাত-নাড়া, আধো-আধো কথা সবই প্রশংসা পায়। কিন্তু পাঁচ ছয় বৎসর বয়স হইলেই তখন বাবা মা শিশুকে মাঝে মাঝে ধমক দেন, অমন সব সময় পায়ে পায়ে ঘুরিলে বা গায়ে লাগিয়া থাকিলে বিরক্ত হন। কখনো বা বুদ্ধিমানের মত কথা বলিলে প্রশংসা পায় আবার হয়তো পর মুহূর্তেই "পাকা পাকা কথা" বলিবার জন্য কানমলা খায়। আবার আরো বড় হইলে বাপমায়ের বাধ্য হইয়া কথা শুনিয়া চলিলে প্রশংসা পাওয়া যায়—কিন্তু তাতে আবার ক্লাশের বন্ধুরা বলে 'কচিখুকী'। কাজেই শিশুর পক্ষে 'ভাল হওয়ার' পথ স্বাভাবিক তো নয়ই—সহজও নয়। ফ্রএড্‌পন্থীরা খুব জোর দিয়াই একথা বলেন, যে শিশু স্বভাবতঃ আত্মকেন্দ্রিক ও অ-সামাজিক। এবং শিশুর সামাজিক সচেতনতা ক্লেশকর শিক্ষার ফল। তাই যথেষ্ট নাটকীয় ভঙ্গীতেই তাঁহারা এ কথা বলেন, "শিশু যে সমাজ-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া অবাধ্য হয় এটা সমস্যা নয়,—সমস্যা হইল কেন সমস্ত শিশুই অবাধ্য হয় না।" শিশুর কর্মচিন্তা, অনুভূতি কি করিয়া বহু বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া সামাজিক প্রচলিত আদর্শের অনুবর্তী হয় Piaget সে

---

৭ G. Murphy, L. B. Murphy & T. M. Newcomb—*Experimental Social Psychology*. P. 325.

সম্বন্ধে বিস্তৃত ও মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতেও এই কথাই স্পষ্ট বোঝা যায় যে শিশু 'বাধ্য' বা 'অবাধ্য' হইয়া জন্মগ্রহণ করে না।

অবাধ্যতার কারণ অনুসন্ধান

এ প্রশ্নের উত্তর নানা কারণেই অত্যন্ত কঠিন। কোন একটি মাত্র 'কারণে' শিশু অবাধ্য হয় না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে অবাধ্যতার সূচনা হয়। একই শিশু সর্বদা একই কারণে সমাজরীতি ভঙ্গ করে না। ব্যক্তির জটিল মানসিক গঠন ও সামাজিক পরিবেশের অধিকতর জটিল ঘটনাসংস্থান—এই সবটা মিলাইয়াই মানুষের প্রত্যেকটি কর্মের রূপ ও প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। এ বিশ্লেষণ মানুষের বর্তমান জ্ঞানের দ্বারা এখনও সম্পূর্ণ সম্ভব নয়। কারণ যখন একটি মাত্র নয় তখন বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞানুসারে 'কারণ' অনুসন্ধান করা চলে না। আমরা চেষ্টা করি যে সমস্ত মানসিক ও পারিবেশিক ঘটনাসংস্থান (contributing factors)-এর মধ্যে অধিকাংশ 'অবাধ্যতা'র ক্রিয়া (delinquent acts) দেখা যায়, তাহার অনুসন্ধান করিতে। ইহার মধ্যে কোন অবস্থা (factor) মুখ্য ও কোনটি গৌণ তাহা নির্ধারণও মোটেই সহজ নয়।

এটা মনে করা স্বাভাবিক যে যদি কোন অবস্থা বহু অবাধ্যতার ক্ষেত্রেই দেখা যায় তবে তাহা একটি মূল কারণ। কিন্তু এই বিচার বহু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অনুরাগ, বিরাগ, ইচ্ছা (subjective bias) দ্বারা বিকৃত হইতে পারে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। কুসংসর্গ শিশুর অবাধ্যতার একটি সম্ভাব্য কারণ। যদি অবাধ্য শিশুর পিতামাতার মতামত গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে ইহা দেখা যাইবে যে, প্রায় প্রত্যেক পিতামাতাই কুসংসর্গকে তাহাদের সন্তানের 'নষ্ট' হইবার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করিবেন। অবশ্য ইঁহাদের প্রত্যেকের মতে তাঁহাদের সন্তানটি বাস্তবিক নির্দোষ।[৮]

এমন কি বৈজ্ঞানিক ও নিরপেক্ষ মতামতও এ ক্ষেত্রে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছে নাই। যেমন, তিন হাজার অবাধ্য শিশুর অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া হীলি ও ব্রণার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কুসংসর্গ অবাধ্যতার একটি

[৮] Maud Merrill—*Problems of Child Delinquency*. P. 10.

মুখ্য অবস্থা, কারণ অবাধ্য শিশুদের শতকরা ৬২টির ক্ষেত্রে এ অবস্থা (factor) বিদ্যমান আছে।[৯] আবার সীরিল্ বার্ট অনুরূপ অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, কুসংসর্গ একটি গৌণ কারণ মাত্র—কারণ শতকরা মাত্র ১৮টির ক্ষেত্রে এই অবস্থা দেখা যায়।[১০]

তাহা ছাড়া অবাধ্যতার সঙ্গে কোন কোন অবস্থা প্রায়শঃ দেখা গেলেও সত্যই যে এ-দুটি বিষয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ বর্তমান আছে তাহাও নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। ইহা কাকতালীয় সম্বন্ধও (post hoc ergo propter hoc) হইতে পারে। যেমন ধরা যাক, শিশুর অবাধ্যতা এবং বিধ্বস্ত গৃহসম্বন্ধ (broken homes)—এই দুইটি অবস্থা বহু ক্ষেত্রেই একত্র দেখা যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক রীতি অনুযায়ী এ দুইএর মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ প্রমাণ করিতে হইলে ইহা দেখান দরকার যে এই দুইটি অবস্থা যদি কোন নিবিড় সম্বন্ধযুক্ত না হইত তাহা হইলে দৈবাৎ এই দুইটি অবস্থা একত্র যতবার দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল তাহার চেয়ে অনেক বেশী গুণ বার এই দুইটি অবস্থাকে একত্র থাকিতে দেখা যাইতেছে। ইহাও দেখানো দরকার যে অন্যান্য সমস্ত অবস্থাগুলিও অপরিবর্তিত রহিয়াছে। তাহা ছাড়া যাহারা অবাধ্য নয় এমন শিশুদের বেলাও বিধ্বস্ত-গৃহ-সম্বন্ধ অবস্থাটি অনেক সময় বর্তমান। কিন্তু যদি দেখা যায় যে তাহাদের বেলা অনেক কম ক্ষেত্রে এ অবস্থাটি বিদ্যমান থাকে তবেই অবাধ্যতা ও বিধ্বস্ত-গৃহ-সম্বন্ধের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ অনেকটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হইতে পারে। অর্থাৎ এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের নীতি অনুযায়ী সম্বন্ধ প্রমাণিত করিতে হইলে দেখিতে হইবে—

(১) বিধ্বস্ত-গৃহ-সম্বন্ধ ও অবাধ্যতা কত ক্ষেত্রে একত্র বিদ্যমান, (২) বিধ্বস্ত-গৃহ-সম্বন্ধ না থাকা সত্ত্বেও অবাধ্যতা কত ক্ষেত্রে বিদ্যমান, (৩) বিধ্বস্ত-গৃহ-সম্বন্ধ অথচ বাধ্যতা কত ক্ষেত্রে একত্র বিদ্যমান, (৪) বিধ্বস্ত-গৃহ-সম্বন্ধ না থাকা এবং বাধ্যতা কত ক্ষেত্রে বিদ্যমান।

---

৯ Healy and Bronner—*Delinquents and Criminals, their making and unmaking*. P. 179.

১০ C. Burt—*Young Delinquent. P. 125.*

এ্যাণ্ডারসন এবং আরো বহু মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী দেখাইয়াছেন যে বিধ্বস্ত-গৃহ-সম্বন্ধ ও অবাধ্যতা অনেক বেশী ক্ষেত্রে একত্র দেখা যায়—যেমন দেখা যায় একত্র অনেক বেশী ক্ষেত্রে অ-বিধ্বস্ত-গৃহ-সম্বন্ধ ও বাধ্যতা। কাজেই এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ বর্তমান—এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত। এই অনুসন্ধান অত্যন্তই কঠিন, কারণ প্রতিপদেই এমন দুইটি দল পাওয়া দরকার যাহারা অন্য সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ সমবস্থ, শুধুমাত্র বাধ্যতা ও তাহার অভাবেই দুইটি দল পৃথক। বাস্তব জীবনে এমন control group সংগ্রহ করা অত্যন্তই কঠিন। অথচ এই প্রকার control group-এর সঙ্গে তুলনা ব্যতীত নির্ভর-যোগ্য বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো নিতান্তই অসম্ভব।[১১]

এই কষ্টসাধ্য অনুসন্ধানের পরেও দেখা যায় যে যদিও অবাধ্য শিশুদের ক্ষেত্রে বাধ্য শিশুদের তুলনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কয়েকটি অবস্থা দেখা যায়, তথাপি সেই অবস্থাগুলি বিদ্যমান থাকিলেই শিশু অবাধ্য হইবেই—এমন কথা বলা যায় না। যে অবস্থায় একটি ছেলে অপরাধ-প্রবণ হইল মোটামুটি সেই অবস্থায় আর একটি ছেলে স্থির থাকে—এমন অনেক সময়ই দেখা যায়। ব্যক্তিত্বের এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার মত উপায় আজও আমরা উদ্ভাবন করিতে পারি নাই ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

---

[১১] J. E. Anderson—The Methods of Child Psychology—*In Handbook of Child Psychology*. Ed. C. Murchison. P 17.

শিশুর অপরাধপ্রবণতা ও তাহার প্রতিকার

"আবার চুরি করেছিস? তোর জ্বালায় আমি কি গলায় দড়ি দেব? ছি, ছি, কি ঘেন্নার কথা!" মা অমলকে ধিক্কার দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, পিসিমা ফোড়ন কাটিলেন, "ওর রাক্ষসগণ—তখনি জানি ও বংশের নাম ডোবাবে। চুরি দিয়ে সবে সুরু, এর পর ডাকাতি ধরবে। তারপর জেলে, তারপর খুন খারাবী তারপর ফাঁসী—দেখো আমি বলে রাখলাম!" বাবা আসিয়া 'হতভাগা' অমলকে জুতো দিয়া পিটাইলেন, ঘাড় ধরিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। অমলের সেদিন খাওয়া বন্ধ। অমল এত মার খাইয়াও কাঁদিল না। ঘাড় বাঁকা করিয়া বলিল "কখনও একটি পেন্সিল কিনতে পয়সা দিয়েছ? হেবো শূয়োর মিছি মিছি পণ্ডিত স্যারের কাছে মার খাওয়ালে, ওর পেনসিল নিয়েছি, বেশ করেছি, কত মারবে মারো না! আর বাবা যে সেদিন আফিস থেকে হুদিস্তে কাগজ ও চারটে পেনসিল আনলো, সে বেলা কিছু নয়!" অমল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। ও পাড়ার সেরা বদ ছেলে ইস্‌মাইলের বাড়ী গিয়া ওর সাথে এক মাটীর থালায় ভাত খাইল (যাক আমার জাত যাক, বাসায় ওরা তো আর খেতে দেবে না!) তারপর সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া নানা উৎপাত করিয়া বেড়াইল। সেদিন অমলের হাতে খড়ি হইল বিড়ি খাওয়ার! সত্যি তার গোল্লায় যাওয়ার পথ তৈরী হইল!

এমনি করিয়া অনেক সময় অবাধ্য বা অপরাধপ্রবণ শিশু তৈরী হয়। আমরা হয়তো মনে করি অবাধ্য বা অপরাধপ্রবণতা জন্মগত,—ওটা রক্তের দোষ! অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকের মতে এ ধারণাটা ভুল। দৈহিক বিকৃতি কখনও কখনও জন্মগত; বুদ্ধির উৎকর্ষও বংশধারার উপর কতকটা নির্ভরশীল কিন্তু কতগুলি শিশু জন্ম থেকেই নীতি-বুদ্ধিহীন-বদ্‌মাইস্ হইয়া জন্মে একথা মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই।

আমাদের দেশে শিশুদের অপরাধ নিয়া আমরা খুব বেশী চিন্তা করি না। কিন্তু আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি অগ্রসর দেশে এ নিয়া যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হইয়াছে ও হইতেছে।

অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীর মতে শিশু অপরাধ-প্রবণ হয়, তার মস্ত কারণ, তার পরিবেশটি প্রতিকূল। তাহা তাহার স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। অনেক সময়ই একথা বলা চলে শিশুর স্নেহ-বঞ্চিত, অবহেলিত হৃদয় অপরাধের মধ্য দিয়া তৃপ্তি খোঁজে, সমাজকে আঘাত করিয়া সে নিজের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চায়। এর মধ্যদিয়া সে তাহার আহত আত্মমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। শিশুর অপরাধের বিচারে একথাটা মনে রাখা বিশেষ দরকার। আরো একটা কথাও মনে রাখিতে হইবে। আমরা যে নৈতিক মান দিয়া বিচার করি, সেটা শিশু বোঝে না। তাহাদের অপরিণত বুদ্ধির জন্য 'চুরি করা' 'মিথ্যা কথা বলা' 'মারামারি করা' ইত্যাদি ঘটনাকে তারা ঠিক বড়দের দৃষ্টিতে দেখিতে পারে না।

শিশুর অবাধ্যতার কারণগুলিকে আমরা মোটামুটি ভাবে ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত এই দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি। এ কথা অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে ব্যক্তি ও পরিবেশ পরস্পর বিচ্ছিন্ন তো নয়ই বরং পরস্পর পরস্পরকে গঠিত ও প্রভাবিত করে।

শিশুর শারীরিক গঠন, তাহার রুচি, চরিত্র, বুদ্ধি ইত্যাদি লইয়াই তাহার ব্যক্তিত্ব। এ বিষয়ে প্রত্যেক শিশুই অন্য হইতে পৃথক। শিশুর ব্যবহার বা অপরাধপ্রবণতা প্রত্যেক শিশুর ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখিয়াই বুঝিতে হইবে।

এবার ব্যক্তিগত কারণগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। শিশুর দৈহিক কোন বিকার থাকিলে তাহা অনেক সময় তাহার অপরাধের কারণ হইতে পারে। যে ছেলের একটি পা খোড়া, সে তাহার সংসারে পিতামাতার বিষম দুঃখের কারণ, স্কুলে ও বাহিরে সমবয়স্ক বা বড়দের সে উপহাসের পাত্র। যাহারা বেশী কল্পনাপ্রবণ ও অভিমানী তাহারা অন্যের এই অতি-সহানুভূতি বা বিরূপতাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না এবং অবাঞ্ছিত ব্যবহার দ্বারা সমাজের উপর প্রতিহিংসা নেয়। সুতরাং শিশু অপরাধীর সংশোধন করিতে হইলে তাহার কোন চিকিৎসাযোগ্য ব্যাধি বা বিকার থাকিলে তাহা দূর করিতে চেষ্টা করা উচিত। আর যাহারা বিকলাঙ্গ তাহাদের সঙ্গে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক ব্যবহার করিলেই ভাল হয়।

অনেক শিশু-অপরাধী নির্বোধ বা জড়বুদ্ধি। এই জন্যই এদের অসৎপথে নেওয়া সহজ। এরা সাধারণতঃ অন্য দুষ্ট লোকের দ্বারা চালিত হইয়া অপরাধ করে, কখনো কখনো বাহাদুরি দেখাইয়া নিজের যোগ্যতা প্রমাণের জন্যও এরা অন্যায় কাজ করে। এদের বিশেষ ধরণের শিক্ষা দেওয়া দরকার। যাহারা একেবারে খুব বোকা নয়, তাদের হাতের নানা কাজ শিখাইয়া এবং উৎসাহ দিয়া অনেক সময়ই সংশোধন করা যায়। সুস্থ বুদ্ধিমান্ ছেলেদের বেলায়ও হাতের-কাজ শেখার মধ্য দিয়া কুশলতা আয়ত্ত হয়, এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ে, এতে দশজনে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার অভ্যাসটিও গঠিত হয় এবং এরকম কাজ শিশুদিগকে অপরাধ হইতে দূরে রাখিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। যে সব শিশু অপরাধীরা একেবারেই হাবা বোকা, তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষক বা পরিচালকের তত্ত্বাবধানে সুস্থ পরিবেশযুক্ত 'হোম্'-এ রাখাই সঙ্গত।

প্রত্যেক শিশুই কিছু না কিছু জিনিস সঞ্চয় করিতে চায়। বড়দের কাছে শিশুর ভাঙ্গা পুতুল, ছেঁড়া রঙিন ন্যাকড়া, আধখানা কাঁচা পেয়ারা ইত্যাদি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হাস্যকর জঞ্জাল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু শিশুর কাছে তাহার 'নিজস্ব' সঞ্চয়ের ভাবগত মূল্য (sentimental value) সামান্য নয়। তার এই স্বাভাবিক সঞ্চয়-স্পৃহাকে অযথা বাধা দিলে বা আহত করিলে শিশু তাহাতে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয় এবং অপমানিত বোধ করে। তাহার এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিকাশে বাধা দিলে শিশু হয়তো চুরি করিতে প্রবৃত্ত হইবে, অথবা জিনিস পত্র ভাঙ্গিয়াচুরিয়া তার শোধ তুলিবে, তাই প্রত্যেক শিশুকেই নিজ খুশীমত কিছু সঞ্চয় করিবার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। এর মধ্য দিয়া যাহাতে তাহার সুরুচি ও দায়িত্ববোধ বিকাশ লাভ করে সে দিকে দৃষ্টি রাখা পিতামাতার কর্তব্য। রাশিয়াতে নিতান্ত দরিদ্র পরিবারে ও বাড়ীতে শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র একটি স্থান ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সে জায়গাটুকু একেবারেই তাহাদের নিজস্ব। সে জায়গায় তাহাদের সঞ্চয় সম্পত্তি তাহারা রাখে, সে জায়গাটুকুকে নিজেদের খেয়ালখুশীমত সাজায়, ফুলপাতা দিয়া, কাগজ দিয়া। এতে তাহাদের আত্মমর্যাদা-বোধ বিকশিত হয়, তাহারা বুঝিতে শেখে সংসারে তাহাদেরও দাম আছে। আমাদের দেশেও এ পরীক্ষাটি আমরা করিতে পারি।

শিশুর পরিবেশের মধ্যে সব চেয়ে প্রথম ও সব চেয়ে প্রধান হইতেছে তার মা, বাপ, ভাই, বোন আত্মীয়স্বজন। মা বাপের ভালবাসা শিশুর পক্ষে শুধু স্বাভাবিক নয়—ইহা আলোবাতাস ও খাদ্যের মত তাহার জীবনের সুস্থ বিকাশের পথে অপরিহার্য। যেখানে গৃহের পরিবেশ প্রীতিপূর্ণ নয়, যেখানে পিতামাতার মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ সুস্থ নয়, যে পরিবারে ঝগড়াঝাটি, কলহ বিসম্বাদে, দুনীতিপূর্ণ ব্যবহারে, আবহাওয়া বিষাক্ত, সেখানে শিশুর অবচেতন মন অস্বস্তি বোধ করে এবং যদিও আমরা মনে করি শিশুরা কিছুই বোঝে না, তথাপি তাহারা খুব বেশী প্রভাবিত হয় এ কলুষ দ্বারা। অপরাধী শিশুদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় তাহাদের অধিকাংশের পারিবারিক পরিবেশ অসন্তোষজনক। পিতা মদ্যপ, মাতা কলহপরায়ণা, ভাইবোনরা মিথ্যাবাদী, প্রতিবেশী উদাসীন—এমন অবস্থার মধ্যে সুস্থ স্বাভাবিক শিশু গঠিত হইবে, এ আশা করাই অসম্ভব। অপরাধী শিশুর চিকিৎসা করিতে হইলে, গৃহ পরিবেশের সংস্কার নিতান্ত প্রয়োজন। শিশুর সুশিক্ষার কথা যেমন আমরা ভাবি, অগ্রসর সভ্য দেশে পিতামাতার সুশিক্ষার কথাও তেমনি ভাবা হয়, সেখানে যে সব পিতামাতা ছেলেমেয়ের অযত্ন করে, তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, তাদের বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা আছে।

এর পরই শিশুর জীবনে প্রভাব বিস্তার করে তাহার বিদ্যালয়, বন্ধু বান্ধব, শিক্ষক। কুসঙ্গে মিশিয়া অনেক ছেলেমেয়ে খারাপ হয় এটা সবাই জানে। বন্ধু ও সমবয়স্কদের কাছে বাহবা পাইতে সবাই চায়। আর অনেক সময় বন্ধুদের মুখে 'ভালো' 'লক্ষী-লক্ষী' 'গো বেচারা' এ সব হইতেছে উপহাসের ভাষা। ঘুমন্ত পণ্ডিত মশাইয়ের টিকিটা কাটিয়া আনিতে পারিলে বন্ধুদের কাছে খুব সাবাস বাহবা পাওয়া যায়। তার আকর্ষণ শিশুর কাছে সামান্য নয়। আর এসব অন্যায় কাজে যে বিপদ আছে তাহা শিশু চিত্তকে অনেক সময়ই উত্তেজিত করে, সেই জন্যেই না ভাবিয়া চিন্তিয়াই ছোট ছেলেমেয়েরা অন্যায় করিয়া থাকে। এটা বিশেষ করিয়া যে সব ছেলেরা করে, তাহারা লেখা পড়ায় পিছাইয়া-পড়া, যারা শিক্ষকের কাছে প্রশংসা পায় না,—যাদের কাছে স্কুলটা লাগে জেলখানার মত। এসব ছেলেদের সম্পর্কে শিক্ষকের দায়িত্ব সমধিক।

এদের সংশোধন করিতে হইলে দেখিতে হইবে কেন ইস্কুল এদের ভাল লাগেনা। এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে এমন ছেলের বুদ্ধি-সাধ্যের তুলনায় তার পড়াশোনার চাপ অনেক বেশী শক্ত, তাই হারিয়া গিয়া তার আত্মসম্মান বারে বারে ক্ষুণ্ণ হয়। তাই সে এমন ক্ষেত্র খোঁজে যেখানে সে কিছু বাহবা পাইতে পারে। এ কথাটা বিশেষ করিয়াই শিক্ষকদের স্মরণ রাখা দরকার, যে শিক্ষকের স্নেহ, সহানুভূতি, উৎসাহের দাম শিশুর কাছে অসামান্য। এবং শিশু শিক্ষকের কাছে একটি বৃহৎ জীবনের জীবন্ত আদর্শ খোঁজে। শিক্ষক আদর্শ-চরিত্র হইলে শিশুকে নিজ বিশুদ্ধ জীবন দিয়া তিনি উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু বিপরীত হইলে শিশু অল্প বয়স থেকেই আদর্শে অবিশ্বাসী হইয়া ওঠে। প্রত্যেক শিশুর রুচি ও শক্তি বিভিন্ন। তদনুযায়ী তাকে কাজ দিলে তার সুষ্ঠু আত্মবিকাশ ঘটে। কাহার রুচি ও শক্তি কোন দিকে সেটা আবিষ্কার করিবার দায়িত্ব শিক্ষকের। নিজ রুচি অনুযায়ী, শক্তি অনুযায়ী কাজের সুযোগ পাইলে উপযুক্ত প্রশংসা ও উৎসাহ পাইলে শিশু অসামাজিক অন্যায় পথ গ্রহণ করে না। রাশিয়ার অ্যান্টন্ ম্যাকারেংকোর নাম শিশুশিক্ষার জগতে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। অবাধ্য অপরাধপ্রবণ শিশুদের সংশোধনের ক্ষেত্রে তিনি যে সফলতা অর্জন করিয়াছেন তাহা কাহিনীর মত শোনায়। অপরাধপ্রবণ শিশুদের সংশোধনের জন্যে তাঁর ঝারঝিনস্কি বিদ্যালয়ে যারা রাশিয়ার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সব চেয়ে 'পাজী' 'বজ্জাত' সেইসব ছাত্রদের পাঠানো হইত। তিনি প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সফল হইয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন এমন কোন ছেলেমেয়েই নাই যে সংশোধনের যোগ্য নয়। প্রথম কাজ হইতেছে ছাত্রের আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা, তাহাকে সত্যি বিশ্বাস করা, তাহাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া। সঙ্গে সঙ্গেই দরকার তার শক্তি, প্রয়োজন, মনের গতি ও রুচি আবিষ্কার করা। সে অনুযায়ী কাজ দিয়া দশের সঙ্গে তাহাকে মিলাইয়া দিতে হইবে। তাহার রুদ্ধ আত্মাভিমানের খোসাটি ভাঙ্গিয়া বহুর জীবনের সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে তাহাকে মুক্তি দিতে হইবে। একটি ছেলের উদাহরণ দেওয়া যাক,—ভীষণ বদছেলে, কোন স্কুলে টিকিতে পারে নাই, মারধোর করে, শিক্ষকের সঙ্গে বেয়াদবী করে; নিতান্ত অবাধ্য, বদ্ মেজাজী, স্কুলের টুল বেঞ্চি কাটিয়া তচ্‌নচ্ করে। নিরুপায় হইয়া এ ছেলেকে

দেওয়া হয় ঝারঝিনস্কি বিদ্যালয়ে। প্রথম প্রথম সে অন্য ছেলেদের সঙ্গে মেশেনা, শিক্ষকদের কথার উত্তর দেয় না। ভাবখানা এই, "আমি তোমাদিগকে গ্রাহ্য করিনা।" শিক্ষকরা কিন্তু ওর আগের স্কুলগুলিতে ওর দুষ্কৃতির কথা একটুও আলোচনা করিলেন না। কোন প্রশ্ন করিলেন না, গালমন্দ করিলেন না। ছেলেরাও নিজেদের পড়া, হাতের কাজে, খেলাধুলা সব কিছুর মধ্যেই ওকে ডাকিত কিন্তু কোন জোরজবরদস্তি করিত না। ও ছেলে দেখিল খাওয়ার ঘণ্টার সময় সকলের সাথে খাইতে না গেলে খাওয়া মেলে না। খেলায় না গেলে নিজেকেই ঠকিতে হয়। আর তা ছাড়া ছেলেরা কত নানারকম হাতের কাজ করে। ক্রমেই ওর মন বিরক্তি ও ভয় কাটিয়া স্বাভাবিক হইতে আরম্ভ করিল। শিক্ষক ওর লেখাপড়া কাজের দিকে দৃষ্টি রাখিলেন। একদিন শিক্ষক লক্ষ্য করিলেন, ছেলেটির একটি এ্যাকর্ডিয়ন (বাদ্যযন্ত্র) আছে, সেইটি তাহার খুব প্রিয়। তিনি ছেলেটির সাথে বন্ধুভাবে আলাপ করিলেন, তাহাদের স্কুলে একটি ভালো কনসার্ট পার্টি গড়িয়া তুলিলে কেমন হয়। ছেলেটি উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দিল। তখন শিক্ষক এই ভার ওই ছেলেটির উপরই দিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই ছেলেটি স্কুলের আরও কয়েকটি ছেলেকে জোটাইয়া নানা বাদ্যযন্ত্র সম্বলিত একটি বাজনা ও গানের ক্লাব গড়িয়া তুলিল। তাহার পূর্বের অবাধ্যতা ইত্যাদি দূর হইল। এ ছেলে ভবিষ্যতে একজন প্রসিদ্ধ নেতা হইয়াছিল। এরকম উদাহরণ আরো অনেক আছে। রাশিয়া দেশে যদি এটা সম্ভব হইয়া থাকে, আমাদের দেশেও এটা হয় না কি?

এর পরের কথা হইতেছে সামাজিক পরিবেশ। ছেলেমেয়েদের মন যেমন গঠিত হয় পরিবার, পরিজন, শিক্ষক, বন্ধুবান্ধবের প্রভাবে, তেমনি যে সমাজের মধ্যে শিশু জন্মগ্রহণ করে, বড় হয়, তার আচার ব্যবহার, ধর্ম, দৃষ্টিভঙ্গী ও আর্থিক ব্যবস্থাও শিশুর মনকে প্রভাবান্বিত করে। দুর্নীতিপরায়ণ, অসংযত, অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের শিশুর ব্যবহারও অনুরূপ হইবে। অবমাননাপূর্ণ দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ও অস্বাস্থ্য বহুক্ষেত্রেই শিশুর অপরাধের জন্য দায়ী, এ কথাটা বুঝিতে কষ্ট হয় না। "দারিদ্র্যদোষো গুণ রাশি-নাশী"—ইহা একটি প্রাচীন ও বহু পরীক্ষিত সত্য। উদ্বাস্তু হইয়া যাহারা আসিয়াছে—তাহাদের পরিবারের

অনেক ছেলে মেয়ে নষ্ট হইয়া যায়, তাহার কারণ কি এই নয়, যে জীবিকা এদের অনিশ্চিত, প্রতিকূল ঘাতপ্রতিঘাতে এদের নীতিবোধ বিপর্যস্ত। প্রাচীন যে সমাজে তাহারা মানুষ সে সমাজের সুস্থ শাসনসংযম ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এদের সন্তানদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয় এটা আশ্চর্যের কথা নয়, এটাই বরং আশ্চর্যের কথা আরো অধিক সংখ্যায় এরা অপরাধপ্রবণ হয় নাই কেন! তার কারণ এদের অধিকাংশের দুঃসহ দুরবস্থা সত্ত্বেও ভদ্র মন এখনও মরিয়া যায় নাই, যাঁরা এখন প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও সুরুচি ও সততার আদর্শকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন তাঁহারা প্রণম্য। আর প্রশংসা প্রাপ্য দেশের সরকারী ও বেসরকারী বহু কর্মচারী ও প্রতিষ্ঠানের যাঁহারা অসাম্য দূর করিয়া, দেশের লোকের ভদ্র জীবিকার উপায় করিয়া, শিক্ষার বিস্তার করিয়া, অস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া, নূতন সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ ও দেশ গঠনে চেষ্টা করিতেছেন। সুস্থ উৎসাহপূর্ণ, সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি শিশু-অপরাধ সংশোধনের একটি শ্রেষ্ঠ উপায়। এ কাজে আমাদের সকলেরই দায়িত্ব আছে।

অবাধ্যতা ও সামাজিক পরিবেশ

শিশু অবাধ্য হইয়াই জন্মে না। শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে তাহার বংশধারা উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু শুধুমাত্র বংশগত বা জন্মগত অবস্থা দ্বারা ব্যক্তির ব্যবহারের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা মিলে না। ব্যক্তির প্রত্যেকটি ব্যবহার ও কর্মই তাহার নিজস্ব প্রবৃত্তি এবং সমাজপরিবেশের পারস্পরিক প্রভাবের ফল। মনোবিজ্ঞানীরা ক্রমশই সামাজিক পরিবেশের গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করিতেছেন। বিশেষ করিয়া অবাধ্য শিশুদের সম্বন্ধে যতই আলোচনা ও অনুসন্ধান হইতেছে ততই বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করিতেছেন যে অবাধ্য শিশুদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কতগুলি পরিবেশগত অবস্থা বর্তমান থাকে। এ অবস্থাগুলি বাধ্য শিশুদের ক্ষেত্রে থাকে না এমন নয়। কিন্তু এগুলি অবাধ্য শিশুদের ক্ষেত্রে অনেক বেশী পরিমাণে থাকে। অবশ্য এই পরিবেশগত অবস্থা মাত্র একটি নয়। ইহা নানা প্রকারের। এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ইহাদের গুরুত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে বর্তমান মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা পরিবেশের ভূমিকাকে পূর্বের চাইতে অনেক বেশী গুরুত্ব দিতেছেন। পুনরুক্তিদোষ ঘটিলেও এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে আপাতদৃষ্টিতে পরিবেশ এক হইলেও দুইটি শিশু ঠিক একই ব্যবহার প্রকাশ করে না। পরিবেশের ঠিক কোন অবস্থাটি কোন শিশুকে কি ভাবে ও কি পরিমাণে প্রভাবিত করিবে তাহা পূর্ব হইতে নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। ব্যক্তিত্বের সেই রহস্য আজও আমরা সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন করিতে পারি নাই।

তবুও সমাজপরিবেশ শিশুর ব্যবহারের গতি ও প্রকৃতি নির্ণয়ের সহায়ক এই মূল কথাটি মানিয়া নিয়াই অনুসন্ধানকারী পণ্ডিতের দল অগ্রসর হইতেছেন এবং সমাজপরিবেশের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে যে অবস্থাগুলির সম্বন্ধে বাধ্য ও অবাধ্য শিশুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রহিয়াছে সেইগুলি নির্ধারণ করিয়া তাঁহারা অবাধ্যতার কারণগুলি আবিষ্কার ও কিভাবে তাহার প্রতিকার সম্ভবপর সেই চিন্তা করিতেছেন।

বষ্টনের শিশু-মনোবিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসক মিঃ থম তাঁহার ভূয়ো-দর্শনের ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে শিশুর অপরাধপ্রবণতা ও অসামাজিক আচরণের মূল কারণ তাহার পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থার মধ্যেই নিহিত।[১] শ এবং ম্যাক্‌কে বিশ বৎসর আমেরিকার একুশটি বিভিন্ন নগরে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সমাজ সম্বন্ধের শৈথিল্য বা বিকার—যথা লোকসংখ্যার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন, অপরিসর বা অস্বস্তিকর বাসব্যবস্থা, দারিদ্র্য, ঘন ঘন বাসস্থান পরিবর্তন, বৃহৎ পরিবার সংখ্যা, বড়দের দুর্নীতিপূর্ণ ব্যবহার ইত্যাদি শিশু-অপরাধের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত।[২] ভ্যারাসিউস্ মনে করেন দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে হতাশা এবং প্রতিকার অসম্ভব এই বোধজনিত নিরুপায় অবস্থা বহু ক্ষেত্রেই শিশু-অপরাধের জন্য দায়ী।[৩]

বহু বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধানেই দেখা যায়—অপরাধীপ্রবণ শিশুদের পরিবারে দুর্নীতিপরায়ণতা বাধ্য শিশুদের তুলনায় বেশী, অবাধ্য শিশুদের পিতামাতার মধ্যে সম্বন্ধ অনেক ক্ষেত্রেই অসন্তোষজনক ও অপ্রীতিকর (broken homes), অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধপ্রবণ শিশুদের পরিবারে লোকসংখ্যা বেশী। অনেক অপরাধী শিশুর পিতামাতা তুলনায় বেশী দরিদ্র। যাহাদের পিতা নিম্নশ্রেণীর কারিগর বা মুদি বা দোকানদার তাহাদের সন্তানদের মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা বেশী। অনেক সময় দেখা যায় স্কুলের পড়াশুনায় অপরাধপ্রবণ শিশুরা বেশী পিছাইয়া পড়ে। সুতরাং এ সমস্ত অবস্থা শিশুর অবাধ্যতার সঙ্গে নিকট সম্বন্ধযুক্ত ইহা মনে করা অসঙ্গত নয়। কিন্তু ইহাও লক্ষ্যণীয় যে, এ সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সকল শিশুই অপরাধে প্রবৃত্ত হয় না। একই পরিবারের সমস্ত ছেলেমেয়ের সমাজ পরিবেশ মোটামুটি এক হইলেও হয়তো দেখা গেল সেই পরিবারের অন্যান্য শিশুরা শান্ত ও

---

১ D. A. Thom—Sociological changes predisposing toward Juvenile delinquency, American. J. Psychiat 1944. 100, pp. 452—455.

২ Shaw, Mckay & others—Juvenile delinquency and urban areas.

৩ W. C. Kvaraceus—Juvenile delinquency and social class, J. Educ. Social 1944 pp. 18, 51—54.

বাধ্য, কিন্তু একটি ছেলে অবাধ্য ও অপরাধপরায়ণ। অথবা বিপরীতভাবে 'দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ' ও দেখা যায়। সেজন্য রেক্‌লেস্ বলিয়াছেন "অবাধ্যতার কারণ হিসাবে পারিবারিক প্রভাব কি ভাবে কাজ করে তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। কারণ একই পিতামাতার সন্তানদের উপর একই পারিবারিক ঘটনা একই রকম প্রভাব বিস্তার করে না। কাজেই ইহা মনে করা অন্যায় নয় যে, কোন অবাধ্য শিশুর কাছে যে পারিবারিক অবস্থা বিষম অশান্তি ও উদ্বেগের কারণ হইতে পারে সেই শিশুর অন্যান্য ভাইবোনদের কাছে সেই একই অবস্থা হয়তো তেমন কিছু অশান্তির কারণ নয়।[৪] হিলি ও ব্রণারও ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন এবং মন্তব্য করিয়াছেন যে বাধ্য ও অবাধ্য এই দুই দল ছেলে-মেয়েদের তুলনা করিয়া দেখা যায় অবাধ্য ছেলেমেয়েরা পারিবারিক সাধারণ বিপত্তিকর পরিবর্তনে অনেক বেশী বিচলিত হয় কিন্তু তাহাদের বাধ্য ভাইবোনেরা অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকে।[৫]

পিয়েত্রোর বয়স তেরো বৎসর। তাহার পিতা ব্যাঙ্কে ভাল চাকরি করেন। মা ভাল লেখা-পড়া, গান-বাজনা জানেন। পিয়েত্রোর একটি ছোট বোন টেরেসা। তাহার বয়স ১০ বৎসর। ছোট, স্বচ্ছল, সুস্থ ও সুখী পরিবার। কিন্তু হঠাৎ একদিন চুরির অপরাধে পিয়েত্রোকে পুলিশ ধরিয়া নিল। আপাতদৃষ্টিতে সমাজ, পরিবেশ এবং বংশধারা কোন সূত্রেই এই ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীরা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া নিম্নলিখিত তথ্যগুলি জানিতে পারিলেন।

পিয়েত্রো সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে জন্মগ্রহণ করে। এখনও সে বেশ সুস্থ ও সবল। কিন্তু শিশুকালে তাহাকে খাওয়ানো নিয়া মার হয়রাণির এক শেষ হইত। বাচ্চা কিছুতেই বোতলে দুধ খাইবে না। বিদূষী মা-ও বই দেখিয়া, ঘড়ি ধরিয়া, ওজন করিয়া তাহাকে খাওয়াইবেনই। এমনি করিয়া শিশুকাল হইতেই মার জবরদস্তির কাছে শিশুর ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ। বড় হইয়াও মার তীক্ষ্ণ

---

৪. W. C. Reckless—*The etiology of delinquent and criminal behaviour.*

৫. Healy & Bronner—*New light on delinquency and its treatment.*

দৃষ্টি এড়াইবার জো নাই। কাপড়জামা পরা, খাওয়া, খেলা শোওয়া সবই মায়ের হুকুমে করিতে হয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে ইহাতে শিশুর অবচেতন মনে মাতার প্রতি একটি বিদ্বেষভাব সঞ্চিত হইতেছিল অথচ তাহার কোন সঙ্গত ও স্বাভাবিক প্রকাশের উপায় ছিল না। অন্যদিকে মার মনেও অবচেতনভাবে বিরক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গীত ও অঙ্কনে বেশ পটুতা ছিল। কিন্তু ছেলে হওয়ার পর এ সবই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। শিশুর প্রতি বিরূপতায় মায়ের অবচেতন মনেও একটি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ অপরাধবোধ (Guilt Consciousness) জাগ্রত ছিল। তাহার ধিক্কার হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্যই (Defence mechanism) তিনি শিশুর প্রতি অতিরিক্ত পরিমাণে যত্নশীলা হইয়াছিলেন এবং বাস্তবিক পক্ষে নিজের অনেক সুখ ও আরাম বিসর্জন দিয়াছিলেন। মনোবিজ্ঞানীদের মতে কিন্তু মার স্বাভাবিক স্নেহের অভাব (rejection) শিশুর অবচেতন মনে বিষম উদ্বেগ ও নিরাপত্তার অভাববোধ (insecurity) জাগাইয়া তাহাকে অশান্ত করিয়া তোলে।

দুই বৎসর পর টেরেসা যখন পেটে আসে তখন মার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। এদিকে খরচ কমাইবার জন্য তাহার স্বামী অন্য এক ছোট সহরে অন্য চাকরি নিয়া আসেন। তাহাতে সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইলেও আয় কিছু বাড়েই বরং। নষ্ট স্বাস্থ্যের জন্য একটি ঝি রাখা হয়, মাকে সাহায্য করিবার জন্য। টেরেসা রুগ্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং মা বাধ্য হইয়াই খাওয়ানো নিয়া জবরদস্তি হইতে বিরত থাকে। টেরেসা বোতলে দুধ খাইতে আপত্তি করে নাই। ক্রমে টেরেসা বেশ সুস্থ হাসিখুসী মেয়ে হইয়া বাড়িয়া উঠিতে থাকে। পিয়েত্রো গম্ভীর প্রকৃতির, কতকটা মুখচোরা। কিন্তু হাসিখুসী টেরেসাকে সকলেই বেশ ভালবাসিতে থাকে। সেও সমবয়স্ক ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বেশ সহজভাবে মিশিতে এবং সকলের প্রশংসা পাইতে থাকে। স্কুলেও সে শিক্ষয়িত্রীদের স্নেহ আকর্ষণ করে এবং প্রশংসা পাইয়া নানা বিষয়ে পটুতা লাভ করে। তার মাও তাহার নষ্ট সামাজিক মর্যাদা উদ্ধারের ইচ্ছায়ই যেন মেয়েকে নাচ, গান, অংকনে যথেষ্ট উৎসাহ দিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের হারানো যৌবন ও সৃষ্টির আনন্দ যেন মেয়ের মধ্য দিয়াই চরিতার্থতা

খুঁজিতেছিল। টেরেসা পড়াশুনায় বেশ ভাল ছিল এবং পরীক্ষায়ও ভাল ফল করিবার জন্য তাহাকে ডবল প্রমোশন দেওয়া হইয়াছিল। সে ছিল যেন সংসারটির মধ্যমণি।

অন্যদিকে পিয়েত্রো বুদ্ধির মাপে (1,Q) টেরেসার চেয়ে খাটো না হইলেও ক্রমেই লেখাপড়ায় পিছাইয়া যাইতে থাকে এবং যে সময়ের কথা বলা হইতেছে সে বছর সে ফেল করিয়া নীচের ক্লাশেই থাকিয়া যায় এবং নীচের ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে পড়িতে স্বভাবতই তার মর্যদাবোধ ক্ষুণ্ণ হয়। সে আগেও মিশুক ছিল না এবং ইহার পর আরো সঙ্গীহীন ও স্ফূর্তিহীন ম্রিয়মান হইয়া থাকিত। বাড়ীতে লোকজন আসিলে মা-বাবা টেরেসার গুণের কথাই বলিতেন। তাহার নাচ, গান, আঁকা অতিথিরা প্রশংসা করিতেন। তা ছাড়া প্রসংসা গৌরবে গর্বিতা টেরেসা পিয়েত্রোকে মাঝে মাঝে ঠাট্টাও করিত। বিশেষ করিয়া যেদিন সে চুরি করে সেদিন পিয়েত্রোর মন খুবই খারাপ ছিল। স্কুলে সে মাষ্টার মহাশয়ের বকুনি খায়। বাড়ীতেও মার বকুনি। তাছাড়া টেরেসা ওর কয়েকটি বন্ধুর সামনে ওকে বেশ ঠাট্টা করে।

পুলিশ আসিয়া চুরির জন্য ওকে খোঁজ করা মাত্র ও বাবা-মা, প্রতিবেশী, শিক্ষক, টেরেসা ও তার বন্ধুদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল। তাহার মন যেন বলিল "কেমন আমি নাকি কিছুই করিতে পারি না?" তাহার অবজ্ঞাত শিশু-ব্যক্তিত্ব যেন এই নাটকীয় ব্যাপারের মধ্যেই এক অদ্ভুত তৃপ্তি খুঁজিয়া পাইল।[৬]

এ ঘটনার ব্যাখ্যায় Merrill লিখিতেছেন—

"So it is that our social frames of reference are so important that social behaviour can be understood only in relation to the interplay of dynamic factors within the person in relation to his effective environment". অর্থাৎ মানুষের পরিবেশ এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষের সামাজিক আচরণ বুঝিতে গেলে ইহা বিবেচনা করা একান্ত আবশ্যক, কারণ সমাজ-পরিবেশই মানুষের ব্যবহারকে প্রভাবিত করে।

৬. Maud. A. Merrill—*Problems of Child Delinquency*—pp 60—63.

কিন্তু পরিবেশ মানুষের মন বা অবচেতনাকে কেন ও কি ভাবে দোলা দেয় তাহা এখনও আমরা সম্পূর্ণ জানিনা। শুধু এটা মাত্র বোঝা যায় আপাত-দৃষ্টিতে পরিবেশ এক হইলেও প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এ পরিবেশের তাৎপর্য ঠিক এক নয়।

ফ্রএডপন্থীরা ইহা ব্যাখ্যার জন্য অবচেতন মনের বিশ্লেষণের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন মনে করেন।

কিন্তু রাশিয়ার মনোবিজ্ঞানী বা শিক্ষাব্রতীরা ফ্রএড-এর অবচেতন-তত্ত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন শিশুর অবাধ্যতার জন্য দায়ী, হয় তাহার দৈহিক কোন রোগ বা বিকার, অথবা তাহার পরিবেশগত কোন ত্রুটি। তাঁহারা বলেন, অবাধ্য শিশু যদি রুগ্ন হয় তাহা হইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন সযত্ন পরীক্ষা দ্বারা তাহার রোগ নির্ণয় করা। যদি সে রুগ্ন না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাহার পরিবেশের মধ্যেও এমন কোন ত্রুটি আছে যাহাতে তাহার নিজস্ব শক্তির উপযুক্ত সদ্ব্যবহার সে করিতে পারিতেছে না।

লেলিনগ্রাদের স্কুলের একটি ভীষণ অবাধ্য ছেলে। স্কুলে বাড়ীর কাজ প্রস্তুত করিয়া আনে না। ক্লাশে শিক্ষকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। একদিন সে শিক্ষককে পাথর ছুঁড়িয়া মারিতে উদ্যত হইল। ইতঃপূর্বেও এ ছেলের ব্যবহার সম্বন্ধে ক্লাশের কমিটিতে আলোচনা হইয়াছিল। প্রধান শিক্ষকও ক্লাশের শিক্ষকের সঙ্গে এ ছেলের সংশোধনের বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। যখন দেখা গেল যে সংশোধন তো হয়ই নাই বরং ছেলেটির অবনতিই ঘটিতেছে, তখন স্কুলের কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে শিক্ষকটি ছাত্রটিকে দেখিতে পারেন না। ছাত্রটির আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয় এমন গালাগালি করিয়া থাকেন। অবশ্য ছেলেটির আরো অনেক দোষও ছিল। পরামর্শ করিয়া ছেলেটিকে অবাধ্য ছাত্রদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ে পাঠানোই স্থির হইল। সে দেশে এই সব বিশেষ স্কুলে ভর্তি করাটা যে 'শাস্তিমূলক' এরূপ ধারণা জন্মানো হয় না। ছেলেটিকেও বলা হইল তাহাকে অন্য নতুন বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হইবে, যেখানে তাহার বিরক্তিকর শিক্ষক থাকিবেন না। সেই নতুন স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কাছে পূর্বেই ছাত্রটির সম্পূর্ণ বিবরণ (record) পাঠানো হইয়াছিল। সেই প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর অসামান্য

সাফল্যের মূল কারণ ছিল যে তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, প্রত্যেক অবাধ্য শিশুকেই তাহার নিজস্ব প্রকৃতি বিকাশের সুযোগ দিলে সংশোধন করা যায়। এ অবাধ্য ছেলেটিকে তাহার মা ভর্তি করাইতে গিয়া তাঁহার ছেলের কুকীর্তির লম্বা ফিরিস্তি দিতে আরম্ভ করিতেই প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মাকে ধমক দিয়া থামাইয়া দিলেন। তিনি ছেলেটির সঙ্গে দৃঢ়তার সঙ্গে অথচ অন্তরঙ্গতার সহিত আলাপ করিলেন। তাহার হাতের কাজের প্রশংসা করিলেন। ক্লাশে তাহাকে প্রথম নিয়া গিয়াও অন্য ছাত্রদের সঙ্গে পরিচয় করাইবার সময় তাহার অতীত দুষ্কৃতির কোন উল্লেখ তো করিলেনই না, বরং বলিলেন—তাহার বাড়ী হইতে এই স্কুলটা কাছে হয় বলিয়াই বছরের মাঝখানে সে পূর্ব স্কুল হইতে এই স্কুলে বদলি হইয়া আসিয়াছে। অল্পদিনের মধ্যেই নতুন স্কুলের উৎসাহকর পরিবেশে ছেলেটি বেশ ভাল হইয়া উঠিল।[৭]

পূর্বেই বলা হইয়াছে শুধু পরিবেশ নয়, ব্যক্তির চরিত্রও বিবেচনা করিতে হইবে। ব্যক্তির চরিত্র ও তাহার পরিবেশ পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে, গঠিত করে, পরিবর্তিত করে। কুসংসর্গের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এবার আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে অধিকাংশ অপরাধপ্রবণ শিশু দরিদ্র পরিবার হইতে আসে। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে অপরাধপ্রবণদের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা, বাধ্য সুস্থ শিশুদের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশী। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। দারিদ্র্যের মধ্যে শুধু যে সাংসারিক নিতান্ত প্রয়োজনীয় সুখ সুবিধা ও আরামের অভাব ঘটে তাহা নহে, তাহার মধ্যে অনেক সময়ই আছে গ্লানি ও অপমান। দারিদ্র্যের বদ্ধ আবহাওয়ায় ব্যক্তিত্বের সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশ পদে পদেই বাধা পায়। কিন্তু তথাপি এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে দারিদ্র্যই মূল কথা নয়—দারিদ্র্য কোন বিশেষ ব্যক্তিকে হয়তো আহত ও ক্ষুব্ধ করে, তাহাকে তিক্ত ও বিদ্রোহী করিয়া অপরাধের মুখে ঠেলিয়া দেয়; আবার অনুরূপ অবস্থাতে অন্য আর এক ব্যক্তিকে হয়তো তাহা পরিশ্রম ও বুদ্ধি ব্যবহারের দ্বারা নিজ ও পরিবারের অবস্থার উন্নতি

৭ Beatrice King—*Russia goes to school* pp. 34—35,

করিতে উদ্বুদ্ধ করে। এই ব্যক্তির পক্ষে দারিদ্র্য একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ, ইহা তাহার ব্যক্তিত্বকে দৃঢ়তর ও সমুন্নত করে।

দেবেন্দ্র পাঁচ বৎসর পূর্বে বরিশাল হইতে বাস্তুহারা হইয়া আসিয়াছে। তাহার ছয়টি ছেলেমেয়ে। আগে দেশে থাকিতে পৌরোহিত্য করিয়া সংসার চালাইত। বাস্তুহারা হইয়া আসা অবধি সে পুনর্বাসন কর্তৃপক্ষের প্রকাণ্ড মাথাব্যথা। সে এক ক্যাম্প হইতে অন্য ক্যাম্পে গিয়াছে। সৎ, অসৎ নানা উপায়ে সাহায্য লইয়াছে—অন্যান্য বাস্তুহারাদের সঙ্গে বিবাদ করিয়াছে, দুবার ক্যাম্প সুপারিন্‌টেনডেন্টকে মারপিট করিয়াছে। সে ব্রাহ্মণ, এই অভিমান তার প্রচণ্ড। তাহা ছাড়া তাহার কোন পূর্ব-পুরুষ রাজা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন—ইহা সে প্রচার করিয়া থাকে। খাটিয়া খাওয়া তাহার পক্ষে অসম্মানজনক। তাই সরকার হইতে জমি পাইয়াও সে কোন কাজে স্থায়ী ভাবে বসে নাই। তাহার পরিবারটি সদা অসন্তুষ্ট—সর্বদাই পরের নিন্দা-পরায়ণ এবং আত্মপ্রশংসায় মুখর। বড় ছেলেটি কোন স্কুলে টিকিয়া থাকিয়া পড়াশুনা করে না, সুযোগ পাইলেই চুরি করে। ইহাতে বাপ মায়ের বরং প্রশ্রয় আছে, যেদিন চুরি করিয়া বেশি পয়সা আনে সেদিন বাড়ীতে ভাল খাওয়া হয় আর সেদিন তাহাদের 'ফুটানী'তে পাড়া প্রতিবেশী অতিষ্ঠ হয়। এ ছেলেকে কয়েকবার পুলিশে ধরিয়াছে। কোর্টে হাজির করিলে পুলিশ ও পুনর্বাসন বিভাগের প্রত্যেকটি লোক চোর ইহা সে চীৎকার করিয়া বলিয়াছে। শেষে ধমক খাইয়া ও শাস্তির ভয়ে দোষ স্বীকার করিয়া, অল্প শাস্তি পাইয়া খালাস পাইয়াছে। দারিদ্র্যই এই পরিবারের চরিত্রের কদর্য দিকটা ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

আর একটি প্রায় সমবস্থ পরিবারের ছবি। ইহারাও প্রায় একই সময়ে ত্রিপুরা জিলা হইতে উদ্বাস্তু হইয়া আসিয়াছে। এই পরিবারের কর্তা কোন ঔষধের দোকানে সামান্য চাকরি করেন। ছেলে মেয়ে সাতটি। স্ত্রী রুগ্না। দুবার যক্ষ্মা-রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। বড় মেয়েটিকেও একবার এই বিষম রোগ আক্রমণ করিয়াছিল। পিতার সামান্য আয়ে সংসার চলে না। চিকিৎসা ও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া তো দূরের কথা। ভাগ্যক্রমে দূর-সম্পর্কীয় নিঃসন্তান এক শিক্ষক কয়েকটি ছেলেমেয়ের ভরণপোষণের ভার

লইয়াছেন। অন্য দুটি মেয়েকে মহদন্তকরণ এক ডাক্তার পালন করিয়াছেন—শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং মা ও বড় মেয়েটিকে চিকিৎসার দ্বারা সুস্থ করিয়াছেন। যাদবপুর এক জবর-দখল কলোনীতে ইহারা একটু আশ্রয় লইতে পারিয়াছিল কিন্তু এই কলোনী সরকার স্বীকার করিয়া লন নাই এবং তাই উদ্বাস্তুদের অন্য সুবিধা ইহারা পায় নাই। মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে কোন কোন সাহায্য নিশ্চয়ই মিলিত কিন্তু দরিদ্র হইয়াও ইহারা আত্মসম্মান হারায় নাই। ইহারাও ব্রাহ্মণ। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিয়া খাটিয়া খাইতে লজ্জা বোধ করে নাই। বড় মেয়েটি একটি রিফিউজী ক্যাম্পে শিক্ষকতা করে। বড় ছেলেটি রেলওয়েতে একটি কেরাণীর কাজে ঢুকিয়াছে। মেজো ছেলেটি আই এস-সি পাশ করিয়া একটি ব্যবসায়ী ফার্মে কেরাণীর কাজে সম্প্রতি ভর্তি হইয়াছে। রাত্রিতে 'বি কম্' পড়ে। ক্লেশ হইলেও অন্যান্য বোনদের ইহারা পড়াইতেছে। সংসারে দুঃখ দারিদ্র্য, অনটন, রোগ, ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা সবই আছে। কখনও কখনও হয়তো তিক্ততা আসে, বিশ্বাস হারায়—কখনো হয়তো অসহ্য অভাবে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার পথে যাইবার প্রলোভনও আসে। তবুও এ পরিবার নষ্ট হইয়া যায় নাই—ইহাদের প্রবল আত্মমর্যাদা-বোধ ও আদর্শবাদ ইহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে ও মহৎ প্রচেষ্টার পথে অগ্রসর করিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য দেশ দারিদ্র্য মাত্রকেই হীনতা বলিয়া ঘৃণা করিয়াছে। তাই সে দেশে দরিদ্র হওয়া বড় লজ্জার কথা। তাই দারিদ্র্য সেখানে মনুষ্যত্বকে ক্ষুণ্ণ করে। প্রাচীন ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু ভিন্ন। সাংসারিক সমৃদ্ধিকে ভারতবর্ষ সর্বোচ্চ মূল্য দেয় নাই। ব্রাহ্মণের তাই দরিদ্র হইতে লজ্জা নাই। 'বুনো রামনাথ' মোটা ভাত ও তেঁতুলপাতার ঝোল তাঁহার বিদ্যাচর্চার পথে যথেষ্ট বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রীর হাতের সামান্য মূল্যের লোহা ও মোটা বসন রাণীর স্বর্ণ-অলঙ্কার, বসন-ভূষণের কাছে লজ্জা বোধ করে নাই।

আর একটি অবস্থাও অবাধ্যতার সঙ্গে প্রায়শঃ একত্র দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা হইতেছে গৃহে শাসনের শৈথিল্য বা আধিক্য। গ্লুয়েক্ (স্বামী-স্ত্রী) এর বই হইতে তাঁহাদের পর্যবেক্ষণের ফল দেওয়া হইল। প্রায় সমবস্থ ১৫৩টি

অবাধ্য এবং ২৯৮টি বাধ্য ছেলে নিয়া তাঁহারা পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন অবাধ্যদের বেলায় গৃহের শাসনের শৈথিল্য বা আধিক্য শতকরা ৯৫%, কিন্তু বাধ্যদের বেলায় এ ত্রুটি ৭%। আবার বাধ্যদের বেলায় দেখা যায় প্রায় শতকরা ৭০% ক্ষেত্রে পিতামাতার সুশাসন বর্তমান, কিন্তু অবাধ্যদের ক্ষেত্রে ইহার শতকরা হার মাত্র ১৫%।[৮]

শিশুর কাছে পিতামাতা ও পরিজনের প্রভাব অসামান্য। শিশুর জীবনের প্রধান দুটি প্রয়োজন স্নেহ ও নিরপত্তা বোধ। পারিবারিক সম্বন্ধ অপ্রীতিকর বা অস্বস্তিকর হইলে শিশু দেহে মনে সুস্থ হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। কাজেই যেখানে পিতামাতার মধ্যে সম্বন্ধ বিসংবাদের, অথবা যেখানে ঘরে বিমাতা বা বি-পিতা সেখানে শিশু স্বাভাবিক স্নেহবঞ্চিত ও নিরাপত্তা বোধের অভাবে তাহার ব্যক্তিত্ব বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ সব ক্ষেত্রে বাড়ীর প্রতি টান কম হওয়াই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে দুটি পরীক্ষার উল্লেখ করা যাইতেছে। দুই পক্ষেই ১০০টি ছেলে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল।

	অবাধ্য	বাধ্য
বাড়ীর প্রতি খুব অনুরক্ত গৃহ-কেন্দ্রিক আগ্রহ	১৭	১৭
বাড়ী বেশ ভাল লাগে—অবসর সময় বাড়ীতেও কাটায় বাহিরেও কাটায়	৩৪	৬৪
বাড়ীর সম্বন্ধে আগ্রহহীন	২৪	১২
বাড়ীতে না থাকিতেই পছন্দ করে অধিকাংশ সময় বাহিরেই কাটায়	১১	৬
বাড়ীতে থাকিতেই বিরক্ত হয়—পারিলে বাড়ীতে থাকিতে চায় না	১২	১
অ-শ্রেণী বিভক্ত	২	০
	১০০	১০০

পিতা ও মাতা উভয়ের প্রতিই অনুরক্ত

[৮] S. Glueck & E. Glueck—*One thousand Juvenile delinuqents* pp. 186—87.

	অবাধ্য	বাধ্য
পিতামাতার সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা বিদ্যমান	৩০	৪১
পিতা বা মাতার প্রতি বিরূপতা নাই তবে হয়তো পিতা বা মাতার একজনকে বেশী ভালবাসে	৪৪	৪৭
পিতা বা মাতা বা দুজনের প্রতিই কিছুটা বিরূপ	১১	৯
পিতা বা মাতা একজনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এবং অন্যের প্রতি টান—মানসিক অস্থিরতা (conflicting attitude)	১১	২
অ-শ্রেণী বিভক্ত	৪	১
	১০০	১০০

শিশুর পক্ষে পিতামাতা শুধু স্নেহ ও আগ্রহের স্থল নহেন—তাঁহাদের হাতে আবার আছে শাসন পীড়নের ভার। কাজেই পিতামাতার প্রতি শিশুর মনোভাবের মধ্যে একটা দ্বৈততা ও বিরোধ আছে। একদিকে সে বাপমাকে ভালবাসে ; অন্যদিকে তাহাদিগকে সে ভয় করে ; কাজেই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দুই শক্তির মধ্যে শিশুর মন দোলা খায়।* অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের মধ্যে স্বাভাবিক সমন্বয় ঘটে কিন্তু ফ্রয়েডপন্থীদের মতে এই বিরোধ অনেক সময় শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথে বাধা জন্মায় এবং তাহার অবচেতন মানসে জটিলতার সৃষ্টি করে।

স্কুলের নূতন পরিবেশে মানাইয়া চলা শিশুর পক্ষে আরও অনেকটা কঠিন। সেখানে স্নেহ ও শাসনপীড়নের বিরোধ গৃহ হইতে বরং আরও বেশী।

* Katz লিখিতেছেন—"the parents are on the other hand......a source of security to the child and the main means of the satisfaction of his wants. Thus they become powerful, friendly beings with whom he identifies himself......on the other hand the father and the mother are also disciplinary agents who enforce rules and regulations which interfere with the child's egoistic pleasures.—*Effect of the family on Child personality* ; Introduction to Psychology. Boring, Langfeld and Weld. pp. 58-63.

শিক্ষক ও সমবয়স্ক সঙ্গী সাথী একদিকে তাহাকে আকর্ষণ করে অন্যদিকে তাহাকে নানাভাবে আঘাত করে, বিব্রত করে। সাধারণতঃ দেখা যায় অপরাধপ্রবণ অবাধ্য শিশুরা বাধ্য স্বাভাবিক শিশুদের তুলনায় নিজেদের কম খাপ খাওয়াইতে পারে। তাই তাহারা ইস্কুলে বেশী মারামারি করে, ক্লাসে অমনোযোগী হয়, গোলমাল করে। এই সব অশিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা তাহারা নিজেদের প্রতি শিক্ষক ও সহপাঠীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইতে চায়। ক্লাসে পড়াশুনায় পিছাইয়া পড়াতে তাহাদের আত্মসম্মান আহত হয়—আর এই ভাবে তাহারা সেই ক্ষতিপূরণ করিতে চেষ্টা করে (over-compensation)।

স্কুলের প্রতি অবাধ্য ও বাধ্য দুইদল ছাত্রের মনোভাব নিয়া একটি পরীক্ষার ফল দেওয়া হইল। ১০০টি অবাধ্য ছাত্র পরীক্ষা করা হইল তাহাদের মধ্যে ৩০ জন স্কুলে পড়িতেছে এবং ৭০ জন যাহারা স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছে। অনুরূপভাবে ১০০টি বাধ্য ছাত্র পরীক্ষা করা হইল, তাহাদের মধ্যে ৬৯ জন স্কুলে পড়িতেছে এবং ৩১ জন যাহারা স্কুল ছাড়িয়া গিয়াছে :—

	অবাধ্য শতকরা হার				বাধ্য শতকরা হার			
	স্কুলে পড়িতেছে		স্কুল ছাড়িয়াছে		স্কুলে পড়িতেছে		স্কুল ছাড়িয়াছে	
স্কুল খুব ভাল লাগে	১১	৭১.৫%	৬	৪৪%	৬১	১৬%	১৪	৬৮%
স্কুল পছন্দ করে	৯		২৫		৫		৭	
স্কুল সম্বন্ধে উদাসীন	৬	২৮.৫%	২২	৫৬%	১	৪%	৮	৩২%
স্কুল অপছন্দ করে	২		১১		২		২	
স্কুলের প্রতি ভয়ানক বিমুখ	—		৬		—		—	
অ. শ্রেণী বিভক্ত	২		—		—		—	
	৩০		৭০		৬৯		৩১	

শিশু নিজ বাড়ীতেও যেমন স্কুলেও তেমন স্নেহ ও নিরাপত্তার প্রত্যাশা করে। যদি স্কুলে বাড়ীর তুলনায় তাহার শিশু জীবনের এই মৌলিক প্রয়োজনগুলি মিটাইবার সুযোগ পায় তাহা হইলে স্কুল তাহার বাড়ীর চেয়ে ভাল লাগে। যদি ইহার বিপরীত হয় তবে সে স্কুলে অস্বস্তি বোধ করে এবং অনত্র তাহার ক্ষুণ্ণ ব্যক্তিত্বের আঘাত সংশোধনের ক্ষেত্র খোঁজে। স্কুলে শিক্ষক

বা শিক্ষিকার স্বাভাবিক স্নেহ ও উৎসাহ লাভ করিতে পারিলে শিশু নিজেকে ধন্য মনে করে এবং সে ক্ষেত্রে সে উৎসাহের সঙ্গে যাহা কিছু ভাল তাহার মধ্যে আছে তাহা ফুটাইয়া তুলিয়া অধিকতর প্রশংসা অর্জন করিতে চেষ্টিত হয়। আর যেখানে শিক্ষক বা সহপাঠিদের অবহেলা বা বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হয় সেখানে তাহার আত্মবিকাশের ধারা রুদ্ধ বা বিকৃত হয়। হয়তো স্কুলে আসিবার পূর্বেই শিশুর গৃহে তাহার নিরাপত্তা বোধ বিপন্ন হইয়াছে, স্কুলে আসিয়াও তাই সে স্বস্তি বোধ করে না ও নিজেকে মানাইয়া চলিতে পারে না। মিরিয়াম্ ক্যান্ ওয়েটারস্ লক্ষ্য করিয়াছেন—The child enters school with certain past social experiences in mind. He enters with a fixed emotional attitude compounded of success and failures at home. In school he encounters another circle of adults and children each capable of being a source of comfort or anxiety. School is to him another arena where he wins or loses approval of other human beings, thus adding self-esteem and enriching personality or deepening sense of guilt and inferiority. In school he carries his ready-made rebellion and submission, fear of failure, dependence or self-reliance. These new adults, the teachers, are simply other parents rewarding, blaming, petting, loving or criticising according to their own mysterious standards. সুতরাং শিক্ষক বা শিক্ষিকার দায়িত্ব অনেকখানি। তাঁহার সহৃদয় ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা, উপযুক্ত উৎসাহ ও চালনা দ্বারা তিনি শিশুর মধ্যের শ্রেষ্ঠগুণগুলি বিকশিত করিয়া তুলিতে পারেন অথবা তাঁহার নির্মমতা ও স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা তিনি শিশুর নিরাপত্তা বোধ ক্ষুণ্ণ করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশকে পঙ্গু করিয়া দিতে পারেন।

শিশুর ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশ সমস্ত শিক্ষানীতিরই উদ্দেশ্য। রূশোর পর হইতে সমস্ত আধুনিক শিক্ষানীতিই শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর স্বাধীনতা স্বীকারের পক্ষপাতী। মন্তেসরী ও ড্যাল্টনের শিক্ষাবিধিতে ইহার বাস্তব রূপ দিবার চেষ্টা

হইয়াছে। ইহার একটি ফল হইয়াছে শিক্ষকের দায়িত্ব-হ্রাস। শিক্ষক যেন কতকটা নিষ্ক্রিয় দর্শকে পরিণত হইয়াছেন। ইহার ফল কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আশানুরূপ হয় নাই। সোভিয়েট দেশ রাশিয়ায় প্রথম দিকে শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টায় তাঁহারা শিশুর স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া যে পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেখানে তাঁহারা শিশু কি পড়িবে, কতটুকু পড়িবে, কি ভাবে পড়িবে, ক্লাশে অবাধ্য ছেলেদের শাসন কি হইবে এই সমস্ত বিষয়েই স্বাধীনতা দিয়া দেখিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসরের পরীক্ষার পর তাঁহারা দেখিলেন ফল সর্বত্র শুভ হয় নাই। এই সব নূতন পরীক্ষার ফলে "ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ হ্রাস পাইয়াছে, শিক্ষকের মর্যাদা ও সক্রিয়তা লোপ পাইয়াছে এবং এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে প্রত্যেক ছাত্র কতটুকু অগ্রসর হইতেছে সেদিকে প্রায় কোন দৃষ্টিই দেওয়া হইতেছে না।"[১০] শিক্ষাব্রতীদের দেশব্যাপী পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলে তাঁহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে শিশুর অপরিণত মন তাহার নিজের পক্ষে কি ভাল, কি মন্দ তাহা বিচার করিতে পারে না। শিক্ষকের উপর, পিতামাতা গুরুজনের উপর, তাহারা স্বাভাবিক ভাবে নির্ভর করে। তাঁহাদের বিশ্বাস করে, তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হইতে, তাঁহাদের প্রশংসা পাইতে তাহারা ভালবাসে। সাধারণতঃ ইহাতেই তাহাদের কল্যাণ। শিশুর সুষ্ঠু বিকাশ তখনই সম্ভব হয়, যখন সমাজব্যবস্থাও সুশৃংখল ও অবিচারমুক্ত হয়। শিশুকে ছোটসময় হইতেই ভদ্রতা, পরের প্রতি বিবেচনা ইত্যাদি সদ্‌গুণ শিখাইতে হয়। ইহার জন্য শিক্ষক ও পিতামাতার সক্রিয় চেষ্টা প্রয়োজন।[১১]

অনেক মনোবিজ্ঞানীই মনে করেন শিশুর অবাধ্যতা বা অপরাধপ্রবণতার একটি প্রধান কারণ হইতেছে, শিশুর আত্মবিকাশের সুযোগের অভাব ও তাহার অবসর সময় তৃপ্তিকর ও গঠনাত্মকভাবে আত্মনিয়োগের অসুবিধা। অধিকাংশ অবাধ্য ছেলেকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় "অবসর সময় কি করে কাটাও?" উত্তর পাওয়া যায়, "কি আর করব? ঘুরে বেড়াই।" হিসাব করিয়া দেখা যায় বাধ্য ও স্বাভাবিক ছেলেমেয়েরা খেলাধূলা, দল বাঁধিয়া বেড়াইতে যাওয়া,

১০ Decree of the Central Committee, C. P. 25th Aug., 1932

১১ Beatrice King, *Russia Goes to School*, P. 32

পিক্‌নিক্ ইত্যাদির সুযোগ সুবিধা অবাধ্য বা অপরাধপ্রবণদের চেয়ে বেশী পায়। কিন্তু অলস আমোদে অপরাধপ্রবণেরা বেশী সময় কাটায়। সপ্তাহে একবারের বেশী সিনেমা দেখতে যায় অপরাধপ্রবণেরা অনেক বেশী।[১২] অবশ্য এ পরীক্ষা আমেরিকার ছেলে মেয়েদের মধ্যে করা হইয়াছিল।

শিশুরা যাহাতে তাহাদের অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারে সে জন্য সে-সবদেশে যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হয়। স্কুলে এবং স্কুলের বাহিরে ছেলে-মেয়েদের খেলাধূলা, দেশভ্রমণ ইত্যাদির নানা ক্লাব আছে। বয়স্কাউট্ ইত্যাদি সংস্থায় আনন্দের সঙ্গে কুশলতা লাভ ও শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। রাশিয়া বোধ হয় এ বিষয়ে ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকার চেয়ে বেশী অগ্রসর। সেখানে অবসরযাপনকেও দেশসেবা ও আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যমুখী করিবার চেষ্টা বেশী দেখা দেয়। নানারকম লাইব্রেরী ও প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে ছেলে-মেয়েরা অবসর সময়ে নিজ খুসী মত লেখাপড়া বা নানা শিল্পকর্ম শিক্ষা করিতে পারে। ক্লাশে-শেখা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের হাতে-কলমে ব্যবহার যাহাতে তাহারা করিতে পারে সে জন্য নানা ল্যাবরেটরী বা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করিবার সুযোগ তাহারা পায়। ছুটির সময় দল বাঁধিয়া গ্রামে গিয়া তাহারা কৃষকদের শস্য কাটিতে আনন্দের সঙ্গে সাহায্য করে, বদ্ধজলা পরিষ্কার করে, রাস্তা ঘাট বানায়। সে দেশের বড়রা ও ছোটরা সকলেই বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছে যে "শ্রমই শৌর্য, শ্রমেই সম্মান ও সর্বোচ্চ সার্থকতা।" রাশিয়ায় ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের পর দেশের উপর নানা বিপর্যয় দেখা যায় এবং শিশুদের মধ্যে অপরাধ এত ভয়ানক বাড়িয়া গিয়াছিল যে সে-দেশের রাষ্ট্র-প্রধানেরা বিষম চিন্তিত হইয়া পড়েন। দেশব্যাপী এই সংকল্প দেখা দেয় যে ইহা দূর করিতেই হইবে। ১৯২০ সাল হইতেই Commissariat of Justice এবং Commissariat of Education একযোগে এই কাজে ব্রতী হন এবং অবাধ্য শিশুদের জন্য আলাদা Home বা Colony তৈরী করা হয়। অবাধ্য শিশুদের সুস্থ করিবার কাজে অ্যান্‌টন্ ম্যাকারেংকো যে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহার তুলনা নাই। ১৯৩৬ সালের মধ্যে রাশিয়ায় এ সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান তাঁহারা করিয়াছিলেন। ইহার জন্য অবশ্য দেশের

[১২] M. Merrill, *Problems of Child Delinquency*, P. 90-91

লোকের ও বিশেষ করিয়া সে-দেশের শিক্ষক ও সমাজকর্মীদের সহযোগিতাই দায়ী। আমাদের দেশেও আমরা এ শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি। রাশিয়া বিশ্বাস করিয়াছে, "জন্মগত অপরাধপ্রবণতা বলিয়া কিছু নাই। কোন অপরাধপ্রবণ শিশুই এমন নয় যে তাহার সংস্কার হইতেই পারে না। প্রধান কাজ প্রত্যেক শিশুর মধ্যে আত্মমর্যাদা বোধ জাগ্রত করা। ইহার জন্য শিশুকে যথাযোগ্য সম্মান ও অনেকখানি স্বাধীনতা দিতে হইবে। কাজ ও শ্রমই অবাধ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক। শিশুর শ্রমকে দশের সঙ্গে যুক্ত করিতে হইবে। গঠনাত্মক কাজের মধ্য দিয়া শিশুর শক্তিকে বিকশিত করিয়া অপরাধ ও পাপের প্রলোভন দূর করিতে হইবে। গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজ পরিবেশ বিশুদ্ধ ও উৎসাহপূর্ণ হইলে শিশু অপরাধের পথে যায় না।"[১৩] এ সমস্ত সিদ্ধান্ত বহু বাস্তব পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং আমরা মনে করিতে পারি ইহা সর্বদেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

---

১৩ D. Levin. *Soviet Education.*

অপরাধপ্রবণদের শ্রেণী বিভাগ

যিনি বিচারক তাঁহার চোখে অপরাধপ্রবণতা হইতেছে সমাজের শৃঙ্খলা ভঙ্গ। বিচারক সমাজের ভৃত্য। যাহারা সমাজকে লঙ্ঘন করে তাহাদের ন্যায় বিচার ও অবস্থা অনুযায়ী শাস্তি বিধানই তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্ব। অপরাধীকে শাস্তি দিয়া, তাহার স্বাধীনতা খর্ব করিয়া, তাকে আরো অন্যায় কার্য হইতে তিনি নিরস্ত করেন, সমাজকেও ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করেন। অপরাধকে তাই তিনি বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিতেই অভ্যস্ত। চোর যে, সে চৌর্য অপরাধে দোষী, সুতরাং তাহার অপরাধেরশাস্তি আইনের ধারা অনুযায়ী তাহাকে দেওয়া হইলেই বিচারকের কর্তব্য শেষ হইয়া গেল, একথা তিনি মনে করিতে পারেন—অধিকাংশ সময়েই তিনি তাই মনে করেন। কিন্তু মনোবিজ্ঞানী বা সমাজ-বিজ্ঞানী যাঁহারা তাঁহারা কিন্তু এই বহির্দৃষ্টি দিয়া অপরাধকে দেখেন না। তাঁহারা প্রশ্ন করেন "কেন ছেলেটি চুরি করে?" তাঁর মনোজগতে বা সমাজ পরিবেশে কি কি শক্তি কাজ করে যার শেষ ফলটি হইতেছে চুরিরূপ দুষ্কার্যটি?" বহু পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পর তাঁহারা এ সিদ্ধান্ত করেন, যে চুরি মাত্রই চুরি নয়। অপরাধ মাত্রেরই নৈতিক মূল্য এক নয়। অপরাধের কারণ এক নয়, তার প্রকাশও বিভিন্ন এবং অপরাধের প্রতিকারের পথও বিভিন্ন।

অনেকেই মনে করেন অপরাধ যাহারা করে তাহারা জানিয়া শুনিয়াই করে, কাজেই কৃতকর্মের ফল-স্বরূপ শাস্তিভোগ তাদের অবশ্য প্রাপ্য। আবার কেউ কেউ বলেন অপরাধ একটা রোগবিশেষ। দৈহিক গঠনের অথবা দৈহিক উপাদানের অস্বাভাবিকতা বা বিকৃতি হইতেই অপরাধপ্রবণতা জন্মে। তাই অপরাধের প্রতিকার চিকিৎসায়। হয়তো দেখা যাইবে অপরাধী ব্যক্তির থাইরয়েড্ গ্রন্থি থেকে রসক্ষরণ অতিরিক্ত বা অপরিমিত। উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা এ ত্রুটির সংশোধন হইলেই অপরাধেরও মূলোচ্ছেদ হইবে। আবার ফ্রয়েড্পন্থী কোন কোন পণ্ডিত বলিবেন, শিশুকালের অপ্রীতিকর, ভীতিকর বা বীভৎস কোন অভিজ্ঞতা অবচেতন মনে অবদমনের ফলে জটিল গ্রন্থির (complexes) সৃষ্টি হয় এবং তাহাই সমস্ত অপরাধপ্রবণতার মূল।

সুতরাং তাঁহাদের মতে মনঃসমীক্ষণ (psycho-analysis) প্রণালীর দ্বারাই এ সব ক্ষেত্রে নিরাময় সম্ভবপর। কারো কারো মতে অপরাধের একমাত্র প্রতিকার উপযুক্ত কঠিন শাস্তি। কিন্তু ইহাও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শাস্তিতে অপরাধের সংশোধন হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্তির ফলে অপরাধপ্রবণতা বরং বাড়িয়া যায়।

এ সমস্ত মতের প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছু সত্য নিহিত আছে, কিন্তু এর কোন মতই চূড়ান্তভাবে সত্য বলিয়া গৃহীত হয় নাই। অর্থাৎ যতই এই বিষয়ে অনুসন্ধান হইতেছে ততই বুঝা যাইতেছে, দৈহিক মানসিক নানা বিভিন্ন কারণে অপরাধ সংঘটিত হয়,—তাহাদের প্রকাশ বিচিত্র এবং তাহাদের নিরাময়ের পন্থাও বিভিন্ন। সুতরাং অপরাধপ্রবণদের শ্রেণীবিভাগ নিতান্ত প্রয়োজন। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্।

একটি ছেলে চুরি করিয়াছে। ইহার কারণ হইতে পারে, :—

১। ছেলেটি জন্মগতভাবেই দুর্বলচিত্ত (constitutionally feeble-minded)। তাহার ব্যক্তিত্বই রুগ্ন, যাহার ফলে তাহার মনে সুস্থ নীতিবোধের অভাব, আত্মশাসনে সে অপারগ—কাজেই সুযোগ ও প্রলোভনের সামনে সে নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারে না। অথবা এমনও হইতে পারে যে তার ঘুম-ঘুম ব্যারাম (sleeping sickness) আছে, যা মানুষকে দুর্বলচিত্ত ও নীতি-বোধহীন করিয়া দেয়। বলাই বাহুল্য, শাসনপীড়ন দ্বারা এই ছেলের সংশোধনের আশা সামান্যই। এর বাস্তবিকই প্রয়োজন সুচিকিৎসা।

২। ছেলেটি স্বভাবতই নীতিবোধহীন নয়। কিন্তু দুষ্ট পিতামাতার দৃষ্টান্তে অথবা তাদের প্রশ্রয়ে অথবা কুসংসর্গে মিশিয়া সে চুরি করিতে শিখিয়াছে। সে জানে চুরি করা অন্যায়, এবং সে নির্বোধও নয়, তাই যাহাতে ধরা না পড়ে সে জন্য সে যথেষ্ট সতর্ক। এ ক্ষেত্রে শারীরিক কোন বৈকল্য বা মানসিক কোন জটিলতা নাই। এখানে কোন অবদমনজনিত জটিল গ্রন্থির সৃষ্টি হয় নাই। এক্ষেত্রে অপরাধীর সংশোধন অপেক্ষাকৃত সহজ। ইহার জন্য প্রয়োজন সুস্থ পরিবেশ ও স্নেহশীল অথচ অ-প্রশ্রয়হীন শাসন ও পরিচালনা। আদর্শচরিত্র শিক্ষকের সংসর্গে এবং ছেলেটির সৃজনীশক্তির সুষ্ঠু বিকাশের ব্যবস্থায় ও উৎসাহপূর্ণ পরিবেশে তাহার অপরাধপ্রবণতা দূর হইবে।

৩। ছেলেটির চুরি, তাহার বাল্যের কোন আবেগের সুস্থ ও সহজ প্রকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া যাওয়ার একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া। ছেলেটির শারীরিক কোন ত্রুটি নাই, নীতিবুদ্ধিও তাহার বিকশিত, অনুকূল সংসার পরিবেশেই সে লালিত। তাহার পিতা, মাতা বা বন্ধুরা ভদ্র ও শিষ্ট। কিন্তু তাহার বয়স যখন দুবছরেরও কিছু কম তখনই তাহার একটি ছোট বোন জন্মায়। তখন থেকেই মায়ের আদর তাহার ভাগে কিছু কম পড়িতে থাকে। এতে তাহার শিশু মনে নিরাপত্তাবোধের অভাব ও নিজের সম্বন্ধে হীনতা বোধ সৃষ্টি হয়। এর সঙ্গে আসে পিতামাতার প্রতি দুর্জয় অভিমান। কিন্তু এই তীব্র অনুভূতির স্বচ্ছন্দ প্রকাশের পথ রুদ্ধ। সুতরাং তাহার মনে বিপরীত প্রতিক্রিয়া জাগে ছোট বোনটির প্রতি ঈর্ষার রূপে। অভিমানী শিশু, তাহার মনে মায়ের ভালবাসা আদরের তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে অবদমন করিয়া তাহার বিপরীত ভাব জাগে—"চাইনে তোমাদের ভালবাসা—কারুকে আমার দরকার নেই।" তার মনের এ বিক্ষোভ ও জ্বালা তাহাকে পিতামাতা ও সমাজের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন করিয়া তোলে এবং নিষিদ্ধ অপরাধ, যথা চুরি করা দিয়া, সে মনের ক্ষোভ মিটাইতে চায়। যে জিনিস চুরি করিল, তাহার প্রতি তাহার কোন লোভ নাই এবং অপরাধ গোপনের জন্যও সে খুব চেষ্টিত নয়। ধরা পড়িয়া শাস্তি সে নেয় জিদ করিয়া অননুতপ্তভাবে—"আমায় মেরে ফেল, তবু আমি কাঁদব না", এই তাহার ভাব। তাহার এ প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে তাহার পরিবেশের বিরুদ্ধে নয়, নিজেরই গোপন সুপ্ত অতৃপ্ত স্নেহাকাঙ্ক্ষারই বিরুদ্ধে। সহজেই বোঝা যায় শাস্তি দিয়া এ সব ছেলের সংশোধন তো হয়ই না—বরং এরা আরও তিক্ত ও বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। সহানুভূতি দিয়াও এদের মন পাওয়া কঠিন, কারণ এই ছেলে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে "চাইনে তোমাদের আদর ভালবাসা,—ওসব দেওগে ওই মেনীমুখী ছিঁচকাঁদুনী খুকুরাণীকে।"

৪। ছেলেটির চুরি, তাহার সচেতন মনের ক্রিয়া নয়। তাহার অবচেতন মনের কোন অন্ধ শক্তি তাহাকে এই দুষ্কার্যে প্রবৃত্ত করায়। শারীরিক কোন ব্যাধি তাহার নাই, তাহার পরিবেশও প্রতিকূল নয়, তাহার নীতিবোধ সুবিকশিত। সে যে চুরি করিতেছে তাহা সে নিজেই জানে না। যে

জিনিস চুরি করিল তাহার মূল্য হয়তো অকিঞ্চিৎকর, এবং সে জিনিসে তাহার কোন প্রয়োজন নাই, লোভও নাই। চুরি ঢাকিবার জন্য সে ব্যগ্র নয়। চুরি যখন ধরা পড়িল অন্য সকলে যেমন আশ্চর্য হইল সে নিজেও তেমনি লজ্জিত হইল। কারণ ভদ্র শান্ত ছেলে বলিয়া তাহার খ্যাতি আছে। এ দুষ্কার্যের জন্য সে বাস্তবিক অনুতপ্ত। তথাপি দেখা যায় সে এমনি অকারণে চুরি করে। তাহার অবচেতন মনে অবদমিত কোন আকাঙ্ক্ষা হঠাৎ আজ সুযোগ পাইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই জাতীয় অপরাধীকেই বলা হয় 'সাইকোনিউরোটিক্' (psychoneurotic)। শাস্তি দিয়া এই অপরাধীর সংশোধন হয় না, কারণ এর অপরাধের মূলে আছে অবচেতন মনের জটিল গ্রন্থি। সেই গ্রন্থির মূলোচ্ছেদ করিলে তবেই সুফল পাওয়া যাইতে পারে।

এ আলোচনা থেকে বুঝা যাইবে যে অপরাধের কারণ, তাহাদের প্রকাশ, ও তাহাদের প্রতিকারের পদ্ধতির বিভিন্নতা অনুযায়ী অপরাধীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা প্রয়োজন।

প্রথমেই বলা যায়, কতগুলো অপরাধ অসুস্থ দেহ মনের পরিচায়ক নয়। এদের স্বাভাবিক অপরাধী ((Benign delinquent) বলিলে বোধ হয় দোষ হইবে না। সমস্ত অপরাধই সামাজিক রীতি লংঘন দোষদুষ্ট। সে জন্য সব অপরাধীকেই সামাজিকতার মানে অসুস্থ (abnormal) বলা যায়। কিন্তু কতগুলি রীতিলংঘন সুস্থ জৈব উৎসাহেরই প্রকাশ। যেমন, রৌদ্রকরোজ্জ্বল বসন্তের দ্বিপ্রহরে আলো ঝলমল বায়ু হিল্লোলিত চিকণ সবুজ বনভূমি যদি বিদ্যালয়ের তরুণ বিদ্যার্থীকে হাতছানি দিয়া ডাক দিয়া উদাস করিয়া তোলে, এবং যদি সে বিদ্যালয়ের নিয়ম লংঘন করিয়া ক্লাশ ফাঁকি দিয়া বাহির হইয়া পড়ে, তবে শিক্ষকের চোখে সে অপরাধী সত্য, কিন্তু শিক্ষক যেদিন তরুণ ছিলেন সেদিন তিনিও কি অনুরূপ অপরাধ করেন নাই? নষ্টচন্দ্রের রাত্রে পরের বাড়ীতে ঢিল না মারিয়াছে কে? কে না চুরি করিয়াছে ফুল, সরস্বতীপূজার আগের দিন রাত্রে? এ জাতীয় অপরাধকে আমরা তাই স্বাভাবিক অপরাধই বলিব। এ অপরাধ শিশুর বাড়ন্ত দেহ মনের বাড়তি শক্তিরই সুস্থ প্রকাশ (healthy outlet of surplus animal spirit)।

এই ধরণের অপরাধের প্রতিকার, সস্নেহ শাসন। এখানে ভিটামিন ট্যাবলেটেরও দরকার নাই, থাইরয়েড্ ইন্জেক্সনেরও দরকার নাই। সামাজিক ও নৈতিক বোধ জাগরণের জন্য সামান্য সস্নেহ উপদেশের প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু পরিবেশ পরিবর্তনের মত গুরুতর অপরাধ ইহা নয়। আর অবচেতন মনের কোন জটিল গ্রন্থি থেকে এ অপরাধের উদ্ভব নয়, কাজেই এ ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ প্রক্রিয়া নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজন।

এবার দুষ্ট অপরাধীদের কথা বিবেচনা করা যাক। (ক) এদের মধ্যে একদল আছে যাহারা দৈহিক যন্ত্রাদির বিকৃতি বা অসুস্থ ক্রিয়ার (disordered physiological functioning) প্রভাবে অপরাধে লিপ্ত হয়। হেভ্‌লক্-এলিস্ দেখাইয়াছেন স্ত্রীলোক অপরাধীরা মাসিক ঋতুর কাছাকাছি সময়ই বেশী অপরাধ করিয়া থাকে। ফরাসী দেশে অন্ততঃ একটি উদাহরণ আছে যেখানে নরহত্যার দোষে অপরাধী এক ব্যক্তি আদালতের বিচারে মুক্তি পায়, কারণ সে রক্তে শর্করার স্বল্পতা (low blood sugar) রোগে ভুগিতেছিল, এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মতে এমন শারীরিক অবস্থা অনুরূপ অপরাধের কারণ হইতে পারে। জন্মগত বা শারীরিক বিকৃতির ফলে যাহারা অপরাধ করে (temperamental delinquents) তাহাদের শাস্তি দিয়া সংশোধনের চেষ্টা নির্বুদ্ধিতা শুধু নয়, নিষ্ঠুরতাও বটে। এদের সু-চিকিৎসা প্রয়োজন।

(খ) সহজ অপরাধী (simple delinquents)—এরা অপরাধ করে প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে। এরা মূলতঃ দুষ্ট নয়। গৃহে উপযুক্ত শাসনের অভাব, পিতামাতার অসদ্দৃষ্টান্ত, বা তাহাদের মধ্যে সতত বিরোধ কলহ, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, প্রতিকূল আর্থিক অবস্থা, কুসঙ্গ ইত্যাদিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধের জন্য দায়ী।

অবশ্য জন্মগত প্রবৃত্তির প্রবণতা না থাকিলে শুধুমাত্র পরিবেশের প্রভাবেই অপরাধী সৃষ্টি হয় কিনা সন্দেহ। পরিবেশ সুপ্ত প্রবণতাকে প্রকাশ করে।

যে ছেলে ঝগড়াটে বা রাগী ধাতের, শিশুকালে পিতামাতার কাছে আদর ও প্রশ্রয় পাইয়া সে ছেলে বড় হইয়া ক্লাশের দুর্বল ছেলেদের উপর উৎপাত করিবে এটা স্বাভাবিক। প্রশ্রয় (encouragement) সুপ্ত দুষ্ট প্রবৃত্তির প্রকাশের সহায়ক।

শিশুর চরিত্রের উপর ইঙ্গিতের (suggestibility) প্রভাব সামান্য নয়। মুখের কথায় যেটা আমরা প্রকাশ না করি, আমাদের চলনধরণ ও ব্যবহারে তাহার ইঙ্গিত থাকে। সে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আশ্চর্যভাবে শিশুরা বোঝে। আপনি বাপ, ছেলেকে এড়াবার জন্যে মিথ্যাই তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন "ওবেলা তোমাকে ঘোড়া কিনে দেব।" ছেলে আপনার ফাঁকি যে না বোঝে তাহা নয়, এর ফলে ভবিষ্যতে সে আর আপনাকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিবে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে সোজাসুজি উপদেশের চেয়ে ইঙ্গিতের মূল্য অনেক বেশী। ইঙ্গিতও (suggestibility) অনেকক্ষেত্রে সুপ্ত প্রবৃত্তির পোষক। মা মুখে উৎসাহ দিলেও কঠিন রোগাক্রান্ত ছেলে বোঝে মার ভয় ও উদ্বেগ। এ ভয় ও উদ্বেগ তাহার মনেও সংক্রামিত হয়। পিতা মাতা নিজেদের কুপ্রবৃত্তি সন্তানের কাছে গোপন করিতে চেষ্টা করিলেও ইঙ্গিতে শিশু তাহা বুঝিতে পারে এবং তাহার মধ্যে অনুরূপ প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়।

শিশু পিতামাতাকে শুধু অনুকরণ করে না—ঠিক তাহাদেরই একজন বলিয়া নিজেকে কল্পনা করিতে ভালবাসে (identification)। যেমন খোকা বাবা সাজিয়া বলে মাকে, "ফুরায় যদি টাকা, ফুরায় খাবার,
যত চাই মা, এনে দেবো আবার।"

এই তাদাত্ম্যের (identification) ফল শিশুর পক্ষে শুভ, যদি যাহার সঙ্গে নিজেকে সে যুক্ত করিয়া তাঁহার চরিত্র বীরোচিত, উন্নত ও নির্মল হয়। কিন্তু বিপরীত হইলে ফল অশুভ হয়। যেমন ছেলে যদি পকেটমার পিতাকে নিজ আদর্শ বলিয়া মনে করে, তাহাকেই সব বিষয়ে অনুকরণ করে তাহা হইলে সম্ভবত সেও বড় হইয়া পাকা চোরই হইবে।

অধিকাংশ অপরাধের প্রধান উত্তেজক কারণ (exciting cause) বিরূপ পরিবেশ। এর প্রতিকারও তাই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে। এ কাজটিতে পিতা মাতা, শিক্ষক সমাজ ও রাষ্ট্রের সহযোগিতা প্রয়োজন। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় শিশু অপরাধীদের বিচারের জন্য যুভেনাইল্ কোর্ট আছে। বিচারকের কাজে সাহায্য করিবার জন্য সরকারী পরিদর্শক (inspectors) আছেন। এ সব ক্ষেত্রে তাঁহারা অপরাধীর বাড়ী গিয়া তাহার পরিবেশ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন এবং পিতামাতাকে উপদেশ দেন, কখনও কখনও তাঁহাদের

সতর্ক করেন। বিচারক যদি মনে করেন শিশু অপরাধীর পরিবেশ অতিশয় কদর্য এবং তাহা সংশোধনের উপায় নাই তাহা হইলে শিশুটিকে অন্য অভিভাবকের অধীনে রাখিবার ব্যবস্থাও করিতে পারেন। এ বিষয়ে সোভিয়েট রাশিয়ায় ম্যাকারেংকো বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করিয়াছেন। রাশিয়ান সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে শিশু-অপরাধের মূল কারণ হয় দৈহিক, নয় পরিবেশ-গত। তাই প্রত্যেক অপরাধীকে সুযোগ্য চিকিৎসক পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করিয়া দৈহিক রোগ বা বিকৃতি থাকিলে তাহার সংশোধনের ব্যবস্থা করেন। যাহারা গুরুতর অপরাধে অপরাধী এবং যাহারা পুনঃ পুনঃ অপরাধ করে (recidivists) এবং দেশের সাধারণ বিদ্যালয়ে যাহাদের সংশোধন হয় না, তাহাদের, অপরাধী শিশু-দের জন্য স্থাপিত আদর্শ উপনিবেশে (ideal colonies) প্রেরণ করা হয়। ম্যাকারেংকোর মতে অপরাধীর সংশোধনের প্রধান উপায় হইল তাহার আত্ম-মর্যাদাবোধ জাগ্রত করা এবং আত্মবিশ্বাস ও সমাজ-কল্যাণ বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করা। এই সব আদর্শ-বিদ্যালয় কঠিন শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচালিত হইলেও এগুলি জেল-খানা নয়। এখানে শারীরিক শাসন পীড়ন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রত্যেকটি ছেলেকে এখানে বিদ্যালয়ের জীবনের সঙ্গে জড়িত কোন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রচুর এবং বিচিত্র গঠনাত্মক কাজে ছেলেদের ব্যাপৃত রাখা হয়। তাহাদের সৃজনীশক্তির বিকাশের নানা সুযোগ দেওয়া হয় এবং শিক্ষকেরা ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশিয়া তাহাদের যথেষ্ট উৎসাহ দেন, পরামর্শ দেন, পরিচালনা করেন। এখানে একটি বিশ্বাস, আশ্বাস, প্রীতি ও কর্মের আবহাওয়ায় শিশুদের মনের মেঘ কাটিয়া যায়। নানা স্বাস্থ্যকর খেলাধূলা, ভ্রমণ, অনুসন্ধান, আশে পাশে গ্রামে বা সহরের খামার ও ফ্যাক্টরীর সঙ্গে পরিচয়, গ্রামোন্নয়নের নানা কাজে অংশ গ্রহণ, এই রকম নানা ভাবে তাহাদের পৌরুষ, কুশলতা ও সেবাবুদ্ধি বিকশিত করিয়া তাহাদের আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশের বহু নেতা ও কুশলী কর্মী এই সব উপনিবেশের প্রাক্তন সভ্য। বাস্তবিকপক্ষে, রাশিয়া দাবি করে যে, তাঁহাদের এই সাধারণ বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত স্বাস্থ্যপ্রদ পরীক্ষা দ্বারা দেশ হইতে শিশুঅপরাধ সমস্যার তাঁহারা মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। সোভিয়েট রাশিয়া ফ্রয়ডীয় অবচেতন তত্ত্ব সম্পূর্ণ

অস্বীকার করে এবং মানসিক জটিলতা থেকে অপরাধীর সৃষ্টি হয়, এ কথা বিশ্বাস করে না।

প্রতিক্রিয়ামূলক অপরাধী (reaction delinquents) ফ্রয়েড্‌পন্থীদের মতে এই জাতীয় অপরাধের মূল কারণ অবচেতন মনে জটিল গ্রন্থির সৃষ্টি। শিশুকালের দুঃখকর অভিজ্ঞতাপ্রসূত আবেগ ও অনুভূতির সুস্থ সহজ প্রকাশের পথ রুদ্ধ হইলে, সেই অবদমিত আকাঙ্ক্ষার বিপরীত একটি ভাব অচেতন ভাবে সঞ্জাত হয়। অপরাধটি সেই প্রতিক্রিয়ার ফল। এখানেও পরিবেশের বিরুদ্ধে শিশুর প্রতিক্রিয়া, কিন্তু এ পরিবেশ বাহ্য পরিবেশ নয়, ইহা তাহার নিজ অন্তরের মধ্যেই, কাজেই এখানে নিজের বিরুদ্ধেই যেন নিজের বিদ্রোহ। সাধারণতঃ শিশুকালে স্বাভাবিক স্নেহপ্রীতি ভালবাসার অভাব থেকেই এ রকম জটিল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। শিশু চায় পিতা মাতার অকুণ্ঠ আদর ভালবাসা, তাহাদের আশ্রয়েই তার শ্রেষ্ঠ আনন্দ ও নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা বোধ। কিন্তু হঠাৎ কোন কারণে (যেমন মা মরিয়া গেলে, বা অল্পদিনের মধ্যে আর একটি ভাই বা বোন হইলে) সে নিজেকে বঞ্চিত ও অসহায় বোধ করে এবং ইহা হইতে তাহার মনে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুর সজীব মন এই দুঃখ বেদনা ও বঞ্চনাবোধ ঝাড়িয়া ফেলিয়া সুস্থ হইয়া উঠিতে পারে কিন্তু যেখানে এই আঘাত অত্যন্ত গভীর হয় এবং অবচেতন মনে জটিল গ্রন্থির সৃষ্টি করে, সেখানে বড় হইয়া শিশু তিক্ত সমাজদ্রোহী হইয়া অপরাধের পথে নিজের মনের আক্রোশ মিটাইতে চায়। এখানে অপরাধী নিজের অপরাধ সম্পর্কে এতটুকুও অনুতপ্ত হয় না—বরং এতে এক বিকৃত আনন্দ বোধ করে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। একটি মেয়ে স্কুলে অত্যন্ত অবাধ্য ও দুর্বিনীত। সে অন্যান্য মেয়েদের জিনিস চুরি করে, শিক্ষিকার সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করে। শাস্তি দিয়া কোন ফল হয় না। বলে "বেশ করেছি, একশোবার করব।". তাহাকে অভিজ্ঞ মনো-বিজ্ঞানীর কাছে নিয়া যাওয়া হইল। প্রথমে সে কোন প্রশ্নেরই জবাব দিতে রাজি নয়। ক্রমে ক্রমে স্নেহশীল বিজ্ঞানীর সঙ্গে আলাপ করিয়া সে অনেকটা সহজ হইয়া আসিল। অনুসন্ধানে জানা গেল যুদ্ধের সময় তাহার জন্ম হয়, বাপ তখন যুদ্ধ করিতে বিদেশে গিয়াছেন। এ অবস্থায় মা, দিদিমা সবাই তাহাকে

অতিরিক্ত আদর দিতেন। যখন তাহার বয়স তিন বৎসর তখন তাহার বাবা ফিরিয়া আসিলেন। প্রথম ক'দিন বেশ আনন্দেই কাটিল। কিন্তু ক্রমেই সে বুঝিতে পারিল তাহার আদর কমিয়া গিয়াছে—এখন বাবাই সংসারের সকলের লক্ষ্য ও প্রিয়। মাও বাবাকে খুশি করিতেই ব্যস্ত। মার উপর তাহার কঠিন অভিমান আর বাবার উপর তীব্র রাগ হইল। অথচ রাগ প্রকাশের উপায় নাই। বাবার সঙ্গে জোরে সে পারিবে না। এর এক বছরের মধ্যেই তাহার একটি ভাই জন্মিল। তাহাকে আর কেউ আগের মত আদর করে না। মনের মধ্যে রাগে সে ফুঁসিতে লাগিল,—"এটা বাবার আর এক নোংরা চালাকি।" তাহার মন ক্ষিপ্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। অথচ সোজাসুজি করিবার কিছু নেই। সে মনে মনে বলিল—"মরুকগে সব, চাইনে ওদের ভালবাসা"। এরপর থেকে সে বাপ মাকে এড়াইয়া চলিত। তারপর একদিন বাবা মার একত্র তোলা এক ফটোগ্রাফ সে ছিঁড়িয়া কুটি কুটি করিয়া ধুলায় ফেলিয়া দিল। খুব মার খাইল বটে, কিন্তু এতটুকুও চোখের জল তাহার পড়িল না। তাহার এই ক্ষুব্ধ আক্রোশ স্কুলে গিয়াও দূর হইল না।

এই সব অপরাধীর চিকিৎসা সব চেয়ে কঠিন। শাস্তি দিয়া ফল বিপরীত হয়। স্নেহকেও এরা সন্দেহ ও বিদ্বেষের চোখে দেখে। তবে এদের বঞ্চিত স্নেহাকাঙ্ক্ষা পূরণের উপযুক্ত পাত্র পাইলে—যেমন ভাল বিবাহ হইলে—অনেক সময় ইহারা সারিয়া যায়। ফ্রয়েডপন্থীদের মতে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে এদের অবচেতন মনের রুদ্ধ আবেগের মুক্তির পথ করিয়া দিতে পারিলেই এরা বাস্তবিক শান্ত ও সুস্থ হইতে পারে।

(ঘ) রুগ্ন মনের বিকারজনিত অপরাধ (Psycho-neurotic delinquents) এ সব অপরাধের ক্ষেত্রে অবদমিত ইচ্ছা ব্যক্তির অজ্ঞাতেই পুনঃ আত্মপ্রকাশ করিয়া—অবশ্য অনেক সময়েই এটা ঘটে কোন প্রতীক্ (symbol) উপলক্ষ্য করিয়া। এখানেও অনেক ক্ষেত্রেই মনের মধ্যে একটি রুদ্ধ আক্রোশের বাষ্প অবচেতন মনে জটিল গ্রন্থির সৃষ্টি করে।

যৌনাকাঙ্ক্ষার নগ্ন প্রকাশ সমাজে নিন্দনীয়। সুতরাং সভ্য মানুষ এ আকাঙ্ক্ষাকে সযত্নে সচেতন মন থেকে নির্বাসন দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু

জীবনের এই আদিম শক্তি প্রচণ্ড, প্রবল—সে মরে না। অবচেতন মনে গোপনে আশ্রয় নেয়। সুযোগ পাইলে এই আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের মধ্যে অথবা সচেতন মনের অনেক ব্যবহারের মধ্যে ছদ্মবেশে তৃপ্তির পথ খোঁজে। ফ্রয়েড্ পন্থীদের মতে এ জাতীয় অবদমনের ফলে যে জটিল গ্রন্থির সৃষ্টি হয় তাহার তাড়নায় যে অপরাধ করা হয়, অপরাধী সে সম্বন্ধে সচেতন নয়। বিনা প্রয়োজনে চুরি করার অভ্যাস (Kleptomania) এ জাতীয় অপরাধের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চুরি রূপ নিষিদ্ধ ক্রিয়া নিষিদ্ধ যৌনক্রিয়ারই প্রতীক। অনেক সময়েই দেখা যায় যাহারা এই জাতীয় অপরাধ করিয়া থাকে তাহাদের চরিত্র এ শ্রেণীর অপরাধের সম্পূর্ণ বিপরীত। অত্যন্ত ভদ্র সুস্থ সম্ভ্রান্ত ঘরের ধর্মভীরু এক মেয়ের খাতায় দেখা গেল অশ্লীল কবিতা ও ছবিতে ভর্তি। এ জাতীয় অপরাধীরা নিজেদের অপরাধ গোপন করিবার জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে না এবং ধরা পড়িলে আন্তরিক ভাবে অনুতপ্ত হয়। এক হিসাবে বলা যায় এরা নিজের স্বাধীন ইচ্ছার বশে অপরাধ করে না। কোন অন্ধ গোপন শক্তির দ্বারা চালিত হইয়াই যেন এরা অপরাধে প্রবৃত্ত হয়।

ফ্রয়েড্পন্থীদের মতে উপযুক্ত মনঃসমীক্ষণ প্রক্রিয়ায় চিকিৎসা দ্বারা এদের সম্পূর্ণ নিরাময় হওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক। রোগী যদি নিজের অবদমিত ইচ্ছাটিকে সচেতনভাবে জানিতে পারে এবং তাহার আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছার স্বাভাবিক তৃপ্তির যদি ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে এরা সুস্থ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারে।

এই প্রবন্ধে নিম্নোক্ত বই হইতে সাহায্য নেওয়া হইয়াছে :

J. A. Hadfield—*Psychology & Mental Health*

C. Burt—*The Young Delinquent*

M. A. Merrill—*Problems of Child Delinquency*

Beatrice King—*Russia Goes to School*

Deana Levin—*Children in Soviet Russia*

G. Murphy, L. B. Murphy & C. M. Newcomb—
Experimental Social Psychology

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও তাৎপর্য

পৃথক একটি শাস্ত্র হিসাবে মনঃস্বাস্থ্যবিজ্ঞানের স্বীকৃতি খুব বেশী দিনের কথা নয়। বহুপূর্বে মানুষ উন্মাদরোগকে রহস্যময় বলিয়াই মনে করিত। গুরু অপরাধের ইহা দৈবী শাস্তি, অথবা ইহা কঠিন অভিশাপ বা অভিচার প্রক্রিয়ার অপ্রাকৃত ফল, মানুষের এই রকম ধারণা ছিল। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে চিকিৎসকেরা ইহা মস্তিষ্কের দুরারোগ্য ব্যাধি বলিয়াই মনে করিতেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক হইতে মনোবিজ্ঞানীরা ইহা বুঝিতে থাকেন যে এ জাতীয় ব্যাধির পশ্চাতে মানসিক কারণ বর্তমান থাকে। ফ্রয়েড্-এর পর হইতে মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধে চিকিৎসক এবং জনসাধারণের আগ্রহ বাড়িতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে এই আগ্রহ বিশেষ পরিলক্ষিত হয়।

কিছুদিন হইতে আমেরিকায় মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে হাসপাতালে মানসিক রোগের চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময় হইতে সুস্থ মানুষেরও যে সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার (human adjustment) প্রয়োজনে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়, এই বিষয়ে মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এবং এই সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা সুরু হয়।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ক্লিফোর্ড বীয়ার্স (Clifford Beers) নামে ইয়েল্ বিশ্ববিদ্যালয়ে চব্বিশ বৎসর বয়স্ক এক যুবক তাঁহার বাড়ীর পাঁচতলার জানালা হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যার নিষ্ফল চেষ্টা করে। বিচার কালে তাহার মানসিকবিকারের স্পষ্ট লক্ষণ দেখিয়া বিচারক তাহাকে মানসিক রোগের হাসপাতালে পাঠান। সে উন্মাদের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন চিকিৎসালয়ে তিন বৎসর ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সে নিরাময় হইয়া উঠে। হাসপাতালগুলিতে এবং সাধারণভাবে সমাজের মধ্যে মানসিক রোগগ্রস্তদের প্রতি যে বিরূপতা ও নির্মমতা সে লক্ষ্য করিয়াছিল, কেন সে নিজেকে

সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে পারিতেছিল না,—তাহার সমস্যা কি ছিল,—কি মানসিক ক্লেশ তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল,—কি করিয়া নিজের চেষ্টায় সে মানসিক সমতা ফিরিয়া পাইয়াছিল, এ সমস্ত বর্ণনা করিয়া বীয়ার্স একখানা বই লেখে—A mind that found itself।" ১৯০৮ সালে বইখানা প্রকাশিত হয়।

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বইখানা বেশ জনপ্রিয় হয়। চিকিৎসক ও সমাজসেবীদের দৃষ্টিও বেশ আকৃষ্ট হয়। সমস্ত আমেরিকাবাসী মানসিক রোগীদের সুচিকিৎসা এবং এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দাবীতে একটি আন্দোলন আরম্ভ হয়। বীয়ার্স নিজে এবং একজন প্রসিদ্ধ মনোবিকার চিকিৎসক (psychiatrist) এ্যাডলফ্ মেয়ার এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মেয়ারই এই নূতন বিজ্ঞানের নাম দেন 'মেণ্টাল হাইজীন'। ১৯০৮ সালেই ইয়েলে প্রথম ষ্টেট কমিটি অব মেণ্টাল হাইজীন এবং পরে ১৯০৯ সালে সমস্ত আমেরিকার জন্য কেন্দ্রীয় 'ন্যাশন্যাল কমিটি ফর্ মেণ্টাল্ হাইজীন্' স্থাপিত হয়। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই এ আন্দোলন দেশের অন্যত্রও ছড়াইয়া পড়ে, এবং শীঘ্রই আরো অনেক ষ্টেট কমিটি গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি স্বেচ্ছামূলক বেসরকারী চেষ্টায় গঠিত, এবং মানসিক রোগের চিকিৎসক এবং এ বিষয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীরা ইহার সভ্য। এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল সাধারণ শিক্ষিত মানুষও ইহাদের সভ্য হইতে পারেন। আমেরিকার বাহিরে অন্যান্য দেশেও পৃথক একটি বিজ্ঞান হিসাবে মেণ্টাল্ হাইজীনের চর্চা বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে।

স্বভাবতই প্রথম দিকে মানসিক রোগের হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা বিষয়ে সাহায্য করাই এ কমিটিগুলির প্রধান কাজ ছিল। কিন্তু ক্রমশই এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও গবেষণা অধিকতর গুরুত্বলাভ করে এবং বিগত অর্ধশতাব্দীব্যাপী এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনার ফলে যে সব তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলি চিকিৎসা, শিক্ষা, সমাজ ইত্যাদি জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে। আজ এই বিজ্ঞান অন্যান্য বহু সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান হইতে সমর্থক নানাবিধ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

সমাজের পক্ষে এই বিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আমেরিকার বহু উচ্চবিদ্যালয়ে দেহ-স্বাস্থ্যবিজ্ঞান যেমন অবশ্যপাঠ্য বিষয়, মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানও ঠিক তেমনি অবশ্যপাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। 'মেণ্টাল্ হাইজীন্' আন্দোলনের আর একটি প্রত্যক্ষ ফল ছাত্রছাত্রীদের জীবনের নানা সমস্যা সম্বন্ধে যাহাতে তাহারা সদুপদেশ পাইতে পারে সে জন্য চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিক্ স্থাপন। শিক্ষকেরা ইহা বুঝিতেছেন ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান ব্যাপারে তাহাদের বুদ্ধি, উৎকৃষ্টপুস্তক,—বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম, সুষ্ঠু শিক্ষাপদ্ধতিই সব নয়, আর একটি বিষয় বিবেচ্য, তাহা হইতেছে ছাত্রছাত্রীদের সুস্থ ও শান্ত মানসিক অবস্থা। ছাত্রের মনটি বিরুদ্ধ ও বিপরীত শক্তিদ্বারা আন্দোলিত ও অস্থির হইলে সহজ বিষয়ও তাহার বোধগম্য হয় না। আবার তাহার মনটি সুস্থ, শান্ত ও কৌতূহলী হইলে অত্যন্ত কঠিন বিষয়ও তাহাকে বোঝানো সহজ হয়। 'Bugbears of arithmetic fundamentals which have, for many years remained formidable against the assaults of every weapon in the essentialist arsenal shrink to insignificance when the pupil is relaxed, instead of tense, adjusted, rather than in a state of conflict.' শিক্ষক এখন ক্রমশঃ এ কথা বুঝিতেছেন যে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য সমাজ জীবনের সঙ্গে শিক্ষার্থীর মনের সামঞ্জস্যবিধান। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের কর্তব্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিদ্বারা শিক্ষার্থীর সুস্থ মানসিক বিকাশের সহায়তা করা।

চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এই বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি অধিকতর নিপুণ বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ও নূতন নূতন চিকিৎসা-কৌশল আবিষ্কারে সহায়ক হইয়াছে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য

ব্যক্তির মনের সমতাবিধান ও সমাজজীবনের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য-বিধানের দ্বারা মানব কল্যাণই এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এই বিজ্ঞান তিনটি প্রধান লক্ষ্য অনুসরণ করে (১) দেহমনের সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশের সহিত জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণয় এবং এই পূর্ণতর জ্ঞানের

সাহায্যে মানসিক বিকার নিরোধ। (২) ব্যক্তি ও সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য ও সমতা রক্ষা (৩) মানসিক রোগ নিরাময়কল্পে উন্নততর ঔষধ ও প্রক্রিয়া আবিষ্কার এবং মানসিক রোগ ও অস্বাস্থ্য চিকিৎসায় তাহাদের ব্যবহার।[১]

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সূত্রানুযায়ী চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইহা দেখা যাইতেছে যে মানসিক বিকারের মূল কারণ, নিষ্ফল মানসিক সংঘাত এবং আবেগ ও অনুভূতির ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা। সুতরাং এই বিজ্ঞান এই দিকে বিশেষ মনোযোগী এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা নূতন পথের সন্ধানে রত আছে। ইহা মানসিকবিজ্ঞানের রোগচিকিৎসার দিক (Mental Hygiene as cure)। এই বিজ্ঞানের আর একটি দিক হইল রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণ (Mental Hygiene as prevention and preservation)। এ বিজ্ঞান আলোচনার দ্বারা আমরা জানিতে পারি কি করিয়া ব্যক্তির মনে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী ও অভ্যাস সৃষ্টি করিতে হয়; কি করিয়া জীবনের বিভিন্ন প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় ও জীবনের নানা বিভিন্নমুখী প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার সামঞ্জস্যবিধান করিতে হয়, কি করিয়া অনাবশ্যক অবাঞ্ছনীয় সংঘাত দূর করিতে হয়, প্রতিকূল অবস্থায়ও মানসিক সমতা রক্ষা করিতে হয়—এবং সর্বোপরি আত্মবিরোধ দূর ও সমাজের সহিত সামঞ্জস্যবিধান করিয়া মানসিক শান্তি ও সুখ অর্জন করিতে হয়। আত্মসংযম ও উগ্র বাসনাকামনা ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন মানুষের জীবনে সুখশান্তি অসম্ভব এই সুপ্রাচীন বহুপরীক্ষিত কথাটিই মনঃস্বাস্থ্যবিজ্ঞান নূতন করিয়া স্বীকার ও প্রচার করিতেছে।[২] সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকৃত হইতেছে যে সুস্থমন সৃষ্টির জন্য সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থারও প্রয়োজন।

মনঃস্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কয়েকটি সংজ্ঞা

ডি. বি. ক্লীন্ এর মতে "মনঃস্বাস্থ্যবিজ্ঞান জীবনের নানা অপ্রিয় অবস্থা বা দুঃখ (trouble) কি করিয়া দূরে রাখিতে হয় অথবা বুদ্ধিমানের মত কি করিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের জয় করিতে হয়, তাহা মানুষকে

---

১ Harald Benjamin—Editor's Introduction to *Mental Hygiene* (1st ed.) by Crow & Crow.

২ Crow & Crow—*Mental Hygiene* (2nd ed.) p. 4

শিক্ষা দিয়া তাহাদের সাহায্য করে। দুঃখ বলিতে এখানে মানুষ প্রচলিত অর্থে যাহাকে দুঃখ বলে তাহাই ধরা হইতেছে এবং তাহাদের একটি মোটামুটি তালিকা হইতেছে, রোগ, ধর্মবিষয়ে অবিশ্বাস, আর্থিক ক্ষতি, বিবাহিত জীবনে অতৃপ্তি, সামাজিক সমস্যা, জীবিকার অনিশ্চয়তা, দুর্ঘটনা, বার্ধক্য, অগ্নিভয়, উপযুক্ত বাসস্থানের অভাব ইত্যাদি।"[৩]

রোজানফ্ বলিতেছেন "মনঃস্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলিতে মনের সজীবতা, স্বাস্থ্য ও সক্রিয়তা রক্ষার সহায়ক বিদ্যা ও প্রক্রিয়া যে বিজ্ঞানে আলোচিত হয়, তাহা বোঝায়। ইহার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য (১) সুপ্রজনন এবং অন্যান্য উপায়ে সমস্ত ব্যক্তি যাহাতে সুবুদ্ধি, অনুভূতি ও অন্যান্য স্বভাবজ সদ্গুণ বিকাশ করিতে পারে সে বিষয়ে চেষ্টিত হওয়া (২) মানুষের স্বভাবজ জন্মগত বুদ্ধিমত্তা, প্রবৃত্তি ইত্যাদির যথাযোগ্য, সানন্দ ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার দ্বারা যাহাতে দেহে, মনে, শিক্ষায়, সমাজজীবনে, বিবাহিত জীবনে সে সুসামঞ্জস্য ও শান্তি লাভ করিতে পারে এবং তাহার অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তি যাহাতে বিকশিত করিতে পারে সে বিষয়ে পথ নির্দেশ (৩) মানসিক বিকার ও ব্যাধি নিবারণ।"[৪]

ওয়ালিন্ বলিতেছেন "মনঃস্বাস্থ্যবিজ্ঞান মনস্তত্ব, শিশুবিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, চিকিৎসাশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে মনের স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে সূত্র ও প্রক্রিয়া আহরণ করে। এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হইতেছে (১) ব্যক্তি ও সমাজের মানসিক স্বাস্থ্যসংরক্ষণ ও তাহার উন্নতি (২) শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজ অথবা ব্যক্তির মানসক্ষেত্রে নানা ত্রুটি ও সংঘর্ষ হইতে উদ্ভূত বিরোধ দূর করিবার নির্দেশ এবং সামান্য বা গুরুতর মানসিক ব্যাধির প্রতিকার বা চিকিৎসা।"[৫]

আজ পৃথিবীর মানুষের সকলের চেয়ে বড় প্রয়োজন মনের শান্তি ও পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও সৌহার্দ্য। মনঃস্বাস্থ্যবিজ্ঞান আশা করে এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সে সহায়ক হইতে পারিবে এবং রুগ্ন ও অসুস্থ মনের বিকার দূর করিবার পথ দেখাইতে পারিবে।

---

৩ D. B. Klein—*Mental Hygiene* p. 4.

৪ Rosanoff A. J.—*Manual of Psychiatry and Mental Hygiene* P. 749.

৫ Wallin J. E. Wallace.—Personality Mal-adjustments and Mental Hygiene P. 32

অহংকারের আত্মরক্ষা
Ego-defense mechanisms

ব্যক্তিসত্তার মূল শক্তিটি হইল অহংকার,—"আমি আছি", "আমি চাই"। শিশুকাল হইতেই এই অহংবোধ বিকশিত হইতে থাকে। কিন্তু ব্যক্তি তো একটি নয়, বহু এবং বহু'আমি'র চাওয়া ও উদ্যমের মধ্যে সংঘর্ষ স্বাভাবিক। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির চেয়ে সংঘবদ্ধ সমষ্টি প্রবলতর শক্তি। এই সমষ্টি বা সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষে ব্যক্তির আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হয়। অথচ এই সমাজের সঙ্গে নিত্য বিরোধ করিয়া ব্যক্তি বাঁচিতে পারে না। তাই পদে পদে তাহাকে আপোষ (adjustment) করিতে হয়। কখনও বা ছল বা চাতুরীর আশ্রয়ও নিতে হয়। সোজাসোজি হার মানিতে কেহই চায় না। তাই আত্মাভিমানের মুখ রক্ষা করিয়া কি ভাবে সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধান ও নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে, ইহা ব্যক্তি জীবনের প্রধান সমস্যা। সেজন্য ব্যক্তি কতগুলি উপায় বা কৌশল অবলম্বন করে। প্রায় প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তিই কোন না কোন সময় এ উপায়গুলি অবলম্বন করে তবে ইহাদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার অসুস্থ মনের (abnormal) পরিচায়ক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ কৌশলগুলি সমাজসম্মত, কিন্তু নিজ উদ্দেশ্য সাধনের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইলে কখনো কখনো অবাঞ্ছিত, অ-সামাজিক পথও সে অবলম্বন করিতে পারে। ক্রো (Crow) লিখিতেছেন, ব্যক্তি মূলতঃ সৎ হইলেও সে আবিষ্কার করিতে পারে যে গোষ্ঠির মধ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকারের সংগ্রামে সে যথেষ্ট অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। সুতরাং কার্য-সিদ্ধির জন্য মিথ্যা প্রবঞ্চনা ইত্যাদির আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক মানুষ অল্প দিনের মধ্যেই অনুভব করে, যে এ সমস্ত পন্থা সমাজে নিন্দিত। কিন্তু সমাজের সমর্থন না পাইলে তাহার চলে না। কাজেই সাধারণতঃ এমন অভ্যাসই সে আয়ত্ত করে, যাহাতে তাহার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সমাজ-স্বীকৃত পথে হইতে পারে। কিন্তু যদি ব্যক্তি দেখে, তাহার নিজ শক্তির ন্যূনতা অথবা বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার পথে

বাধাস্বরূপ তবে তাহার ভিতরের তীব্র আকাঙ্ক্ষা অবাঞ্ছিত, অস্বাস্থ্যকর এবং সমাজের হানিকর ও নিন্দনীয় পথে তাহাকে ঠেলিয়া দিতে পারে।'[১] সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া নিজ কার্য সিদ্ধির জন্য আমরা যে সব উপায় বা কৌশল অবলম্বন করি সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

১। **অচেতন অনুসরণ বা ইন্‌ট্রোজেক্‌স্যান্** (Introjection)—শিশু অচেতন ভাবেই তাহার গুরুজন বা পরিবেশ হইতে ব্যবহার বা ভাব সংগ্রহ করিয়া থাকে। পিতামাতাকে অনুকরণ করিয়া শিশু অজ্ঞাতসারেই জীবনের আদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে। অবশ্য জ্ঞানবুদ্ধি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এই আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয় এবং নিজস্ব একটি মত বা আদর্শ গড়িয়া ওঠে। সমাজের অনুবর্তিতার ইহাই সহজ পথ এবং ব্যক্তি স্বভাবতই এ পথ অনুসরণ করে। এই অনুসরণ প্রক্রিয়া অচেতন, কাজেই ব্যক্তিও জানে না সে কি করিতেছে এবং কেন করিতেছে। যাহাকে আমরা ভালবাসি তাহাকে সহজেই অনুকরণ করি, কিন্তু যাহার প্রতি মন বিরূপ তাহার পথে চলিতে চাই না। এ প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়। ইহা দ্বারা সুফল পাইতে হইলে অনুকরণ যাহাতে অন্ধ না হইয়া সুসঙ্গত (rational) ও বস্তু-নিষ্ঠ (objective) হয় তাহা দেখা দরকার। অন্যে আমাদের কি চোখে দেখে ইহা শান্তভাবে বুঝিবার এবং তদনুযায়ী নিজ ব্যবহার গঠন করিবার অভ্যাস আয়ত্ত হইলে, সমাজস্বীকৃত পন্থায় নিজ উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা হয়।

২। **প্রতিপূরণ বা কম্‌পেন্‌সেস্যান্** (compensation) নিজেদের ত্রুটি সম্পর্কে আমরা সচেতন। ইহা আমাদিগকে লজ্জা দেয়। এ ত্রুটি অন্যের নিকট হইতে তো বটেই, নিজের কাছ হইতেও লুকাইতে চাই। প্রতিপূরণ এই আত্মরক্ষামূলক একটি প্রক্রিয়া বিশেষ (a defense mechanism)। আমরা আমাদের কোন এক বিষয়ে ত্রুটি অন্য কোন দিকে উৎকর্ষ দ্বারা ঢাকিতে চাই। ব্যক্তি তাহার বাড়তি অতিরিক্ত শক্তি কোন একদিকে ব্যবহার করিয়া নিজের বাস্তব বা কল্পিত পরাজয়ের গ্লানি মুছিতে চায়।

সহজ প্রতিপূরণ হইতেছে যে বিষয়ে ব্যক্তির ত্রুটি, তাহা ঢাকিবার জন্য সেই বিষয়েই অতিরিক্ত বাহাদুরী দেখান। যে মেয়েটি ইংরেজীতে ফেল করিয়াছে

১ Crow and Crow—*Mental Hygiene* P. 56-57.

সে মেয়ে যত্রতত্র ইংরেজী ফট্‌ফট্ করে। অবিশ্বস্ত অপরাধী স্বামী স্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত উদ্বেগ প্রকাশ করে। যে খোঁড়া সে নিজ অঙ্গহানির লজ্জা ঢাকিবার জন্য অন্যকে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়।

প্রতিপূরণ অন্য বা বিপরীত কোন ক্ষেত্রেও হইতে পারে। লেখাপড়ায় যে ছেলে ভাল করিতে পারিল না—সে খেলাধুলায় অতিরিক্ত আগ্রহ দ্বারা নিজ কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। অর্থ সংগ্রহ বা সাংসারিক উন্নতি বিষয়ে যে বন্ধুদের নিকট হইতে পিছাইয়া রহিল সে হয়তো ডাকটিকিট সংগ্রহে বন্ধুদের হারাইতে চেষ্টা করিবে।

অনেক সময় পিতামাতারা নিজ জীবনে যে বিষয়ে সফল হইতে পারেন নাই—সন্তানদের সেই বিষয়ে পারদর্শী করিতে সচেষ্ট হন, এবং তাহাদের সাফল্যে নিজ নিজ পরাজয়ের গ্লানি ভুলিয়া যান। অত্যুৎসাহী সংস্কারকরা অনেক সময় অন্যকে সেই পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই আগ্রহান্বিত, যে পাপ সম্বন্ধে তাঁহাদের আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল। যিনি নিজে চোর, তিনিই চৌর্যাপরাধের নিন্দায় পঞ্চমুখ।

৩। **তাদাত্ম্য বা আইডেন্টিফিকেস্থান্** (Indentification)—যাহাকে ভালবাসি তাহার সাফল্য বা গৌরবকে নিজের গৌরব বলিয়া মনে করিবার দুর্বলতা অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। নিজের জীবনের অকিঞ্চিৎকরতা বা অসাফল্য আমাদিগকে পীড়া দেয়, লজ্জা দেয়—তাদাত্ম্য দ্বারা অসম্মানের সেই আঘাতকে আমরা লাঘব করি। শিশুকালে পিতামাতাকে শিশু নিজ হইতে প্রায় অভিন্ন করিয়াই দেখে এবং পিতামাতার ব্যবহার তাহার চিন্তা ও কর্মকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। এ প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয়, কিন্তু ইহার অতি-ব্যবহার ব্যক্তির বিকাশের পক্ষে বিঘ্নকর। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সঙ্গতি বিধানের ইহা প্রথম ব্যক্তিত্ব পদক্ষেপ কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে নিজস্ব বিকাশই সমস্ত শিক্ষার শেষ উদ্দেশ্য। সুতরাং তাদাত্ম্য যাহাতে ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত না করে, সে দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ইহার অতিমাত্রায় আশ্রয় গ্রহণ সুস্থ মনের লক্ষণ নয় এবং ইহা চিকিসাযোগ্য মানসিক রোগ বিশেষ।

৪। অন্যায় কার্য বা ত্রুটির সমর্থনে মিথ্যা যুক্তি বা র‍্যাশন্যালাইজেশ্যন্ (Rationalization)—অন্যায় আমরা অনেক সময় করি, কিন্তু তাহা নিজের কাছেও স্বীকার করিতে চাই না, এবং অন্যায় কার্যের সমর্থনে মিথ্যা যুক্তি দেখাই,—অর্থাৎ বুঝাইতে চাই যে আমাদের কাজটি যুক্তিসঙ্গত ও সমাজের নৈতিক-বুদ্ধি-বিরুদ্ধ নয়। যে কারণ হইতে কার্যটির উদ্ভব, তাহা গোপন করিয়া অন্য কারণ দেখাই। কোন মেয়ের প্রতি অবৈধ আকর্ষণ এই বলিয়া সমর্থন করি, যে ইহা একটি দরিদ্র পিতৃমাতৃহীন অসহায়ার প্রতি করুণা-সঞ্জাত। আত্মরক্ষা প্রক্রিয়ার (defense mechanism) ইহা একটি প্রধান অস্ত্র। যে অফিসের টাকা চুরি করে, সে যুক্তি দেয় যে সৎকার্যে ব্যয়ের জন্যই সে এ-কাজ করে, ব্যক্তিগত লোভ ইহার কারণ নয়। নিজের ত্রুটি অন্যের উপর চাপাইবার এই প্রক্রিয়ার একটি উদাহরণ "নাচতে না জানলে, উঠোন বাঁকা"—ইহার অনুরূপ ইংরেজী প্রবাদ হইতেছে "A bad workman quarrels with his tools." যে কাজ আমরা পারি না, আমরা ভান করি তাহা আমরা চাই না, ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ "আঙ্গুর ফল টক" (sour-grape mechanism) ঈশপ বর্ণিত এই গল্প।

আমাদের কথায় ও কাজে অসঙ্গতির কথা আমরা না জানি এমন নয়। কিন্তু এই সঙ্গতিসাধন কষ্টকর ও চেষ্টাসাপেক্ষ। অনেক সময়ই সে কষ্ট স্বীকার না করিয়া এই সহজ মিথ্যার আশ্রয় আমরা গ্রহণ করি। ইহা একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, কিন্তু এই মিথ্যা ভানের অভ্যাস চরিত্রবিকাশের পক্ষে বিষম বাধা। নিজের ত্রুটি সরলভাবে স্বীকার করিয়া তাহার সংশোধনের সচেতন চেষ্টাতেই প্রকৃত পৌরুষ ও চরিত্রগঠনের গৌরব।

৫। আরোপ বা প্রজেকশ্যান্—Projection—নিজের দোষত্রুটি অন্যতে আরোপের কৌশলটি পরিচিত। অসচ্চরিত্র স্বামী স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করে। যাহারা উচ্চৈস্বরে সর্বদা ঘোষণা করে 'সব শা— চোর' সম্ভবতঃ তাহার চৌর্যাকাঙ্ক্ষা প্রবল। ইহা অপরাধী বিবেকের আর্তনাদ। ইহা নিজ দায়িত্ব এড়াইবার একটি হীন উপায়। সে দিক দিয়া ইহা র‍্যাশন্যালাইজেশ্যনের সমগোত্রীয়। ইহাতে কঠোর বাস্তবতার অপ্রীতিকরতা হইতে পলায়নের কাপুরুষতা বিদ্যমান। ইহা সেই কারণেই অবাঞ্ছনীয়।

যোয়াকিম্ ফ্লেশার বলেন, নিজের মধ্যে যাহা অগ্রহণযোগ্য ও অবাঞ্ছনীয় তাহা বহির্জগতে অন্যত্র আরোপ করার নামই প্রজ্যেক্‌শন্। যাহা বিপজ্জনক বা অপরাধ বোধ জাগ্রত করে তাহাই যে অন্যত্র আরোপ করা হয় এমন নহে। নিজের মধ্যে কোন তীব্র অনুভূতি বা কামাকাঙ্ক্ষা, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া এ অনুভূতি বা আকাঙ্ক্ষা, তাহাতে আরোপিত হয়।[২] যেমন কালো কুৎসিৎ মেয়ে পাশের বাড়ীর ছেলের নামে কুৎসা রটায়, যে সে ছেলে তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে।

৬। উদ্গতি বা সবলিমেস্যন Sublimation—অনেক সময় আমাদের অসাফল্য, সমাজ উচ্চতর মূল্য দেয়, এমন পরিবর্তন দ্বারা ভুলিতে বা মুছিয়া দিতে চেষ্টা করি। দেহগত কামজ প্রেমবস্তুকে না পাইয়া বহু ব্যর্থ প্রেমিক সমাজসেবা বা ধর্মের পথে আঘাত ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। অনুরাগ ও ঘৃণা মানুষের প্রবলতম দুটি প্রবৃত্তি ; কিন্তু আমাদের জটিল সমাজব্যবস্থায় তাহাদের সহজ ও সম্পূর্ণ তৃপ্তি সম্ভব হয় না। তখন এই প্রবল শক্তিকে উন্নততর পথে পরিচালনাদ্বারা সমাজ কর্তৃক অনুমোদন-যোগ্য অন্য কোন উপায়ে তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করা হয়। সমাজের রীতিনীতি মানিয়া সমাজের শ্রদ্ধালাভ করিয়া বাঁচিতে হইলে ইহা একটি উৎকৃষ্ট উপায়। প্রত্যেক শিশুই উৎসুক, চঞ্চল, ক্রিয়াশীল। তাহার ঔৎসুক্য, চঞ্চলতা, কর্মমুখীনতা যথোচিত ক্ষেত্র না পাইলে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হইবে। তাই পিতামাতা শিক্ষককে দেখিতে হইবে তাহার প্রাণচাঞ্চল্য ও উদ্যম যেন বাঞ্ছনীয় পথে চালিত হওয়ার সুযোগ পায়। শিশুর যুদ্ধ করিবার স্পৃহা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মুষ্ট্যাঘাত (boxing) ক্রিয়ায় পরিবর্তন করা যাইতে পারে, যুবকের এই যুযুৎসা, ব্যবসায়, শিক্ষা বা অন্য কোন সমাজস্বীকৃত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় পরিবর্তন করা যাইতে পারে। প্রতি ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট বিধি নিয়ম অনুযায়ী প্রবৃত্তিকে চালনা করিতে হইবে। প্রবৃত্তিকে বিধি নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধাই প্রবৃত্তির উদ্গতি। আমাদের আদিম বন্য ক্রোধকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণায় পরিবর্তিত করা যাইতে পারে। পাশবিক কামপ্রবৃত্তিকে

২ Joachim Flescher—*Mental Health & the Prevention of Neurosis* P. 350

সভ্য সুন্দর রোমান্টিক প্রেম ও দাম্পত্য প্রণয়ে পরিণত করা সম্ভব, বর্বর নৃশংসতা ও পীড়নের প্রবৃত্তি নির্দোষ উপহাস রসিকতা ও কৌতুকে পরিবর্তন করা যাইতে পারে। এমন করিয়া আমাদের আদিম অ-মানুষিক প্রবৃত্তিগুলিকে সভ্যজীবনোচিত খেলাধূলা, কৌতুকে গতিপরিবর্তন করিয়া উন্নয়ন করা যায়।[৩]

৭। আত্মকেন্দ্রিকতা বা ইগো-সেন্ট্রিজম্—Ego-centrism—অতিমাত্রায় আদর, প্রশ্রয় বা প্রশংসাতে যে শিশু অভ্যস্ত হয়, তার মনে এ আত্মকেন্দ্রিকতা বদ্ধমূল হয়। সে শিশু সব সময় সকলের কাছেই 'নয়নের মণি' হইবে, এই প্রত্যাশা করে। অন্য কোন বাহিরের লোক আসিলে যদি বাবা মা অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাদের সঙ্গে কথা বলেন, এবং বাড়ীর সেই আদুরে খোকা বা খুকুটির প্রতি দৃষ্টি না দেন, তাহা হইলে তার দারুণ অভিমান জন্মে, এবং নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাইবার জন্য তাহার শিশু-বুদ্ধি অনুযায়ী নানা কৌশল অবলম্বন করে,—সে হয়তো ঘরের মধ্যে আসিয়া মেজেতে ডিগবাজী খাইবে বা লাফ দিয়া বিছানা হইতে নামিবে এবং কিছুতেই সফল না হইলে নানাভাবে মেজাজ মর্জি (temper-tantrums) দেখাইবে বা উচ্চৈঃস্বরে কান্না জুড়িয়া দিবে। এ অভ্যাস অনেক সময়ই শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবনে আঘাত ও দুঃখের কারণ হয়। সে নিজেকে সর্বদা বিশেষ সুবিধা বা বিবেচনার (special consideration) অধিকারী বলিয়া মনে করে এবং অন্যের কাছে কেবল প্রশংসা বা আদর প্রত্যাশা করে। কিন্তু স্কুলে বা অন্যত্র যেখানে অন্য দশটি ছেলে একত্র হয়, সেখানে এ রকম দাবী তো গ্রাহ্য হয়ই না, বরং উহা উপহাসের কারণ হয়। হঠাৎ আদুরে শিশুর মোহভঙ্গ হয় এবং সে নিজেকে অসহায় বোধ করে। অনেক সময় পিতামাতাই শিশুর মনের মধ্যে এই আত্মকেন্দ্রিক ভাব জাগাইবার এবং এভাব পুষ্ট করিবার জন্য দায়ী। তাঁহারা দাবী করেন স্কুলের থিয়েটারে তাদের মেয়েটিকেই সবচেয়ে ভাল পার্টটি দিতে হইবে,—ক্লাশের পরীক্ষায় তার ছেলেটিকেই প্রথম বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। সহজেই বুঝা যায়, এই মনোভাব স্থায়ী হইলে শিশু বাস্তবের রূঢ় আঘাত সহিবার জন্য অপ্রস্তুত হয় এবং এই স্ফীত অহঙ্কারের

[৩] W. S. Sadler—*The Mind at Mischief* P. 117

অনিবার্য ফল, অন্ততঃ দুর্বলচিত্তদের জন্য, পুনঃ পুনঃ দুঃখ ও নৈরাশ্য। অবশ্য দৃঢ়চিত্তদের মনে এ-জাতীয় আঘাত অধিকতর উদ্যম ও প্রয়াস উদ্বুদ্ধ করিয়া ব্যক্তিকে সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে।

৮। মনোযোগ আকর্ষণ কৌশল বা এ্যাটেন্‌শ্যন গেটিং—Attention-getting—আত্মকেন্দ্রিকতা হইতেই উদ্ভূত এই কৌশল বা প্রক্রিয়া। পিতা-মাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য অনেক সময় শিশুরা দুষ্টামী করে বা অবাধ্যতা দেখায়। যদি দেখা যায় কোন শিশু এই কৌশলটি অতিমাত্রায় ব্যবহার করিতেছে সে ক্ষেত্রে শিশুর পিতামাতা বা শিক্ষকের উচিত শিশুকে উপেক্ষা করা। তাহা হইলে সাধারণ বুদ্ধিমান শিশু সহজেই বুঝিতে পারে যে এ উপায়ে স্বার্থসিদ্ধি হইবে না, তখন সে সমাজ দ্বারা গৃহীত অন্য পন্থা অবলম্বন করে।

৯। পরের দোষ দর্শন ও সমালোচনা বা ক্রিটিসিজম্—Criticism—পরের দোষ দর্শনে আনন্দ পায় না এমন মানুষ পৃথিবীতে বিরল। আমাদের নিজেদের দোষ এত প্রচুর যে সে জন্য আমরা নিজের কাছেও লজ্জিত থাকি,—পরের মধ্যে সে রকম দোষ দেখিলে আমরা উল্লাসে মুখর হইয়া উঠি। আমাদের মন যেন বলে, "আমরা এতটা খারাপ নই।" পরের দোষটা যদি সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারি, তাহা হইলে খুশির আর সীমা থাকে না, তাহাতে একটা মস্ত আত্মতৃপ্তি আছে। সমালোচনা দ্বারা অন্যকে লোকের কাছে হেয় করা হয়। ইহাতে যেন নিজের সম্মান বাড়ে। ব্যক্তির সংশোধনের জন্য সমাজের এ নিন্দার প্রয়োজন আছে। তবে সমালোচনা বস্তুনিষ্ঠ ও অসূয়াশূন্য হইলেই তাহা বাস্তবিক মূল্যবান হয়। ন্যায্য সমালোচনার অভ্যাস বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধের ভিত্তি এবং প্রকৃত শিক্ষার ইহা একটি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। গঠনাত্মক, অসূয়াশূন্য ন্যায্য সমালোচনা পৃথিবীতে অতিশয় দুর্লভ।

১০। পরের সহানুভূতি বা করুণা আকর্ষণের কৌশল বা সিম্প্যাথীজম্—Sympathism—অনেক সময় কঠিন কাজ করিবার প্রয়াসটুকু আমরা করিতে চাই না,—সেই জন্য মানুষের মন গলাইয়া সহজে সে ফলটি লাভ করিতে চেষ্টা করি। পরীক্ষা ভাল হয় নাই, তখন অধ্যাপকের দুয়ারে ধর্ণা দিয়া বলি, 'অসুখ হইয়াছিল, সে জন্য পড়াশুনা করিতে পারি নাই' ইত্যাদি।

'কিউ'তে দাঁড়াইয়া টিকিট কিনিবার কষ্ট স্বীকার না করিয়া সামনের কাহারও দয়ার উদ্রেক করিয়া তাহাকে দিয়া আগে ভাগে টিকিট কাটাই।

ইহাও নিজ দায়িত্ব এড়াইবার ও নিজ দুর্বলতা ঢাকিবার একটি অপকৌশল। এ অভ্যাস বলিষ্ঠ চরিত্র গঠনের পথে বাধা।

১১। দিবাস্বপ্ন ও অলস কল্পনা বা ডে ড্রিমিং এ্যাণ্ড ফ্যান্‌ট্যাজী—Day dreaming and Fantasy—অনেক সময় বাস্তব জগতে যে আনন্দ বা সাফল্য আমরা অর্জন করিতে পারি না স্বপ্ন ও কল্পনার সহজ পথে সে আনন্দ উপভোগের ব্যর্থ প্রয়াস করি,—ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্ন দেখি! ইহাতে হয়তো দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো হয়। ইহা একটি পলায়নী মনোবৃত্তি (escapism)। সকলের জীবনেই হয়তো এই কৌশল কখনো ও কখনো ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, তথাপি ইহার অতিরিক্ত ব্যবহার সবল চরিত্র গঠনের অন্তরায় ইহা অবশ্য স্বীকার্য। এ পৃথিবীতে সাফল্যের সঙ্গে বাঁচিতে হইলে বাস্তব দৃষ্টি-ভঙ্গী চাই। কল্পনা যেন কর্মের স্থান অধিকার না করে। অতিমাত্রায় দিবা স্বপ্ন বা কল্পনাবিলাস ভবিষ্যৎ মানসিক বিকারের দ্যোতক হইতে পারে। স্বাভাবিক স্নেহবঞ্চিত শিশু কল্পনার আশ্রয় নিয়া তাহার জীবনের এই মৌলিক অভাব পূরণের চেষ্টা করে। কলেজে-পড়া ছেলে মেয়েরা নিজদিগকে চিত্রজগতের তারকা কল্পনা করিয়া সুখ পায়। শিশুর জীবনে কল্পনার স্থান সামান্য নয় কিন্তু কল্পনার নিয়ন্ত্রণ সুশিক্ষার অঙ্গ। অলীক আকাশচারী কল্পনার মূল্য সামান্যই। মন্তেসরী শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে এ জাতীয় কল্পনাকে একেবারেই প্রশ্রয় দেন নাই।

১২। অতিরিক্ত মূল্যদান বা আইডিয়ালিজেশ্যন্—(Idealization)—কখনো কখনো কোন দ্রব্য বা মানুষকে কোন গুণ বা ধর্মকে আমরা তাহার বাস্তব মূল্য হইতে অতিরিক্ত মূল্যদান করি, যেমন মনে করি আমার ঘড়িটার মত নিভু´ল সময় আর কোন ঘড়ি দেয় না। যাহারা প্রেমে পড়িয়াছে তাহারা প্রেমপাত্র বা পাত্রীকে মনের মাধুরী মিশাইয়া অপরূপ বলিয়াই মনে করে। যেখানে গভীর অনুরাগ সেখানেই এই অন্ধতা। আমার ছোট মেয়ে সুমিত্রার আজই বিকালে-পাওয়া একখানা চিঠি এই অন্ধতার একটি সুন্দর উদাহরণ। সে তাহার বন্ধুকে লিখিয়াছে, "আমার বাবার মত ভাল বাবা আর কারও

হয় না—তাঁহার চারিদিকে যেন একটি স্নেহ-প্রীতি ও স্থচিতার পরিবেশ" জীবনে এই মোহের স্থান আছে মূল্য আছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মোহভঙ্গের দুঃখও অনিবার্য। জীবনে সফলতা অর্জ্জন জন্য উদ্যমের পিছনে নিজের সম্বন্ধে কিছুটা অহমিকা কিছুটা মোহ থাকাই বোধ হয় ভাল। তবে ইহা অন্ধ দাম্ভিকতায় পরিণত হইলে দুঃখের কারণ হইতে পারে।

১৩। অতৃপ্ত কামনা বা মানসিক আবেগকে দৈহিক উপসর্গে পরিবর্তন বা কনভার্সন—Conversion—অনেক সময় অবচেতন মনের আকাঙ্ক্ষা সামাজিক বুদ্ধির প্রহরা ভেদ করিয়া সচেতন জীবনে তৃপ্তিকর প্রকাশ খুঁজিয়া পায় না! এই দ্বন্দ্বের ফল অনেক সময় হিষ্টিরিয়া ইত্যাদি শারীরিক বিক্ষেপের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। কোন দৈহিক কারণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না এমন মাথাব্যথা, বমনেচ্ছা, পেটের অসুখ কখনো কখনো অবচেতন মনে অমীমাংসিত দ্বন্দ্বের ফলে হয়। মেয়েরা সামাজিক নিন্দাকে বেশী ভয় করে বা করিতে বাধ্য হয় তাই তাহাদের পক্ষে জৈব কামনার সুস্থ সহজ প্রকাশ অনেক বেশী কঠিন—কাজেই হিষ্টিরিয়া জাতীয় উপসর্গ তাহাদের মধ্যে বেশী দেখা যায়।

১৪। কূর্মনীতি বা উইথ্‌ড্রইং—Withdrawing—বাহিরের আঘাত এড়াইবার জন্য কখনো কখনো আমরা ভয়ে অভিমানে নিজের মধ্যেই নিজেকে গুটাইয়া লই। যাহারা দুর্বল, অভিমানী ও আত্ম-অবিশ্বাস-পরায়ণ তাহারা এই উপায়েই আত্মরক্ষায় চেষ্টিত হয়। এরা শান্ত চুপচাপ থাকে বলিয়াই পিতামাতা শিক্ষকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় কিন্তু এ অভ্যাস শিশুদের মধ্যে গড়িয়া উঠিতে দেওয়া উচিত নয়। এ পৃথিবীতে বাঁচিতে গেলে দ্বন্দ্ব, আঘাত এড়াইবার উপায় নাই। অসাফল্য ও উপহাসের ভয়ে সমস্ত প্রতিযোগিতা হইতে নিজেকে সরাইয়া কূর্মের মতো নিজের খোলসের মধ্যে লুকাইয়া থাকিলে সাময়িক আঘাত হয়তো এড়ানো যায়—কিন্তু পলায়নী বৃত্তি বাস্তবিকপক্ষে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। ইহাতে চরিত্রের ভিত্তিই দুর্বল হইয়া যায়। যে ছেলে জুজুর ভয়ে নিজের মধ্যেই লুকাইয়া বেড়ায় সে ছেলে স্বভাবতই অন্যের কাছে প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে পারে না। কোন ব্যাপারেই সে ভরসা পায় না। সাধারণত এ ছেলেরা দিবাস্বপ্ন ও অলীক কল্পনার আশ্রয়

গ্রহণ করে। এ রকম কুনো স্বভাবদের অন্য দশজনের সঙ্গে মিলাইয়া জুজুর ভয় ভাঙ্গিয়া দেওয়া দরকার।

১৫। সর্ব বিষয়ে অবাধ্যতা বা নেগেটিভিজম্—Negativism—এটি কুর্ম-রীতিরই বাড়াবাড়ি অবস্থা। কোন কোন অতি-অভিমানী বালকের ব্যবহারে চরম একগুঁয়েমী দেখা যায়। তাহার রাগ বা অভিমান বা ভয় এত প্রবল যে কোনো প্রকার সহযোগিতা করিতে সে অনিচ্ছুক। সে প্রশ্নের উত্তর দিবে না, খাইবে না, খেলিবে না। শাস্তি দিয়াও হয়তো সুফল পাওয়া যায় না। ঘাড় বাঁকা করিয়া মার খায়। মিষ্টি কথা দিয়াও তাহাকে ভিজানো যায় না। তাহার মন মুখ বাঁকাইয়া কেবলই বলে, "না, না না, না!" হয়তো কতক্ষণ পরে নিজের ইচ্ছায়ই সে কাজটি করে, কিন্তু তাহাকে তাহা করিতে বলিলে সে কিছুতেই তাহা করিবে না। এ জাতীয় বিদ্রোহী ছেলেরা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। এদের মন সদা বিরক্ত, সদা বিষাক্ত। ইহারা শিক্ষক ও পিতামাতার পক্ষে বিষম সমস্যা। শাস্তি ও পীড়নের পথে ইহাদের সংশোধন হয় না। স্নেহপূর্ণ, যুক্তিপূর্ণ দৃঢ় ব্যবহার দ্বারাই ইহাদের সংশোধন সম্ভব। শিশুর শক্তি সাধ্যের অতিরিক্ত এবং সম্পূর্ণ তাহার রুচিবিরুদ্ধ কোন কাজ তাহাকে দিয়া জোর করিয়া করাইতে গেলে জেদী ছেলেরা এরকম একগুঁয়েমী করিতে পারে। এসব ছেলেদের এমন কাজ দিতে হইবে যাহা তাহারা উৎসাহের সঙ্গে করিতে পারে এবং দশ জনের সঙ্গে যাহাতে সহজে মিশিতে পারে এমন খেলা ও কাজের মধ্যে তাহাদের টানিতে হইবে। কোনো কোনো বিষয়ে নিজের অক্ষমতার সম্বন্ধে হয়তো এমন ছেলের বাস্তবিক কিছু ভয় আছে এবং সেটা সে কিছুতেই স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নয় এবং তাহার সম্মুখীন হইতেও সে সাহস পায় না। যাহাই হউক, শিক্ষক ও পিতামাতাকে তাহার মনের বিমুখতার কারণটি বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে এবং সহৃদয় অথচ প্রশ্রয়হীন ব্যবহার দ্বারা এবং প্রয়োজন হইলে সাহায্য করিয়া তাহাকে সুস্থ সহজ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

১৬। পশ্চাদপসরণ বা রিট্রোগ্রেসন্ বা রিগ্রেস্তন্—Retrogression বা Regression—কখনো কখনো প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইয়া নিজের অক্ষমতার জন্য অসফল হইলে বালক পূর্ববর্তী শৈশবের কোন সুখকর অবস্থার

ব্যবহারে ফিরিয়া গিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। শিশুকালে পিতামাতার স্নেহচ্ছায়ায় ও আদরে শিশু নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ বোধ করে। ইহা একটি পরম আরামদায়ক অবস্থা। বড় হইয়া শিশু হয়তো দেখিল নূতন একটি ভাই বা বোন আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে—তখন পিতামাতা আশা করেন সে নিজের কাজগুলি নিজেই করিবে। ইহা ক্লেশকর, বিরক্তিকর এবং নিজের মূল্য কমিয়া গিয়াছে বোধ করিয়া শিশু ক্ষুণ্ণও হয়। তাই সে পূর্বের অসহায় অবস্থায়ই ফিরিয়া যাইতে চায়,—যখন কোলে করিয়াই বাবা মা তাহাকে রাস্তাটুকু পার করাইয়া দিতেন, কাপড় জামা পরাইয়া দিতেন, খাওয়াইয়া দিতেন। তাই হাঁটিতে পারিলেও হয়তো কাদার মধ্যে ইচ্ছা করিয়া পড়িয়া গিয়া সে কাঁদিতে থাকিবে, যতক্ষণ না মা আসিয়া তাহাকে কোলে করিয়া তুলিয়া ধোয়াইয়া, মুছাইয়া নূতন জামা পরাইয়া আদর না করেন। ফ্রএডীয়দের মতে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ কোন বিভ্রান্তিকর বা প্রতিকূল অভিজ্ঞতা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলে এ প্রকার পশ্চাদপসরণ (regression) শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। অধিকাংশ শিশুই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত শক্তির যথোপচিত ব্যবহারের উপযুক্ত সুযোগ পায় এবং তাহাতে আনন্দও পায়। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পশ্চাদপসরণ সাময়িক, এবং আপনিই ইহার সংশোধন ঘটে। অধিকাংশ বালক শৈশবের স্মৃতিতেই আনন্দ লাভ করে, বাস্তবিক পক্ষে শৈশবের অসহায়তায় ফিরিয়া যাইতে চায় না।

১৭। অবদমন বা রিপ্রেশ্যন্—Repression—সামাজিক নিন্দার ভয়ে অনেক সময় আমরা মনের আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ দমন করি। যাহার স্মৃতি বেদনাদায়ক বা লজ্জাকর তাহা আমরা এড়াইয়া চলি বা তাহা হইতে দূরে থাকি। সাধারণত: অপ্রীতিকর অবস্থার সঙ্গে মানাইয়া চলার ক্ষমতা মোটামুটিভাবে আমাদের থাকে। কিন্তু অবদমনের অভ্যাসের ফলে আমাদের এই স্বাভাবিক ক্ষমতার সঙ্কোচন ঘটে। অনেক সময় এ অভ্যাসটি বাস্তবিক পক্ষে উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হয় না। যে অশান্তি বা উদ্বেগ এড়াইতে চাই, দমনের চেষ্টায়ই সে উদ্বেগ ভোগ করিতে হয়। এখানে যে দমনের কথা বলা হইল তাহা সচেতন ক্রিয়া। ফ্রএড-পন্থীরা অবচেতন মনে অবাঞ্ছিত কামনা অবদমনকে সমস্ত মানসিক বিকারের কারণ বলিয়া মনে করেন।

১৮। মনের বিকারজনিত ব্যবহার বা নিউরোটিক্ বিহেভিয়ার—Neurotic behaviour—স্বাভাবিক জীবনের অপ্রীতিকর বিভ্রান্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হইতে অক্ষম হইলে আমাদের ব্যবহারে বিকার দেখা দেয়। পরীক্ষার পড়া তৈরী হয় নাই, তখন ভয়ে ত্রাসে গায়ে জ্বর আসে। বাস্তবিকই জ্বরের লক্ষণ শরীরে প্রকাশ পায়, যদিও ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা যায় সত্যিকার জ্বর হয় নাই। কখনো কখনো সাময়িক বাক্‌রোধ, দৃষ্টিহীনতা, স্মৃতি লোপ ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। শারীরিক রোগ না হইলেও ক্লেশটা কিছু কম হয় না। এ সমস্ত রোগের লক্ষণ কখনো মানসিক কোনো দ্বন্দ্ব বা অবদমিত আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। ইহা অন্যকে এবং নিজেকেও প্রতারণার জন্য ব্যবহৃত হয়। এ প্রক্রিয়াটি সচেতন মনের ক্রিয়া নয় এবং প্রতীকের তাৎপর্য ব্যাখ্যার দ্বারা ইহার কারণ নির্ণয় অনেক সময় সহজ হয়।

যে সব প্রক্রিয়া বা কৌশলের কথা আলোচনা করা হইল সেগুলি ব্যক্তি যেখানে তাহার জীবনের সমস্যা সম্যক সমাধানে অক্ষম বোধ করে সেখানেই ব্যবহৃত হয়। এগুলি ব্যক্তির অহংকারের আত্মরক্ষার নানা কৌশল। অল্পমাত্রায় ইহাদের ব্যবহার দূষণীয় নয় কিন্তু ইহাতে অভ্যস্ত হইলে ব্যক্তি-চরিত্র দুর্বল হয়, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ সুস্থ বিকাশ ব্যাহত হয়। শিক্ষকের কর্তব্য শিশুর নিজ শক্তি সম্বন্ধে তাহাকে সচেতন করিয়া তোলা,—'পারিব না' বলিয়া যেন সে অল্পেই পিছাইয়া না পড়ে। দশজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া খেলা বা কাজ করিতে, তাহাকে অভ্যস্ত করিয়া তুলিতে হইবে। বাধা অতিক্রম করিতে, বিপদ জয় করিতে তাহার পৌরুষ ও উদ্যম যাহাতে জাগ্রত হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে কাজ শিশুর শক্তিসাধ্যের বাহিরে তেমন কাজ দিয়া অসাফল্যের জন্য তাহাকে দোষী করা অথবা তাহাকে উপহাস করা অনুচিত। তাহার নিজ রুচি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী গঠনমূলক কাজে তাহাকে উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য। ভীরু ও আত্মঅবিশ্বাসী শিশুদের সঙ্গে স্নেহ ও বিবেচনার সহিত ব্যবহার করা দরকার কিন্তু তাহাদের দুর্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।[৪]

---

৪ Crow & Crow—*Mental Hygiene P 68.*

নতুন মা

তোমরা যাহারা নতুন মা হইয়াছ তাহাদের কাছেই দুটি কথা। বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে, তাই এই প্রয়াস। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের বিধি হইতেছে, পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ। আর নতুন যুগের শাস্ত্র বলে পঞ্চাশোর্ধ্বে বই লিখিবে, উপদেশ দিবে। নতুন শাস্ত্রের বিধিই মানিতেছি; কারণ নতুন মানুষদের কল্যাণে বন ব্যবস্থা রয়েছে শুধু ভূগোলের পাতায়।

ছোট্ট মা তুমি। কত গর্ব, কত আনন্দ, কত আশা তোমার ছোট্ট খোকা বা খুকুকে ঘিঁরিয়া। সত্যই শিশু ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ, তোমার ছোট্ট সংসারের নতুন প্রাণ-কেন্দ্র, তোমাদের স্বপ্ন ও কল্পনার বাস্তব রূপায়ণ। শিশুকে নিয়া গর্ব করার অধিকার তোমার আছে। একটি গল্প শোন। কর্ণেলিয়া ছিলেন রোম্যান স্পেনের শাসক প্রসিদ্ধ বীর ও বিচক্ষণ নেতা টাইবেরিয়াস সেম্‌প্রোনিয়াস গ্রেকাস্ (খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক) এর মনস্বিনী সহধর্মিণী। কর্ণেলিয়ার পিতা ছিলেন ইতিহাস প্রসিদ্ধ বীর ও শিল্পী সিপিও এ্যাফ্রিকেনাস। সুমাতা হিসাবে কর্ণেলিয়ার নাম রোমের ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া আছে। কর্ণেলিয়ার সুশিক্ষায় তাঁর ছেলেরাও পিতার মত প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। দুজনেই দেশের লোকদের দ্বারা ট্রিবিউন নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কর্ণেলিয়া বড় ঘরের মেয়ে, বড় ঘরের ঘরণী, কিন্তু তাঁর কোন বিলাস ব্যসন ছিল না। একবার একজন মহিলা তাঁর বাড়ীতে আসিয়া নিতান্ত সাধারণ আসবাবপত্র, পোষাক ইত্যাদি দেখিয়া অবাক হইয়া কর্ণেলিয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার মূল্যবান রত্নাদি নাই?" কর্ণেলিয়া তাঁহার দুটি সন্তানকে কাছে টানিয়া সগর্বে বলিয়াছিলেন, "ইহারা আমার শ্রেষ্ঠ রত্ন।" কর্ণেলিয়ার মত কত রত্নগর্ভা মা আমাদের দেশের কত মহাপুরুষকে ধারণ করিয়াছেন—পালন করিয়াছেন—গঠন করিয়াছেন। তাঁহারা নীরবে তাঁহাদের সেবাহস্তের প্রসাদ রাখিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার উল্লেখ নেই। তবু তাঁহারা নমস্যা।

তুমিও সেই সুমাতা। ভগবান তোমার কাছে ন্যাস্ত রাখিয়াছেন তাঁহার একটি অমূল্য রত্ন। তাহাকে পোষণ করিবার, গঠন করিবার, পবিত্র দায়িত্ব, বিশেষ

করিয়া, তোমার। তোমাদের হুজনের কাছ হইতে প্রত্যক্ষভাবে এবং তোমাদের বহু পূর্বপুরুষের কাছ হইতে অপ্রত্যক্ষভাবে শিশু পাইয়াছে তাহার দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি যা এখনও সম্পূর্ণ অপরিপুষ্ট, অপরিণত ; পাইয়াছে কতগুলি অন্ধ প্রবৃত্তি ও আবেগ,—যা বর্তমানে সম্ভাবনা মাত্র—যার থেকে ক্রমে গঠিত হইবে তাহার মন, বুদ্ধি, অনুভূতি, ইচ্ছা, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব। শুধু বংশধারার গতিতে শিশু যাহা নিয়া জন্মগ্রহণ করিল তাই তাহার ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে,—এমন ধারণা ভুল। শিশুর মধ্যে কোন সম্ভাবনা ফুটিয়া উঠিবে, কোন দুষ্প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করিবে, কোন সদ্‌গুণ বিকশিত হইবে, তাহার অনেকটা নির্ভর করে তাহার যত্ন, তাহার পুষ্টি, তাহার সংসার পরিবেশ, তাহার সমাজ, তাহার শিক্ষার উপরে। তাই, তুমি সদ্বংশের মেয়ে, ভাল ঘরে বিবাহ হইয়াছে, একথা ভাবিয়া তোমার শিশু সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার অবসর তোমার নাই। আর তোমার বা তোমার স্বামীর বংশে কোথায় কোন দোষ বা রোগ বা কলঙ্ক লাগিয়াছিল বলিয়া তোমার শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কিক হইবার বা নিরাশ হইবারও হেতু নেই। খুব কম রোগই বংশগত, কোন রোগই কিনা, ইহা নিয়াও সন্দেহ আছে।

কাজেই মস্ত তোমার দায়িত্ব। শিশুর প্রথম হু'তিন বৎসর তুমিই শিশুর খাদ্যদাত্রী, তার রক্ষয়িত্রী, তার সেবিকা, সহচরী, ধাত্রী। তুমিই প্রথম শিক্ষাদাত্রী, তুমিই তার সংসার, সমাজ বন্ধু, চালিকা, গঠয়িত্রী। শিশু জানে মা-ই তার সর্বোচ্চ। মাতার তুলনায় পিতা শিশুর কাছে গৌণ—নগণ্য। এজন্য সে পিতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষাই করে।

শিশু প্রথম যখন জন্মে এবং তারপর হু' তিন মাস পর্যন্ত সে খুব সুদৃশ্য জীব নয়। তিন চার বছরের শিশু যেমন হাসিয়া, নাচিয়া, খেলিয়া, আধোআধো কথা বলিয়া, অদ্ভুত অনুকরণ করিয়া মন কাড়িয়া লইতে পারে, একেবারে কচি বাচ্চা তা কিছুই পারে না। কেমন কুশ্রী কোঁচকানো চামড়া, অমসৃণ, রুগ্ন লাল্‌চে লাল্‌চে রং, পাতলা সরু সরু লোম, কুৎকুতে চোখ, মাথা হয়তো প্রায় হ্যাড়া, কেমন যেন আঁশটে গন্ধ,—আর ব্যবহার ? ঘুমাইয়াই থাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিশ ঘণ্টা, জাগে যখন ট্যাঁ ট্যা করিয়া কাঁদে, লাল পড়ে, বমি করে, তা ছাড়া আরো সব কুকর্ম আছে। ওর বাবা তো ওকে প্রথম দেখিয়া চমকিয়া ওঠা, শেষে

কতকটা ঘাবড়াইয়া যাওয়া, কতকটা যেন ঠকিয়া গিয়াছে (হাসপাতালে ওরা আবার বদলে দেয় নি তো ?) এমন মুখ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। হয়তো প্রথম দেখিয়া তুমিও যেন বিশ্বাস করিতে পার নাই—এই কি ছিল তোমার স্বপ্ন সাধ ? তোমার রঙীন কল্পনা কি ওই ? অসহায় মাংসপিণ্ডের দিকে তাকাইয়া তোমার বুকের ভেতরটা মুচড়াইয়া কাঁদিয়া ওঠে, তুমি বল "বাছারে আমার! তোকে সবাই এত অবহেলা করে, আমি তোকে ঢেকে রাখবো আমার ভালবাসা দিয়ে—আর কেউ তোর না থাক, আমি তোর সঙ্গে আছি।" এই অহেতুক নিঃস্বার্থ করুণা দিল তোমার চোখের দৃষ্টি বদলাইয়া, শিশু হইল তোমার সুন্দর, হইল তোমার আপন। এই ভালোবাসার দামে কিনিয়া নিলে শিশুর হৃদয়কে। এটা শুধু কল্পনার কথা নয়—আধুনিক শিশু মনো-বিজ্ঞানের কথা।

"শিশুর জীবনের প্রথম বছরটার কথা এভাবে চিন্তা করো। সে জাগিয়া ওঠে কারণ সে ক্ষুধার্ত; সে কাঁদে কারণ সে খাইতে চায়। তার ছোট মুখ দিয়া মাইটি পরম আগ্রহে চুষিতে আরম্ভ করে, সমস্ত শরীরে তার আনন্দের শিহরণ জাগে। যতক্ষণ সে দুধ খায় ততক্ষণ বুঝিতে পারা যায় এটা তার পক্ষে একটি গভীর নিবিড় অনুভূতি। সম্ভবতঃ দুধ খাইতে খাইতে সে ঘামিয়া ওঠে। খাওয়ার মাঝখানে হঠাৎ যদি মাই ছাড়াইয়া নেওয়া হয়, তবে সে ভীষণভাবে চীৎকার করে। যদি আশ মিটাইয়া পেট ভরিয়া সে খাইতে থাকে, তবে তার যেন সুখের নেশায় ঘুম আসিয়া যায়। যখন সে ঘুমাইয়া থাকে, তখনও মনে হয় সেই সুখস্বপ্নই দেখিতেছে তার ঠোঁট দুটি থাকিয়া থাকিয়া চুক্‌চুক্ করিয়া কাঁপিতে থাকে, যেন সে স্তন্যপান করিতেছে আর তার সমস্ত মুখে ছড়াইয়া যায় প্রশান্ত আনন্দের আভা। এ সব মিলাইয়া এটাই বুঝা যায় তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ এই স্তন্যপানে। জীবন সম্বন্ধে তাহার প্রথম দৃষ্টিভঙ্গী নির্ভর করে তাহার এ খাদ্য গ্রহণ সম্পূর্ণ তৃপ্তিকর ও নির্বাধ হয় কি না তাহার উপর। পৃথিবীর সম্বন্ধে তাহার প্রথম ধারণা সে সংগ্রহ করে যে ব্যক্তিটি তার খাদ্য জোগায়, তাহাকে তাহার কেমন ভাল লাগে, তাহা হইতে।"[১]

বাজারে এখন এতো রকমের ভাল 'বেবী ফুড' বাহির হইয়াছে আর এতো

---

১ Dr. Benjamin Spock—*Pocket Book of Baby and Child Care*. P. 22

তাহাদের প্রচারমাহাত্ম্য, আর বোতলে খাওয়ানো কতকগুলি বিষয়ে সুবিধা-জনকও বটে, তাই পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণে তোমরা অনেকে এদিকে ঝুঁকিয়াছ। কথাটা একটু আলোচনা করা যাক।

বোতলে খাওয়ানোর সুবিধা হইতেছে, ইহাতে মাকে আটক থাকিতে হয় না। তাহাছাড়া শিশু যথেষ্ট খাদ্য পাইতেছে কিনা ইহা নিয়া অযথা মাকে চিন্তা করিতে হয় না—কারণ ইচ্ছা করিলেই বোতলে দুধের পরিমাণ বাড়ানো যায়।

আর একটা কথা হয়তো তোমরা শুনিয়া থাকো, বা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া থাকো। সেটা হইতেছে শিশুকে স্তন্যদান করিলে মায়ের স্বাস্থ্যের হানি হয়, বিশেষ করিয়া তাহার হাড়গুলি হইতে ক্যালসিয়াম প্রচুর পরিমাণে ক্ষয়িত হয়। আর একটা কথা যেটা সলজ্জভাবে গোপনে তোমরা আলোচনা করো, কিন্তু বিদেশী মেয়েরা খোলাখুলি ভাবেই বলেন,—সেটা হইল যে, শিশুকে মাই দিলে মা'র দেহ সুষমা 'ফিগার' খারাপ হইয়া যায়। কাজেই স্তন্যদান "নৈব নৈবচ।"

বোতলের সুবিধা আছে সত্য। কিন্তু ইহাতে বিপদের আশঙ্কাও আছে। যদি চুষি ও বোতল সব সময়ে সাবধানে এবং সযত্নে ধোয়া না হয় তবে তাহাতে নানা বীজাণু বাসা বাঁধিবে। বাসি তৈরী ফুড অনেক সময় শিশুর পক্ষে বিষ। চুষির ফুটো বেশী বড় বা বেশী ছোট হইলে শিশুর কষ্ট হয়, অতৃপ্তি জন্মে।

স্তন্যদানে মার দেহের ক্ষতি হইতে পারে বা হইয়া থাকে,—বিশেষ করিয়া মাতা যদি রুগ্না হন। কিন্তু সাধারণতঃ সুস্থ যে কোনো মাতা উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিয়া স্তন্যদানজনিত ক্ষতি অতি সহজেই পূরণ করিয়া নিতে পারেন। একজন আমেরিকান বড় ডাক্তারের মত উদ্ধৃত করিতেছি—"হয়তো তোমরা জানিয়া থাকিবে শিশুকে স্তন্যদান করিলে মায়ের অনেকখানি ক্ষয় হয় —অর্থাৎ মা ক্লান্ত ও দুর্বল হইয়া পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কথাটা একেবারে বাজে। অবশ্যই যে-মা শিশুকে স্তন্যদান করান, তাঁহাকে বেশী পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে হইবে, ঠিক যেমন তাঁহাকে বেশী খাইতে হয়, যদি তাঁহাকে দুবেলা সাঁতরাইতে হয়। কিন্তু যে স্ত্রীলোক স্বাস্থ্যবতী ও সুখী তার স্বভাবতঃ খাদ্যের প্রয়োজনের সঙ্গে ক্ষুধা বাড়িয়া যায়। সুস্থা মাতার পক্ষে এক মাস নিয়মিত সন্তরণে যে পরিমাণ ক্লান্তি হয়, এক মাস নিজ শিশুকে স্তন্যপান

করাইলে তাহার চাইতে বেশী ক্লান্তি হয় না। তবে যদি তার ওজন কমিয়া যাইতে থাকে বা স্বাস্থ্যাবনতির অন্য লক্ষণ স্পষ্টভাবে দেখা দেয় তখন স্তন্যদান বন্ধ করাই উচিত।"[২]

'ফিগার্' নষ্ট হইয়া যাওয়া সম্বন্ধে আবার একজন ডাক্তার লিখিয়াছেন—"শিশুকে স্তন্যদান করাইতে হইলে বেশী খাইতে হইবে, কাজেই 'মুটিয়ে যাবার' ভয় আছে—এটা খুব সঙ্গত আশঙ্কা নয়।···মাতার নিয়মিত ওজন থেকে বেশী ওজন বাড়া নিস্প্রয়োজন। শিশুকে স্তন্যদান করাইলে স্তনের গড়ন নষ্ট হইয়া যাইবে এটাও খুব ঠিক নয়। আমার নিশ্চিত ধারণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থায়ী কোন বিকৃতি ঘটে না। বরং কোন কোন ক্ষত্রে দেখা যায়, যে সব মাতা দুই তিনটি সন্তানের জননী হইয়াছেন এবং তাহাদের স্তন্যদান করাইয়াছেন তাঁহাদের স্তন পূর্বাপেক্ষা সুগঠিত হইয়াছে। দুইটি বিষয় সম্ভবতঃ, এবিষয়ে ফলের বিভিন্নতার জন্য অনেকখানি দায়ী। মাতা যদি শুধু সন্তান পালনের সময় নয়, তাহার পূর্বেই গর্ভাবস্থায় যখন স্তনের আয়তন বৃদ্ধি পায়, তখন হইতেই ভাল বক্ষাবরণ (brassiere) পরিধান করেন তবে বক্ষের চামড়া ঢিলা হইয়া যাওয়া এবং ঝুলিয়া পড়া নিবারণ করাইতে পারেন। আর একটি দরকারী জিনিস হইল এই সময়টায় যাহাতে শরীরে বেশী চর্বি জন্মায় এ-জাতীয় খাদ্য মাতা সাবধানে বর্জন করিবেন।"[৩]

আমেরিকা, ইংলণ্ড কলের দেশ, কৃত্রিমতার দেশ, তাই কৃত্রিম খাদ্য, যান্ত্রিক খাদ্যব্যবস্থা নিয়া বহু আলোচনা তাঁরা করিতেছেন। কিন্তু বহু পরীক্ষা, গবেষণা করিয়া তাঁহারা আজ স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন্যের বিকল্প নাই, মাতৃস্নেহের যান্ত্রিক কোন পরিবর্ত নাই এই কথাটাই আজ বলিতে চাই।

আবার আমেরিকান ডাক্তারদের মত উদ্ধৃত করি—"শিশুকে স্তন্যদানই স্বাভাবিক। সাধারণ সূত্র হিসাবে একথা বলা যায়, স্বাভাবিক পথে কাজ করাই সবচেয়ে নিরাপদ—যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি নিশ্চিতভাবে এর চেয়ে ভাল

---

২ C. Anderson Aldrich & Mary M. Aldrich—*Feeding our Old Fashioned Children.*

৩ Dr. Benjamin Spock.—*Baby & Child Care* P. 30-31.

পন্থা আবিষ্কার করিতে পার। শিশুকে স্তন্যপানের যতগুলি উপকারিতা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, হয়তো তাহা ছাড়া আরো অনেক উপকারিতা আমরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান নই বলিয়া আবিষ্কার করিতে পারিনাই। মাকে শারীরিক ভাবে স্তন্যদান সাহায্য করে। যখন শিশু স্তন্যপান করে তখন তার ফলে জরায়ুর পেশী সজোরে সঙ্কুচিত হইতে থাকে। ইহাতে জরায়ুর স্বাভাবিক আকার ও অবস্থায় ফিরিয়া আসা ত্বরান্বিত হয়।···

···তোমরা শুনিয়া থাকিতে পারো, স্তন্যদান শিশুকে নানা ব্যাধি হইতে রক্ষা করে। মায়ের বুক থেকে দুধ নির্গত হওয়ার আগে আর একটি তরল পদার্থ ক্ষরিত হয় তার নাম কলোস্ট্রাম (Colostrum), তাহার প্রতিষেধক গুণ আছে। এটা অবশ্য প্রমাণিত হয় নাই। তবে যে সব শিশু মায়ের বুকের দুধ খায়, তাহাদের চেয়ে যাহারা বোতলে দুধ খায়—তাহাদের হজমের গোলযোগ বেশী দেখা দেয়। মায়ের বুকের দুধের আর একটা সদ্‌গুণ, তা সর্বদাই নির্মল। এ দুধ থেকে শিশু কোন আন্ত্রিক ছোঁয়াচে রোগের জীবাণু (intestinal infection) পাইতে পারে না। আর সাংসারিক কাজের দিক হইতে বহু সময় ও পরিশ্রম ও দুর্ভোগ বাঁচে। বোতলে খাওয়াইলে বোতল-চুষি ধোওয়া, জীবাণুমুক্ত করা, ফুড্ তৈরী করা, ঠাণ্ডা করা ইত্যাদি বহু হাঙ্গামার দরকার। পথ চলিতে গেলে এটা বিশেষ করিয়া টের পাওয়া যায়। অবশ্যই এতে পয়সা বাঁচে। আর একটা সুবিধা যেটা হয়তো অনেক সময়ই আলোচনা করা হয় না। সেটা হইতেছে এতে শিশুর চোষা প্রবৃত্তির (sucking instinct) সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটে। যতক্ষণ সে মায়ের বুকে আছে, সে এই প্রবৃত্তির যথেচ্ছ পরিতৃপ্তি পাইতে পারে। আমার মনে হয়, এইজন্যেই যে সমস্ত শিশু মায়ের বুকের দুধ খায়, তাহারা আঙ্গুল চোষে কম।"[৪]

কিন্তু 'এহো বাহ্য'। এতদিন পাশ্চাত্যবিজ্ঞানীরা ব্যাপারটার আলোচনা করিয়াছেন বাইরের দিক থেকে; শিশু ও মাতার দৈহিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে। কিন্তু কিছুদিন থেকে দৃষ্টি পড়িয়াছে ভেতর দিকে—মানুষের মনের দিকে। যে মা শিশুকে খাওয়াইতেছেন তাঁহার যেমন একটি মন আছে, তৃপ্তি অতৃপ্তি আছে, তেমনি মন আছে শিশুর,—আছে তার তৃপ্তি অতৃপ্তি, সুষ্ঠু পরিণতি বা বিকার।

[৪] Dr. Benjamin Spock—*Baby & Child care* P. 32.

শিশু যখন তোমার বুকের দুধ খাইয়া তৃপ্ত হয় তখন তোমার প্রাণে যে স্বর্গীয় আনন্দ জাগে তাহার কি কোন তুলনা আছে? স্বামীর ভালবাসার আনন্দের এক অপূর্ব স্বাদ—তেমনি আর এক অপূর্ব স্বাদ—শিশুর স্তন্যপানে। যখন তাহাকে তুমি নিজের বুকের দুধ দিয়া মানুষ করিয়া তোলো তখন তুমি সত্যই জানো, তুমি মা,—শিশু তোমার আপন; তুমি শিশুকে আপন দেহের অস্থি-মজ্জা দিয়া গড়িয়া তুলিতেছ, নিজের বুকের রক্ত দিয়া তাহাকে পালন করিতেছ—তুমি তোমার শিশুকে এমন কিছু দিতেছ যাহা পৃথিবীতে আর কেউ দিতে পারে না। এতেই জন্মালো শিশুর উপর তোমার অসংশয় অচ্ছেদ্য দাবী। এ নাড়ীর টান ছেঁড়া যায় না।[৫]

নারীর জীবনে এ গভীর পরিতৃপ্তির প্রয়োজন আছে তাহার সুস্থ বিকাশের জন্য। বিত্তশালিনী বিদেশী মায়েরা ওয়েটনার্স (wet nurse) রাখেন শিশুকে স্তন্য দিবার জন্যে। শিশু পালনের ঝঞ্ঝাট তাঁহারা এড়াইতে চান। সেই অবসর সময়টুকু তাঁহারা ভরিয়া তুলিতে চান, নানা আমোদ-প্রমোদ, স্ফূর্তি ও বিলাসে। কিন্তু বুকের হাহাকার তো মেটে না। আজ ইয়োরোপ ও আমেরিকার মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকাণ্ড অভিশাপ হইল,—তাহা গৃহ-বন্ধন, পারিবারিক জীবনকে শিথিল করিয়া দিতেছে—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে উচ্ছৃঙ্খলতায় মাতিয়া উঠিয়াছে ইয়োরোপ ও আমেরিকার নরনারী। অতৃপ্ত মাতৃত্ব ও অতৃপ্ত পারিবারিক জীবন নারীদের ক্ষেত্রে শতকরা পঁচানব্বুইটি মানসিক বিকারের জন্য দায়ী।[৬] শিশুর দিক থেকে এর কুফল আরো বেশী ভয়াবহ। মাতৃস্তন্যবঞ্চিত শিশুদের মানসিক বিকার নিয়া গত মহাযুদ্ধের পর থেকে বহু গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে: যুদ্ধের সময় বোমার আঘাতে বহু গৃহ বিধ্বস্ত হয়, বহু শিশু মাতৃহীন হয় এবং বহু শিশুকে পিতামাতার কাছ থেকে সরাইয়া নিরাপদ দূর গ্রামে গ্রামে অনেক নার্সারীতে লালনপালনের ব্যবস্থা করা হয়। নার্সারীতে শিশুদের

---

৫ Dr. Bowbly—*The Development of Motherlove* (*Pelican*)

৬ Dr. Mildred Creak—*Presidential Address, National Baby Welfare Council* (1953)

জন্ম ও শিক্ষা সম্বন্ধে দুজন মহিলা মিস্ এ্যানাফ্রায়েড ও মিস্ ডোরথী বার্লিংহাম অগ্রণী হইয়াছিলেন। তাঁহারা যাহা করিয়াছেন তাহার তুলনা নেই। নার্সারী সম্বন্ধে তাঁহাদের আশা অত্যন্ত উচ্চ। কিন্তু তাঁহারাও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এসব নার্সারীতে শিশুদের দৈহিক যত্ন বাড়ীর চেয়ে অনেক বেশী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নেওয়া হয়, কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুদের দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে, কিন্তু মনের ও অনুভূতির সুস্থ বিকাশ অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হয় এবং শিশুরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনোবৃত্তি নিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না।[৭]

শিশু যখন স্তন্যপান করে তখন সে পায় তার জীবনের নিবিড়তম তৃপ্তি। কাজেই যে মা তার এই তৃপ্তির কারণ, সেই তার কাছে সব চেয়ে সুন্দর, সব চেয়ে কাম্য। এই ভালবাসা তার এমন নিবিড় যে এ ভালবাসার বস্তুকে সে একেবারে গিলিয়া ফেলিতে চায়, একেবারে নিজের মধ্যে নিয়া এক করিতে চায়। পরম তৃপ্তির মুহূর্তে দুষ্টু খোকা মায়ের স্তনকে কামড়াইয়া গিলিয়া ফেলিতে চায়। ফ্রয়েড্পন্থীরা এ অভিজ্ঞতা থেকেই বলেন, শিশুর জীবনের ভালবাসার প্রথম প্রকাশ মুখে (oral)। এ তৃপ্তির পথে যেখানে বাধা আসে, (যখন মায়ের বুকের দুধ কম থাকে অথবা যখন বোতলে দুধ খাওয়ানো হয়, অথবা অনিচ্ছুক ধাত্রী তাকে দুধ দেয়) তখন শিশুর মানসজীবন ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে। বারে বারে এমন অতৃপ্তি ঘটিলে সে কারণটিকে অন্ধভাবে, নিষ্ঠুরভাবে ঘৃণা করে, আর তার এ-আক্রোশ প্রকাশ করে কামড়াইয়া, চিবাইয়া, কখনো বা খামচাইয়া। শিশুর জীবনে এ অতৃপ্তি তার মানসিক সুস্থ বিকাশকে ব্যাহত করে, বিকৃত করে। নার্সারীতে যে সব শিশু মানুষ হইয়াছে, তাহাদের কথায় প্রায়ই শুনা যায় "কামড়ে দেব, কুটি কুটি করে ফেলব, একেবারে পিষে মেরে ফেলব।" এসব কথা তাদের বিকৃত মনেরই পরিচয় বহন করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব শিশু বড় হইয়া নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, হৃদয়হীন হইয়া থাকে।[৮]

---

[৭] Burlingham & Freud—*Infants without families and Young children in war time.*

[৮] Agatha Bowley—*The Natural Developmemt of the Child* P, 14-15

শিশু অপরাধীদের অনেকের বাল্যজীবনেই ঘটিয়াছে সুস্থ মাতৃস্নেহের অভাব।[৯]

যদি অ-স্বাস্থ্যের জন্যে শিশুকে নিজের বুকের দুধ দিতে না পারো তাহা হইলে খোকার পাশে শুইয়া বোতলে করিয়া তাকে খাওয়াও। দেখিও চুষির ফুটোটা বেশী বড়ো বা বেশী ছোট না হয়। তোমার বুকের উষ্ণস্পর্শ শিশুকে পাইতে দাও। যদি খুব অসুস্থ না হও, বোতল শেষ হইয়া গেলে ঘুমের আগ পর্যন্ত শিশুকে স্তন্য দাও। সে যেন বঞ্চিত বোধ না করে।

যদি সামর্থ্যে কুলায় এ সময়টা তোমাকে সাহায্য করার জন্য একজন ঝি রাখো। নিজে সুস্থ থাকো—শান্ত থাকো—আনন্দময়ী থাকো। শিশুর কাজ যতটা পারো, নিজহাতে করো। কাজগুলি নোংরা কাজ, কিন্তু মায়েরই কাজ। কি করিয়া জানি না, শিশু বোঝে কতটুকু তুমি ওকে ভালবাসো। তোমার আনন্দ ওকে সুস্থ রাখে। তোমার উদ্বেগ, তোমার রাগ ওকে সচকিত করে, উদ্বিগ্ন করে। ভাল মা হইতে গেলে নির্মলদেহ হইতে হইবে, শান্ত সুন্দর, স্নেহশীলমনও হইতে হইবে। মা হওয়া সহজ কথা নয়।

তাই বলিয়া শিশুকে সারাদিন কোলে করিয়া বসিয়া থাকিবে তা-ও নয়। শিশু কাঁদিলেই কোলে নিতে হইবে, মাই দিতে হইবে, তা নয়। প্রথম থেকেই আস্তে আস্তে শিশুকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলো। অনাদরে শিশুকে যেমন নষ্ট করা যায়, অতি আদরেও শিশুকে নষ্ট করা যায়। বেশি কোলে রাখিলে শিশুর স্বাস্থ্যের হানি হয়, ওর অভ্যাসটিও খারাপ হয়।

শিশুর সঙ্গে সহজ ব্যবহার করো, অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হইও না। শিশু তোমার আনন্দের কারণ হোক—তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ নিবিড়তর করুক। শিশুকে তোমাদের আপন করিয়া নাও।

---

৯ Cyril Burt—*The young Delinquent*.

রবার্ট ওয়েনের শিশু বিদ্যালয়

ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই দরিদ্রের সন্তানদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইংল্যাণ্ডে এক চেষ্টা দেখা যায়। এ বিষয়ে প্রথম অগ্রণী হন ধর্মসংস্থা কোয়েকার সম্প্রদায়। এরা Protestant হইলেও ইংল্যাণ্ডের রাজকীয় ধর্ম (Anglicans) মতাবলম্বীদের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য আছে, তাঁহারা সে ধর্মকে ঠিক মানেন না (Non-conformist)। ১৮০৭ সালে যোসেফ ল্যাংকাষ্টার দ্রুত শিক্ষা বিস্তারের এক অভিনব পন্থা আবিষ্কারের দাবী করেন। তাঁহার পদ্ধতির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইল "ভগবানের আশীর্বাদে এই আবিষ্কারের দ্বারা একটিমাত্র শিক্ষক এক হাজারের বেশী ছাত্রকে চালনা করিতে সক্ষম হইবেন।" বাস্তবিক পক্ষে এই পদ্ধতিটি ভারতবর্ষের পাঠশালায় প্রচলিত 'সর্দার পোড়ো' পদ্ধতিরই বৃহত্তর সংস্করণ। এই পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষক প্রথম সবচেয়ে বুদ্ধিমান্ ও বয়স্ক কয়েকজন ছাত্রকে কোন পড়া বা অঙ্ক শিখাইতেন। এবং তার পর এই সব 'সর্দার পোড়ো'রা প্রত্যেকে এক এক দল ছাত্রকে সেই পাঠ বা অঙ্ক শিখাইতেন। ইহার ফলে স্বল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে পড়া, লেখা, অঙ্ক (3 R's) শেখানো সম্ভব হইত। সর্দার পোড়োদের বলা হইত Monitor, কাজেই এ পদ্ধতির নাম হইল 'Monitorial System'। এই পদ্ধতির ফলে এক এক শিক্ষক 'সহস্র নেত্র সহস্র বক্ত্র, সহস্র বাহু' হইয়া জ্ঞান ও শাসন বিতরণ করিতে লাগিলেন। এই পদ্ধতি যথেষ্ট জনপ্রিয় হইল। এমনকি দেশের রাজা রাণী (George III & Queen Charlottee) ল্যাংকাষ্টার বিদ্যালয়ে বার্ষিক সাহায্য দিতে রাজী হইলেন।

কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী Anglican-রা অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা ডাঃ এনড্রু বেল্ নামে এক শিক্ষকের অধীন অনুরূপ পদ্ধতিতে এক নূতন বিদ্যালয় খুলিলেন। বেল্ পূর্বে মাদ্রাজে এক অনাথাশ্রমের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, এবং সেখান হইতেই এই পদ্ধতি শিখিয়া আসিতেছেন বলিয়া ইহার নাম হইল Madras System।

বাস্তবিক পক্ষে দুই পদ্ধতিতে প্রভেদ সামান্যই ছিল, তথাপি একদল আর একদলকে প্রাণ ভরিয়া গালি দিতে লাগিলেন। তবে এই প্রতিযোগিতার ফল ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা বিস্তারের পথে শুভ হইয়াছিল। দ্রুত শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে দুইটি প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। ১৮১০ সালে the Royal Lancastrian Association, ও ১৮১১ সালে the National Society for the Education of the poor in the Principles of the Established Church গঠিত হয়। পরে Royal Lancastrian Association-এর নাম পরিবর্তন করা হইল "The British and Foreign School Society।" যদিও যে শিক্ষা তাঁহারা বিতরণ করিতেন তাহার মান খুব উচ্চ ছিল না, এবং শিক্ষার বিষয়ের পরিধিও নিতান্ত সংকীর্ণ ছিল, তথাপি সাধারণ লেখাপড়া শিক্ষা ও ধর্ম শিক্ষা বিস্তারে ইহা সহায়ক হইয়াছিল। অধ্যাপক Trevelyan লিখিয়াছেন, ইঁহাদের শিক্ষার ফলে "many people knew the Bible with a real familiarity which raised their imaginations above the level of that inspired vulgarity of mind which the modern multiplicity of printed matter tends rather to increase than diminish."

যদিও ইহার পর হইতে নূতন নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছিল এবং শিশু শিক্ষার বিস্তার ঘটিতেছিল, শিশুদের পক্ষে বিদ্যালয়গুলি সুখ বা আনন্দের স্থান ছিল না। বিদ্যালয়গৃহগুলি অধিকাংশই অন্ধকার ও স্যাঁৎসেতে ছিল, খেলার জায়গা বা বাগান ছিল না। বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রেরা ভিড় করিয়া অস্বাস্থ্যকর পাঠগৃহে ঋজু ও অসাড় হইয়া পাঠগ্রহণ করিত। পাঠ্যবস্তু ছাত্রদের মনের মধ্যে কোন আগ্রহ বা কৌতূহল সৃষ্টি করিত না। প্রাণহীন ও বুদ্ধিহীন মুখস্থই শিক্ষালাভের উপায় ছিল—আর ছিল শিক্ষকের নির্মম তাড়না ও বেত্রাঘাত। সে কালের নিরানন্দ শিক্ষাপদ্ধতির এক হৃদয়গ্রাহী বাস্তবচিত্র আঁকিয়াছেন ডিকেন্স তাঁহার David Copperfield উপন্যাসে। Salem House-এর বিভীষিকার কথা কে ভুলিতে পারে?

শিশু শিক্ষার এই নিরানন্দ মরুভূমির মধ্যে ফলফুল শোভিত মোহন মরূদ্যানের মত আশ্চর্য ঘটনা ১৮১৬ সালে নিউ লানার্ক-এ রবার্ট ওয়েনের

স্থাপিত শিশু বিদ্যালয়। শুধু মাত্র শিশুদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় ইংল্যাণ্ডে ইহাই বোধ হয় প্রথম। প্রচলিত Dame School গুলির সঙ্গে ওয়েনের বিদ্যালয়ের কোন মিল ছিল না। সুন্দর পরিবেশের মধ্যে বাগান-ঘেরা সুন্দর সুন্দর বিদ্যালয়, প্রশস্ত হলঘর, খোলা আলো-বাতাস, প্রচুর খেলাধূলার ব্যবস্থা, নাচ গান কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়া পড়াশোনা, মুখস্থের চাপ নাই, শিক্ষকের তাড়না নাই, বেত্রাঘাত নাই। তাঁহার বিদ্যালয়ের আদর্শ ছিল কবিতা,—

Delight and liberty, the simple creed
Of childhood, whether busy or at rest.

সেকালের ছাত্রদের পক্ষে সে বিদ্যালয় ছিল যেন এক অবিশ্বাস্য স্বপ্নালোক। আর এ বিদ্যালয় কাদের জন্য? ধনীর দুলালের জন্য নয়—স্কটল্যাণ্ডের সব চেয়ে বড় কাপড়ের কল নিউ লানার্ক মিল-এর দরিদ্র শ্রমিকদের জন্য। লোকে বলিল লোকটার মাথা খারাপ হইয়াছে। পণ্ডিতেরা মাথা নাড়িয়া বলিলেন ছেলেগুলির মাথা খাওয়া হইতেছে, পড়াশোনা খেলা-খেলা জিনিস নয়। তাহা কঠিন নীরস ও নিরানন্দই তো হইবে, তাই তো লেখা পড়া শিক্ষা কঠিন সাধনা। কিন্তু এই পাগলা মানুষটির পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, দরিদ্র স্বাস্থ্যহীন শিশুদের শুধু দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতিই হয় নাই, তাহারা লেখাপড়ায়ও আশ্চর্যজনক ভাল ফল করিতেছে। তাহারা উৎসুক, সজীব, বুদ্ধিমান ও স্বাস্থ্যবান মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে। ইহার ত্রিশ বৎসর পর একজন সরকারী শিক্ষাপরিদর্শক পুরাতন নোংরা ও ঘিঞ্জি ডেইম্ স্কুল গুলির সঙ্গে এই নতুন সুন্দর আনন্দময় শিশু-বিদ্যালয়-গুলির তুলনা করিয়া লিখিলেন "The manual exercise, the march, the cheerful song, the gymnastic play, under a superintendence too cheerful to be felt as oppressive ; these are sources of health and vigour with which the confinement of the dame school, the exigencies of the mother's home or the vagabondage of the street have nothing to compete."

অদ্ভুত মানুষ ছিলেন এই রবার্ট ওয়েন্। Leslie Stephen তাঁহার

সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন "one of the bores who are the salt of the earth।" ওয়েন্ দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াছিলেন। মধ্য ওয়েলস্‌-এর নিউ টাউন-এ তাঁহার বাড়ী হইতে নয় বৎসর বয়সে কাজের খোঁজে বাহির হইয়া পড়েন। দুর্বল লাজুক ও গম্ভীর এই ছেলেটি ঘুরিতে ঘুরিতে স্কটল্যাণ্ডের নিউ লানার্ক মিল-এ সামান্য মজুর হিসাবে কাজে লাগিলেন। ধীরে ধীরে নিজ গুণ ও অধ্যবসায়ের জোরে তিনি মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে সেই বৃহৎ কাপড়ের কলের ম্যানেজিং পার্টনারের পদে উন্নীত হন। তাঁহার বাল্য-জীবনের দুঃখ তিনি ভোলেন নাই, তাই যেদিন ক্ষমতা তাঁহার হস্তগত হইল, সেদিন তিনি তাঁহার মিল-এর শ্রমিকদের জন্য এমন একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন যাহা ভবিষ্যতে ইংল্যাণ্ডে ম্যাকমিলান্ ভগ্নীদ্বয় প্রবর্তিত Nursery Movement-এর সূত্রপাত করিয়াছিল। এই শিশুদরদী মহাপ্রাণ মানুষটিকে ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক সমাজ চিরদিন ভক্তি অর্ঘ্যদানে পূজা করিবে।*

* W. O. Lester Smith—*Education in Great Britain.*

রেনেশাঁর যুগে ইউরোপে জেস্যুইটদের বিদ্যালয়

যখনই কোন ধর্ম তার প্রাণবস্ত আদর্শ হারাইয়া, কতকগুলি অন্ধ আচার ও বিধিনিষেধের শৃংখলে নিজেকে আবদ্ধ করে, তখনই তাহার দুর্দিন দেখা দেয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ব্যাপার বারে বারে ঘটিয়াছে। ইয়োরোপেও মধ্যযুগের প্রায় অবসানে খৃষ্টীয় ধর্মের এ দুর্দিন আসিয়াছিল। শাস্ত্রগ্রন্থের অমোঘতা এবং যাজক সম্প্রদায়ের অনুশাসনের প্রতি বাধ্যতার প্রচণ্ড দাবী ইয়োরোপের খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসী মানুষের মনকে তেমন করিয়া যেন আর উদ্বুদ্ধ করিতে পারিতেছিল না।

অন্ধ বিশ্বাসের নাগপাশে ইয়োরোপের চিন্তা ও সমাজজীবন যেন অবশ হইয়া আসিতেছিল। ধর্মের ও ধর্ম-যাজকদের অনুশাসনের বিরুদ্ধে বুদ্ধিমান্ মানুষের মনে বিদ্রোহের বাষ্প পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। এমন সময় বাহির হইতেও আসিল প্রচণ্ড আঘাত। স্বাধীন ও দুর্বার যাযাবর জাতিদের আক্রমণে পোপ অধিষ্ঠিত প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এই সংঘাতকে H. G. Wells বলিয়াছেন Community of obedience (বশ্যতা ও অন্ধবিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে সমাজ ব্যবস্থা) এর সঙ্গে community of will (স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মের ভিত্তিতে গঠিত যে সমাজব্যবস্থা)-এর লড়াই। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী Constantinople Ottoman Turks-দের হস্তগত হইল। প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিল, পাশ্চাত্ত্য খৃষ্টধর্ম প্রাচ্যের ইসলামের কাছে নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

সেদিন যদি কোন ঐতিহাসিককে প্রশ্ন করা হইত ইয়োরোপের অথবা খৃষ্টধর্মের কি পরিণতি ঘটিবে তাহা হইলে হয়ত তিনি এ উত্তরই দিতেন যে, অচিরেই সমস্ত ইয়োরোপ হইতে খৃষ্টধর্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং সমস্ত পৃথিবী ইসলামের পদানত হইবে।

বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তাহা ঘটে নাই। বরং বিপরীতই ঘটিয়াছে। খৃষ্টীয় ইয়োরোপের মধ্যে কি এক দুর্জয় শক্তি সুপ্ত ছিল, তাহা এই

বাহির ও ভিতরের আঘাত ও আলোড়নের ফলে জাগ্রত হইল। আগামী দুই শতাব্দীর মধ্যেই ইতিহাসের ধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল, ইয়োরোপে খৃষ্টীয় সভ্যতা নিজেকে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। ইসলামের আধিপত্য অচিরেই সঙ্কুচিত হইল। খৃষ্টীয় ইউরোপের প্রাণশক্তি আত্মসংস্কার দ্বারা, জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা এবং অসমসাহসিক সামুদ্রিক অভিযানের দ্বারা এমনই শক্তি আহরণের তপস্যায় রত হইল যে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল যে আগামী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তাহারাই সসাগরা পৃথিবীর উপর আধিপত্য করিবে। সেই বিচিত্র ইতিহাস আমরা আলোচনা করিব না। এখানে কেবলমাত্র প্রাচীন খৃষ্টধর্মের আত্মসংস্কারের চেষ্টার একটি দিক সম্বন্ধে সামান্য একটু আলোচনা করিব। এই চেষ্টা নিজধর্মে গভীর বিশ্বাসী ও উৎসর্গীকৃত-প্রাণ একটি ধর্মসম্প্রদায়ের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিফলিত হইয়াছিল। সে সম্বন্ধেই সামান্য একটু আলোচনা করিব।

এই সম্প্রদায়ের ধর্মমত আমরা গ্রহণ না করিতে পারি, তাঁহারা যে শিক্ষা ব্যবস্থাপ্রচলন করিয়াছিলেন তাহারও কোন কোন ক্ষেত্রে সমালোচনা সম্ভব কিন্তু তাহাদের গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিক সেবাবুদ্ধিপ্রসূত শিক্ষা প্রচেষ্টা, যাহা সমস্ত ইয়োরোপে তাহার স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারি না।

যে Catholic ধর্মসম্প্রদায়ের কথা বলিয়াছি তাঁহারা সাধারণতঃ Jesuits নামে পরিচিত। এ নাম প্রশংসাসূচক ছিল না। তাঁহারা নিজেদের পরিচয় দিতেন যীশুর সেবক (Society of Jesus) নামে। তাহাদের সমস্ত উদ্যম ও কর্মপ্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহাদের ধর্ম, Church বা ঈশ্বরের গৌরববৃদ্ধি যাহা তাঁহারা A. M. D. G. এই কয়টি অক্ষরের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতেন এই অক্ষরকয়টির অর্থ হইতেছে 'Ad Majorem Dei Glorium—to the greater glory of God'। প্রথমতঃ তাহারা শিক্ষাদানের মধ্য দিয়াই ধর্ম প্রচারের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তী কালে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে থাকেন। ইহার ফলে Protestant-দের সঙ্গে তাঁহাদের বিরোধ ঘটিতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁহাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ফলে

Portugal, Spain ও France হইতেও তাঁহারা বিতাড়িত হন এবং Pope-এরও তাঁহারা বিরাগভাজন হন। Russia ও China পর্যন্তও এই সম্প্রদায় বিদ্যাদান ও প্রচারকার্য বিস্তৃত করেন। ভারতবর্ষেও তাহারা কয়েকটি বিদ্যালয় ও মঠ স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইংল্যাণ্ডে এবং ইয়োরোপের বহু দেশে এখনও বহু বিদ্যালয় তাহারা চালাইতেছেন—যদিও যোড়শ শতাব্দীতে তাঁহারা শিক্ষাব্রতী হিসাবে সমগ্র ইয়োরোপে যে যশ অর্জন করিয়াছিলেন তাহা বহুলাংশে ম্লান হইয়া গিয়াছে। অনেক সময় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিরূপতার জন্য তাহাদের আদর্শ ও পদ্ধতির বিকৃত ব্যাখ্যা ও কঠোর সমালোচনা করা হইয়া থাকে তথাপি এই সম্প্রদায়ের প্রাচীন শিক্ষকদের জ্বলন্ত বিশ্বাস, আত্মত্যাগ ও বিদ্যাবিতরণে প্রগাঢ় নিষ্ঠা উচ্চতম প্রশংসার যোগ্য। তাঁহারা ইউরোপের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। তাঁহাদের কাছে আজও আমাদের কিছু শিখিবার আছে। সেইজন্যই তাঁহাদের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা Ignatius Loyola-র জীবন কাহিনীও বিচিত্র। Spain দেশের Basaue প্রদেশের এক দুর্গে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার প্রথম যৌবন প্রসিদ্ধ সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞী Ferdinand ও Isabella-র বিলাসব্যাসনপূর্ণ রাজসভায় অতিবাহিত হয়। অতঃপর তিনি সৈনিকের কার্য গ্রহণ করেন। কিন্তু এক যুদ্ধে কামানের গোলায় তাঁহার একটি পা উড়িয়া যায়। চিকিৎসাধীন থাকা কালে তিনি কিছু ধর্মপুস্তক পাঠ করেন এবং তাঁহার জীবনে একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটে।—তিনি একদিন স্বপ্ন দেখেন যীশুমাতা মেরী শিশু যীশুকে ক্রোড়ে নিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। মুহূর্তে তাঁহার পার্থিব সমস্ত লালসা দূর হইয়া গেল এবং অতীতের কদর্য জীবনের উপর প্রবল বিতৃষ্ণা জন্মিল। তিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া বিশুদ্ধ জীবন যাপন করিতে লাগিলেন এবং তীর্থস্থানসমূহ পর্যটন করিলেন। বিদ্যা বিতরণের মধ্য দিয়া একটি বিশুদ্ধ সেবক সম্প্রদায় গঠনের স্বপ্ন তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। কিন্তু তিনি ক্রমেই বুঝিলেন যে এ কার্যের জন্য যে জ্ঞানার্জন অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহা তিনি আয়ত্ত করেন

নাই। সুতরাং তিনি জ্ঞানার্জনের সাধনায় মগ্ন হইলেন। Salamanca, Paris এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী হিসাবে তিনি কয়েক বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া বিদ্যালাভ করিলেন। ১৫৩৮ সালে তিনি যাজকসম্প্রদায়ের বাঞ্ছিত উপাধি লাভ করিলেন। পরবর্তী বৎসর, ৪৭ বৎসর বয়সে, তিনি Society of Jesus নামে ক্ষুদ্র একটি ধর্মসম্প্রদায় স্থাপন করিলেন। ১৫৪০ সালে Pope Paul তাঁহাকে বিদ্যাকেন্দ্র পরিচালনা করিবার অনুমতি দিলেন। সে অনুমতিতে লিখিত ছিল, বিদ্যাকেন্দ্রের উদ্দেশ্য হইবে, "especially for the purpose of instructing boys and ignorant persons in the Christian religion." একটি সুসংবদ্ধ সামরিক বাহিনীর অনুকরণেই তাঁহারা তাঁহাদের Society গড়িয়া তোলেন। ইহার মূলমন্ত্র ছিল বাধ্যতা, নিয়মনিষ্ঠা, পরিশ্রম ও শুচিতা। তাঁহাদের সংস্থার প্রত্যেকটি শিক্ষক ও ছাত্র আপনাকে Catholic ধর্মের প্রকৃত সেবক ও সৈনিক বলিয়া মনে করিতেন এবং তাহাতে গর্ববোধ করিতেন। Society-র প্রথম প্রধান হন Loyola এবং তাঁহার পদবী ছিল General। পরবর্তীকালে তাঁহার স্থলাভিসিক্ত যাঁহারা হইয়াছেন তাঁহারাও ছিলেন সংঘনেতা বা General। তাঁহার অধীনে প্রত্যেক প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানের নেতাদের বলা হইত Provincial General। ইনি General-এর দ্বারা নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার অধীনে ছিলেন প্রত্যেক বৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (College) Rector। তিনিও General দ্বারা নিযুক্ত হইতেন। Rector-এর অধীনে ছিলেন প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের প্রধান বা Prefect of studies। তাঁহার অধীনে সাধারণ শিক্ষকমণ্ডলী। উর্ধ্বতন প্রধানের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা ও বশ্যতা ইহাদের সংস্থাকে দৃঢ়তা ও একতা দান করিয়াছিল। তাঁহাদের এ প্রকারের সংগঠন তৎকালে Catholic ধর্মসম্প্রদায়কে বিপুল শক্তি দান করিয়াছিল এবং বিরোধী ধর্মসম্প্রদায় সমূহ ইহাদের এই সুদূরপ্রসারী সংস্থাকে বিস্ময় ও ভয়ের দৃষ্টিতে দেখিতেন। Loyola-র মৃত্যুর পূর্বেই তিনি নানা দেশে প্রায় এক শতটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে এই সংখ্যা বাড়িয়া সাত শতের উপর দাঁড়াইয়াছিল।

তাঁহাদের পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে Latin ও Greek ভাষার চর্চা

প্রধান স্থান অধিকার করিত। ইহা রেনেশাঁ যুগেরই বিশেষত্ব। বাস্তবিক পক্ষে Renaissance কথার অর্থ পুনরুজ্জীবন—প্রাচীন ভাষা ও সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয়। ইয়োরোপে রেনেশাঁ বলিতে, বিশেষ করিয়া প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনই বুঝায়। Turks-রা Constantinople অধিকার করিলে সেখানের প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক ও অনুরাগীরা প্রাচীন গ্রীক্ ও ল্যাটিন্ গ্রন্থকারদের অমূল্যগ্রন্থসমূহ সঙ্গে লইয়া ইয়োরোপের নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। এই প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঞ্জীবনী স্পর্শে ইয়োরোপের নিরানন্দ ও আবদ্ধ চিন্তাজগতে একটা নূতন প্রাণের সঞ্চার হইল। ইয়োরোপের শিক্ষিত লোকের মন তাঁহাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে নূতন রস আস্বাদন করিল। এই সময়েই জার্মাণীর Linz সহরের অধিবাসী John Gutenberg পৃথক পৃথক খোদাই অক্ষরের সাহায্যে মুদ্রণশিল্পের প্রবর্তন করেন (১৪৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি)। ঐতিহাসিক Hallam-এর মতে মানব সভ্যতার ইতিহাসে ইহা সর্বাপেক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ ও ল্যাটিন্ ও গ্রীক্ কাব্যগ্রন্থ সমূহ মুদ্রিত হইয়া বিদ্যানুরাগী জনসাধারণের মধ্যে গ্রীক্ ল্যাটিন্ গ্রন্থাদি বহুল প্রচারিত হইল। Bible ইত্যাদি শাস্ত্রগ্রন্থ মুদ্রিত হওয়ার ফলে ধর্মসংস্কার আন্দোলন কিছুদিন পরেই Martin Luther-এর নেতৃত্বে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং Protestant ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। যাহা হউক তাহা আমাদের আলোচনার বিষয় নহে। Jesuit বিদ্যালয়গুলিতে ব্যাকরণের সাহায্যে ল্যাটিন্ ও গ্রীক্ ভাষা শিক্ষার উপর খুব জোর দেওয়া হইত। সেকালে ল্যাটিন্ ও গ্রীক্ কাব্যে ব্যুৎপত্তিই বৈদগ্ধ্যের লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইত। এই ভাষা দুটি শিক্ষার উপর এতটা জোর দেওয়া হইত যে উচ্চ শ্রেণীতে এই দুই ভাষাতেই শুধু শিক্ষাদান করা হইত এবং বিদ্যার্থীদেরও নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা ল্যাটিন্ ভাষাতেই করিতে হইত।

জেস্যুইট্ বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাব্যবস্থা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল। শিক্ষকের এ বিষয়ে স্বাধীনতা খুবই কম ছিল। উপর্যুপরি কয়েকটি School Commission শিক্ষার বিষয়তালিকা ও শিক্ষণপদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া দেন এবং ১৫৯৯ সালে যখন সংঘনেতা ছিলেন Aquaviva, তখন চূড়ান্তভাবে

সেগুলি সমস্ত জেস্যুইট্ বিদ্যালয়ের অবশ্য পালনীয় বলিয়া গৃহীত হয়। ১৮৩২ সন পর্যন্ত এই পাঠ্য তালিকা ও পন্থা অপরিবর্তিত ভাবে চলিতে থাকে এবং তখন আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য পাঠ্য তালিকায় আধুনিক ভাষা এবং বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় যোগ করা হয়।

প্রত্যেক শিক্ষক এক একটি ছোট শ্রেণীর ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্ব ছিল, তাঁহার অধীন প্রত্যেকটি ছাত্রকে নিজ হাতে গড়িয়া তুলিবার। তিনি প্রত্যেক ছাত্রকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিতেন, তাঁহার ছাত্রদের সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতেন, প্রত্যেককেই নিজ ধর্মের নির্দিষ্ট আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতেন। প্রত্যেকের শক্তি অনুযায়ী তাহার পাঠের ব্যবস্থা করিতেন। শিক্ষক ছিলেন ধর্ম ও সংঘের সেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন, তাঁহার নিজ ধর্ম-আচরণ ও পাঠও তাঁহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইত সংঘের প্রয়োজনে। এক এক বৎসর পর যখন তাঁহার অধীন ছাত্ররা পরীক্ষা দিয়া উপরের শ্রেণীতে উঠিত, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকও উপরের শ্রেণীর শিক্ষার ভার পাইতেন। অর্থাৎ এক এক দল ছাত্রের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের ভার সম্পূর্ণভাবে এক এক জন শিক্ষকের উপর ন্যস্ত ছিল। সহজেই বুঝা যায় এ ব্যবস্থায় শিক্ষকের সাথে ছাত্রদের একটি নিবিড় স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ গঠিত হইত।

জেস্যুইট্ বিদ্যালয়গুলি সম্পূর্ণভাবে ধর্মপ্রাণ জনসাধারণের দানের উপর নির্ভর করিত। এবং তাঁহাদের শিক্ষাদানও ছিল অবৈতনিক। প্রত্যেকটি বিদ্যালয় স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন হইত তাহার বেশী অর্থ তাঁহারা গ্রহণ করিতেন না। এ বিদ্যালয় পরিচালনার পশ্চাতে কোন লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকিত না। তাহাদের নীতি ছিল "Gratis receive, gratis give"—সমাজ সেবার্থ বিনা লাভের আশায় অর্থ গ্রহণ, এবং প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষাশূণ্য হইয়া সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে বিদ্যাবিতরণ। ইহা ইতিহাসের সাক্ষ্য যে জেস্যুইট্ বিদ্যালয়গুলি কখনও অর্থাভাবে বন্ধ হইয়া যায় নাই। এই শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করিবার প্রয়োজন আছে। অনেক সময় আমরা বলি, অর্থের অভাবেই অনেক সৎকাজ হয় না। ইহা সত্য নয়। যে সাধু প্রতিষ্ঠান একনিষ্ঠ হইয়া সমাজের সেবায় রত থাকে—সমাজই তাহাকে

পালন এবং পোষণ করে। যে প্রতিষ্ঠান সমাজের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার ধ্বংশ নাই।

জেস্যুইট্ বিদ্যালয়ের আর একটি প্রশংসনীয় নীতি ছিল সমস্ত ছাত্রকে সমান ভাবে গ্রহণ করা। তাঁহারা এ বিষয়ে ধনী দরিদ্রে কোন প্রভেদ করিতেন না—বর্ণে বর্ণে প্রভেদ করিতেন না। ঈশ্বরের চোখে ধনী ও নির্ধনের ভেদ নাই, সকলেই ঈশ্বরের সন্তান এ কথা তাঁহারা সত্যই বিশ্বাস করিতেন। এবং এই সত্যবিশ্বাস শিক্ষক ও পরিচালকদের ব্যবহারে ও আচরণে প্রতিফলিত হইত। জেস্যুইট্ শিক্ষকদের উপদেষ্টা Sacchini বলিয়াছেন, "Do not let any favouring of the higher classes interfere with the care of meaner pupils, since the birth of all is equal in Adam, and the inheritance in Christ." এই মানবীয় উচ্চ আদর্শ আজও আমাদের দেশে গৃহীত হয় নাই।

জেস্যুইট্ বিদ্যালয়ের দুই শ্রেণীর ছাত্র ছিল—একদল, যাহারা বিশেষ ভাবেই ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত, যাহারা ভবিষ্যতে ধর্মযাজক বা ধর্মপ্রচারক হইবে, আর দ্বিতীয় আর একদল, যাহারা ভবিষ্যতে গৃহধর্ম পালন করিবে। প্রথম দল বিদ্যালয় ভবনের অন্তর্গত ছাত্রাবাসে মঠাধ্যক্ষের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে বাস করিত। আর দ্বিতীয় দল বিদ্যালয়ের বাহিরে কোন অনুমোদিত ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়কের অধীনে বাস করিত। অবশ্য এই গৃহী ছাত্রদের উপরও Prefect ও শিক্ষকেরা প্রখর সযত্ন দৃষ্টি রাখিতেন এবং তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধ জেস্যুইট্ বিদ্যালয়ের সাফল্যের ও জনপ্রিয়তার একটি প্রধান কারণ। এই সত্যটি আমাদের স্মরণ করার প্রয়োজন আছে। কোন শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্যের জন্য উৎকৃষ্ট শিক্ষাপদ্ধতির যথেষ্ট মূল্য আছে, কিন্তু তাহার চেয়েও বেশী মূল্য আছে জাগ্রত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হৃদয়বান শিক্ষকের। ভারতের প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতিতেও এই সত্যটি উজ্জ্বল হইয়া আছে।

শিক্ষাকেন্দ্র দুই রকমের ছিল—Superior ও Inferior—বর্তমানের ভাষায় বলিব School ও College। স্কুলে সাধারণতঃ পাঁচটি শ্রেণী থাকিত। পরবর্তী কালে School-এর শ্রেণীর সংখ্যা বাড়াইয়া আট করা

হইয়াছিল। সর্বনিম্নশ্রেণীরও আবার দুটি ভাগ ছিল। প্রত্যেক শ্রেণীতে পাঠের সময় ছিল এক বৎসর। কিন্তু Rhetorica বা ছন্দের শ্রেণীতে পাঠের সময় ছিল দীর্ঘতর,—দুই বৎসর। একেবারে শিশু বা কিশোরদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। সর্বনিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদেরও ভাষাজ্ঞান হইবার পর ভর্তি করা হইত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে শিক্ষার বিষয়গুলির মধ্যে ল্যাটিন্ ও গ্রীক্-ই ছিল প্রধান। ব্যাকরণ, কাব্য, ইতিহাসও পঠন-পাঠন হইত—কিন্তু সবই ল্যাটিন্ ভাষার মাধ্যমে। মাতৃভাষা শিক্ষাদান প্রভিন্সিয়াল্ জেনারাল্-এর অনুমতিসাপেক্ষ ছিল। রবিবার ভিন্ন অন্য কোন দিনই উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররা ল্যাটিন্ ভিন্ন অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করিতে পারিত না। ইহা যেন আমাদের হিন্দীভাষার জবরদস্তির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

লেখার উপর খুব জোর দেওয়া হইত। ছাত্রদের শিক্ষকদের বক্তৃতার notes নিতে হইত। শিক্ষকেরা এই notes দেখিয়া দিতেন, সংশোধন করিয়া দিতেন। প্রত্যেক দিনই ব্যাকরণ বা অনুবাদের কিছু কাজ ছাত্রদের বাড়ী হইতে করিয়া আনিতে হইত। শনিবার দিন কেবল লেখার কাজ থাকিত না। লেখার উপর জোর দেওয়ার এ ব্যবস্থা ছাত্রদের সুশিক্ষার পক্ষে খুব প্রয়োজন।

শিক্ষক কখনও প্রস্তুত না হইয়া পড়াইতে যাইতেন না। পড়া একসঙ্গে বেশী দেওয়া হইত না। প্রসিদ্ধ লেখকদের লেখা হইতে চার ছত্রই একদিনের পড়ার জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হইত। কিন্তু শিক্ষক যতটুকু পড়াইতেন তাহার মধ্যে ফাঁকি থাকিত না। প্রথম তিনি সব কয়টি ছত্রের মোটামুটি অর্থ বুঝাইয়া দিতেন। তার পর, প্রত্যেক ছত্রের অংশ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া, প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি, ধাতু, সন্ধি, সমাস, প্রত্যয় ইত্যাদি ব্যাকরণের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় এবং ছন্দ ও অলংকারের সব খুঁটিনাটি পুংখানুপুংখ আলোচনা করিতেন। ব্যাকরণের ঘণ্টায় একটি মাত্র সূত্রই একদিনে আলোচনা করিতেন। প্রত্যেক আলোচনাই অন্ততঃ দুইবার পুনরাবৃত্তি করা হইত। ছাত্রদের সমস্ত পড়াই কণ্ঠস্থ করিতে হইত। অর্থাৎ এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা mental drilling-কে বিদ্যা আয়ত্তীকরণের প্রধান উপায় বলিয়া মনে করিতেন।

আমাদের দেশের পাঠশালায় যেমন প্রত্যেক শ্রেণীতে একজন—"সর্দার পোড়ো" ছিল তেমনি জেস্যুইট্ বিদ্যালয়েও প্রত্যেক শ্রেণীতে একজন ডেক্যুরিয়ন্ (Decurion) থাকিত। যে পাঠ আগের দিন মুখস্থ করিয়া আসিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে, শিক্ষক প্রথম ডেক্যুরিয়ন্-কে তাহা বলিতে বলিতেন। ডেক্যুরিয়ন্-এর পড়া লওয়া হইলে, শিক্ষক ছাত্রদের লেখার কাজ দেখিতে রত হইতেন। সেই সময় ডেক্যুরিয়ন্-এর সমক্ষে অন্য সব ছাত্রেরা উচ্চৈঃস্বরে মুখস্থ বলিত। ইহাতে শিক্ষকের পরিশ্রম বাঁচিত এবং তিনি ছাত্রদের লেখা কাজ ও class-এর notes দেখিয়া দেওয়ার সময় পাইতেন।

ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতার স্পৃহা বৃদ্ধির জন্য নানা ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক ছাত্রের একজন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইত। তাহাকে বলিত 'Aemuli'। Aemuli-র কাজ ছিল তাহার জুটির ভাষা, ব্যাকরণ ও অন্য কোন লেখাপড়ার বিষয়ে কোন ভ্রম বা ত্রুটি দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা দেখাইয়া দেওয়া বা সংশোধন করা। আবার প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রদেরও আবার দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলে ভাগ করা হইত। তাহারা শিক্ষকদের নির্দিষ্ট বিষয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হইত। ইহাকে বলা হইত "Concertation"—এটিও একটি সুন্দর ও উৎসাহবর্ধক শিক্ষাপদ্ধতি। উচ্চ শ্রেণীতে আবার ছাত্রদের ছোট ছোট আলোচনা সভার আয়োজন করিতে উৎসাহ দেওয়া হইত। সেখানে প্রাচীন লেখকদের কাব্য, অনুবাদ, ব্যাকরণের বা অলংকার শাস্ত্রের বিতর্কমূলক বিষয় ইত্যাদি নিয়া আলোচনা চলিত এবং এ সব সভায় (Academies) শিক্ষক সর্বদা উপস্থিত থাকিয়া শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে ছাত্রদের সহায়তা করিতেন। ছাত্রদের মধ্যে আত্মোন্নতির স্বাভাবিক স্পৃহা যাহাতে সর্বদা জাগ্রত থাকে, সে জন্য কৃতী ছাত্রদের প্রশংসা করা হইত—বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মানের প্রতীক (badges) দান করা হইত। সঙ্গে সঙ্গে যাহারা অন্যায় করিয়াছে বা লেখাপড়ায় অবহেলা দেখাইয়াছে, বা কাজ মনযোগ দিয়া করে নাই তাহাদের নামের তালিকাও প্রতি সপ্তাহে টাঙাইয়া দেওয়া হইত। এই অসম্মান এড়াইবার জন্য ছাত্রেরা যথাসাধ্য পরিশ্রম করিত। যাহারা বরাবর ভাল করিত তাহারাই শ্রেণীর Decurion নিযুক্ত হইত। এই সম্মান লাভের জন্যও ছাত্ররা উদ্বুদ্ধ হইত। যে অনেকবার শাস্তির পরও

শোধরাইত না তাহাকে শ্রেণী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নামাইয়া দেওয়া হইত, এবং যে পর্যন্ত না সে শ্রেণীর অন্ততঃ একটি ছাত্র হইতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিতে পারিত, সে পর্যন্ত তাহাকে ক্লাশে তোলা হইত না। সর্বনিকৃষ্ট ছাত্রটি তাহার অসম্মানজনক স্থান গ্রহণ করিত। এ পদ্ধতির মধ্যে সমালোচনারযোগ্য কোন কোন দিক থাকিলেও, ইহা ফলপ্রসূ ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই।

বিদ্যালয়ে পড়াশুনার সময় খুব দীর্ঘ ছিল না। সকালে দুই হইতে আড়াই ঘণ্টা এবং বৈকালে আড়াই ঘণ্টা বিদ্যালয়ে পঠন পাঠন চলিত।

নিম্নশ্রেণীর প্রতিদিনের কর্মতালিকা (Routine) দেওয়া হইল

সকাল

প্রথমে আধঘণ্টা শিক্ষক ডেক্যুরিয়ন্-এর পড়া নিতেন। তাহার পর তিনি ছেলেদের বাসার কাজ বা ক্লাশের note, যাহা ছেলেরা নিয়া আসিয়াছে, সেগুলি সংশোধন করিতেন। ততক্ষণ অন্য ছেলেরা নামতা ইত্যাদি উচ্চৈঃস্বরে মুখস্থ বলিত। ডেক্যুরিয়ন্ তাহা শুনিত।

দ্বিতীয় আধঘণ্টা—আগের দিন যে ল্যাটিন্ পাঠ দেওয়া হইয়াছে ছাত্রেরা একজন একজন করিয়া তাহা পড়িত। শিক্ষক উচ্চারণ ও পঠনভঙ্গীর প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে আজকাল এ বিষয়ে প্রায় কোন মনোযোগই দেওয়া হয় না, কিন্তু ইহা একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা। ইহার অভাবে আমাদের ছাত্রদের অধিকাংশের উচ্চারণ অশুদ্ধ ও বাচনভঙ্গী বিকৃত।

তৃতীয় আধঘণ্টা—পঠিত অংশের বাক্যগুলির অর্থ, অন্বয়, প্রত্যেকটি শব্দের ধাতুগত ব্যুৎপত্তি, শব্দরূপ, সমাস ইত্যাদি ব্যাকরণ সম্বন্ধে শিক্ষক বিশদ আলোচনা করিতেন।

চতুর্থ আধঘণ্টা—পরদিনের নূতন পাঠ শিক্ষক নিজে পড়িয়া দিতেন, এবং সমগ্র অংশটুকুর অর্থ বলিয়া দিতেন।

পঞ্চম আধঘণ্টা—পুনঃ পুনঃ আলোচনার দ্বারা শিক্ষক একটি ব্যাকরণের সূত্র অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ব্যাখ্যা করিতেন। যে পর্যন্ত সূত্রটি ছাত্রদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হয়, সে পর্যন্ত নূতন সূত্র ধরা হইত না।

শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষণ সম্বন্ধে উপদেশ—Ratio Study (the rules of study or teaching) এর মধ্যে এই উপদেশ আছে, "Take a single rule, and drive it in, several days."

বৈকাল

প্রথম ঘণ্টা—শিক্ষক ঘরের কাজ সংশোধন করিতেন—ছাত্রেরা ততক্ষণ ব্যাকরণের নিয়ম পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিত। সময় থাকিলে শিক্ষক ব্যাকরণ সম্বন্ধে ছাত্রদের প্রশ্ন করিতেন।

দ্বিতীয় ঘণ্টা—ব্যাকরণ সূত্র সম্পর্কে আরো ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত শিক্ষক দিতেন। শেষ আধঘণ্টা—'Concertation' বিতর্ক বা আলোচনা সভা।

কি ভাবে পড়াইতে হইবে তাহা নির্দিষ্ট ছিল। শিক্ষকদের এ বিধি মানিতেই হইত। এ বিষয়ে তাঁহাদের স্বাধীনতা ছিল না। শিক্ষকেরা কি ভাবে পড়াইবেন সে সম্বন্ধে Jouvency বলিতেছেন ল্যাটিন সাহিত্য পড়াইতে হইলে ছয়টি ভাগে ভাগ করিয়া নিতে হইবে (১) প্রথম, শিক্ষক যে কয়টি ছত্র পড়াইবেন, তাহার অর্থ বলিবেন। (২) বাক্যের প্রত্যেক খণ্ডাংশের (clause) ব্যাখ্যা করিবেন, বাক্যটির অন্বয় করিবেন। (৩) এই পাঠ্য বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা প্রাচীন রীতিনীতি আলোচনা করিবেন। (৪) উপরের শ্রেণীতে, এই বাক্যের ব্যবহৃত অলংকার ও ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। (৫) ধর্মশাস্ত্রের সহিত এ পদের যোগ ব্যাখ্যা করিবেন (৬) এ পদে কি নীতিবাক্য বা moral নিহিত আছে তাহা আলোচনা করিবেন।

সহজেই বুঝা যায় এ শিক্ষাবিধিতে ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ সহজ ছিল না। কাজেই Jouvency বলিয়াছেন শিক্ষক মাঝে মাঝে পাঠনে বিরতি দিবেন, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন এবং নিজ ঐকান্তিকতা ও অভিজ্ঞতা হইতেই ছাত্রদের মনোযোগ কি ভাবে আকর্ষণ করা যায় সে কৌশল আয়ত্ত করিবেন।

বিদ্যালয়ে যখন পঠন পাঠন চলিত না তখন ছাত্রেরা নিজ নিজ রুচি মত বিভিন্ন বিষয় অনুশীলনের সুযোগ পাইত এবং এ বিষয়ে তাহাদের উৎসাহ দেওয়া হইত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে শিক্ষার ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে তাঁহারা বিশ্বাসী ছিলেন। প্রত্যেক পাঠ অন্ততঃ দুইবার করিয়া পুনরাবৃত্তি করা হইত। সপ্তাহে একটা দিন নির্দিষ্ট থাকিত, সপ্তাহের পুরাতন পাঠ পুনরাবৃত্তির জন্য। নীচের শ্রেণীতে প্রথম ছয় মাসে সম্পূর্ণ পাঠন শেষ করাইয়া পরের ছয়মাস আবার তাহার পুনরালোচনা করা হইত।

তাঁহারা বেশী বিষয়ে বেশী পড়া শিখাইতেন না, কিন্তু যেটুকু শিখাইতেন তাহা সম্পূর্ণভাবে শিখাইতেন। এই thoroughness জেস্যুইট শিক্ষার একটি প্রধান বিশেষত্ব। তাঁহারা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অল্পকয়টি বিষয় বা সূত্র শিক্ষার উপরই জোর দিতেন। শিক্ষকদের প্রতি উপদেশ ছিল "the master should prefer to teach a few things perfectly, to giving indistinct impressions of many things."

স্কুলগুলিতে শিক্ষার মেয়াদ ছিল ছয় বৎসর। প্রত্যেক শ্রেণীতে বৎসরান্তে পরীক্ষা হইত। সর্বোচ্চ শ্রেণীতে পাঠের মেয়াদ দুই বৎসর ছিল। পরীক্ষার ব্যাপারে খুব নিয়মনিষ্ঠা ছিল। পরীক্ষার পূর্বেই ছাত্রদের বিষয়বস্তুগুলি ভাল করিয়া শিখাইয়া দেওয়া হইত এবং পরীক্ষাবিধিও (অর্থাৎ কি ভাবে প্রশ্নোত্তর লিখিতে হইবে) তাহাদের শিখাইয়া দেওয়া হইত। পরীক্ষা দেওয়ার জন্য একটি Commission নিযুক্ত হইত। যে শিক্ষক যে শ্রেণীতে পড়ান—তিনি সে শ্রেণীর পরীক্ষক Commission-এর অন্তর্ভুক্ত থাকিতেন না। লিখিত পরীক্ষা ছাড়াও প্রত্যেক ছাত্রকে মৌখিক পরীক্ষা দিতে হইত। তিন জন পরীক্ষকের সামনে একসঙ্গে তিন জন করিয়া ছাত্রের পরীক্ষা হইত। যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত গুণানুসারে তাহাদের নাম প্রকাশিত হইত।

ছাত্রদের ধর্ম ও নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষকের সদাজাগ্রত দৃষ্টি থাকিত। Sacchini শিক্ষকদের বলিতেছেন "to remember how honourable his office is, as it has to do, not with grammar only, but also with the science and practice of a Christian and religious life." প্রত্যেক পাঠের আগে ছাত্র শিক্ষক সম্মিলিত ভাবে প্রার্থনা করিতেন অথবা নীরবে আঙ্গুল দ্বারা ক্রুশ চিহ্নের ইঙ্গিত করিতেন।

প্রতিদিন প্রাতে ছাত্রদের সম্মিলিত প্রার্থনায় (Mass) যোগ দিতে হইত। ধর্মানুষ্ঠানসমূহ, যেমন পাপ স্বীকার (Confessions) দীক্ষা গ্রহণ (Holy Communion) প্রত্যেক ছাত্রের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল।

কিন্তু ধর্মচর্চা তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য হইলেও দেহচর্চা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে তাঁহাদের অবহেলা ছিল না। এক সঙ্গে অনেকক্ষণ পঠন-পাঠন করান হইত না। দুপুরে বা রাত্রে খাওয়ার পর দুই ঘণ্টা পর্যন্ত পড়াশোনা নিষিদ্ধ ছিল। তখন ছাত্রদের বিশ্রাম করিতে হইত। ছুটি হইলে ছাত্রদের গ্রামে মুক্তবাতাসে বেড়াইতে নিয়া যাওয়া হইত। ছাত্রদের নিয়মিত ব্যায়াম ইত্যাদি করিতে হইত। রোগ হইলে শিক্ষক ও মঠাধ্যক্ষ চিকিৎসা করিতেন, সেবা করিতেন, আপন সন্তানের মত ছাত্রদের শুশ্রূষা করিতেন।

নিয়ম ও শৃংখলার উপর যথেষ্ট জোর দিলেও কঠোর শাস্তিদান করা হইত না। ছাত্রদের শিক্ষকেরা বাস্তবিক স্নেহ করিতেন এবং সযত্নে তাহাদের পাপ ও প্রলোভন হইতে রক্ষা করিতেন। লঘু অপরাধ ইত্যাদি শিক্ষকেরা অনেকটা উপেক্ষাই করিতেন। সহজে বা ঘন ঘন শাস্তি দেওয়া হইত না। শাস্তি অপেক্ষা শিক্ষকের নৈতিক প্রভাবের উপরই তাঁহারা বেশী নির্ভর করিতেন। তাঁহারা একথা জানিতেন যে ছাত্রদের চরিত্রগঠন শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাবের উপর নির্ভর করে। শাস্তি নিতান্ত অনিবার্য না হইলে, তাঁহারা দিতেন না। গুরু অপরাধে অবশ্যই গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। সংশোধনের অতীত হইলে, তখনই কেবলমাত্র চরম শাস্তি হিসাবে অপরাধী ছাত্রকে বিতাড়িত করা হইত।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে জেস্যুইট বিদ্যালয়গুলির সাফল্য তাঁহাদের বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ ছিল। শ্রদ্ধা, প্রীতি ও কঠোর শৃংখলার ভিত্তিতে স্থাপিত এই বিদ্যালয়গুলি এককালে প্রায় সমস্ত ইয়োরোপে বালকদের শিক্ষার ভার নিয়াছিল। Jesuit বিদ্যালয় হইতে বহু কৃতী ছাত্র পরবর্তীকালে যশস্বী হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে Francis Xaviers-এর নাম আমাদের কাছে সর্বাধিক পরিচিত। ভারতবর্ষ, চীন ও জাপানে তাঁহার চেষ্টায় বহু স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয়। কলিকাতার Saint Xaviers' College এই মহাপুরুষেরই পূণ্যস্মৃতি বহন করিতেছে। প্রাচ্যজগতে তাঁহার

অবিনশ্বর কীর্তির জন্য তাঁহাকে "Apostle of the Indies" আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল।

ইহাদের সাফল্য সত্ত্বেও ইহাদের শিক্ষানীতি অভ্রান্ত ছিল না। তাঁহাদের শিক্ষায় ছাত্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের দিকে দৃষ্টি ছিল না। তাঁহাদের শিক্ষার আদর্শ অনেকটা সংকীর্ণ ছিল--তাঁহারা ছাত্রদের গ্রহণ ও পূর্ণ প্রকাশ (reception and reproduction) ক্ষমতার বিকাশের প্রতিই লক্ষ্য রাখিতেন। তাহাদের সৃজনীশক্তির (creative power) বিকাশ, ও স্বাধীন ব্যক্তিত্বের উদ্বোধনে তাঁহারা উৎসাহ দিতেন না। বরং তাঁহাদের নির্দিষ্ট ধর্মমত ও চিন্তার বাহিরে যাহাতে ছাত্ররা না যায় সে দিকেই তাঁহাদের দৃষ্টি থাকিত। পরবর্তীকালে জেস্যুইট বিরোধী Montaigne তাঁহাদের শিক্ষার আদর্শের নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন, "We have not to train up a soul, nor yet a body, but a man; and we cannot divide him." অবশ্য এই মূল্যবান কথাটি জেস্যুইটরা একেবারে জানিতেন না তাহা সত্য নয়। Quick তাঁহাদের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা অধিকতর সত্য বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন, "Originality and independence of mind, love of truth for its own sake, the power of reflection, the power of forming correct judgments were not merely neglected, they were suppressed in the Jesuit system." ইহার সঙ্গে ইহাতে যোগ করা যাইতে পারে যে পর্যবেক্ষণও বৈজ্ঞানিক আরোহপদ্ধতি (induction) সম্বন্ধে তাঁহারা অজ্ঞ ছিলেন।

সামরিক শৃংখলা ও সংঘবদ্ধতার আদর্শ একদিকে তাহাদিগের শিক্ষাব্যবস্থাকে সফল ও শক্তিশালী করিয়াছে কিন্তু ইহার কুফল হইয়াছে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিলোপ ও চিন্তা ও কর্মে অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা। Carlyle-এর মত ইহারাও শক্তির আদর্শে বিশ্বাসী, কিন্তু Carlyle চাহিয়াছেন শক্তিমান ব্যক্তি, জেস্যুইটরা চাহিয়াছেন শক্তিমান Catholic Church.

পরবর্তী কালে এই আদর্শের বৈপরীত্যের জন্যই প্রোটেষ্ট্যান্টদের সাথে জেস্যুইটদের বহু সংঘর্ষ হইয়াছে। এবং বহু ক্ষেত্রে ইউরোপে প্রোটেষ্ট্যান্ট

ধর্মমতের প্লাবন হইতে ক্যাথলিক ধর্মকে রক্ষা করিয়াছে এই জেস্যুইটরাই। Mecaulay তাই বলিয়াছেন : "the history of the Jesuits is the history of the Catholic reaction." প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Myers বলিয়াছেন : It was largely through their direct or indirect agency that Hungary, Poland, Bohemia and South Germany after they had been invaded by Protestantism and in a greater or less degree drawn away from the old faith were won back to the Roman Catholic Church and again bound by ties stronger than ever to the Papacy."

Jesuit বিদ্যালয়গুলির সফলতার কয়েকটি মূল কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে (১) শিক্ষক ও পরিচালকগণ শিক্ষাকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের আন্তরিক নিষ্ঠা শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। (২) তাঁহাদের আদর্শ চরিত্র সহজেই ছাত্রদের মনে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করিত। (৩) প্রত্যেক ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের নিবিড় ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং তাঁহাদের প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতি থাকায় ছাত্রেরা পাঠ্য বিষয়ের নীরসতা সত্ত্বেও শিক্ষার ফল লাভ করিত। (৪) ছাত্রদের সানন্দ ও স্বেচ্ছাকৃত বাধ্যতা ও নিয়মনিষ্ঠা যাহাতে পাওয়া যায় সেজন্য শিক্ষক সর্বদা চেষ্টিত থাকিতেন, পীড়ন অপেক্ষা স্নেহদ্বারাই শিক্ষক ছাত্রকে বশীভূত করিতেন। Sacchini শিক্ষকদের উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন, "It is the unvarying decision of the wise men, whether in ancient or modern times, that the instruction of youth will always be best, when it is pleasantest. The tenderness of youth requires of us that we should not overstrain it, its innocence that we should abstain from harshness."

(৫) পুনঃ পুনঃ অভ্যাস ও অনুশীলন ও অল্প কয়েকটি প্রধান বিষয়ের উপর সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করায় যাহা শিক্ষা দেওয়া হইত তাহাতে কোন ফাঁকি থাকিত না।

জেস্যুইটদের শিক্ষারীতি আলোচনা করিয়া একথাটিই মনে হয় পৃথিবীর শিক্ষার ইতিহাসে ইহা বারে বারে দেখা যায় শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য যতটা নির্ভর করে নির্ভুল পদ্ধতির (method) উপর, তার চেয়েও অনেক বেশী নির্ভর করে শিক্ষকের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের উপরে—"the man is infinitely more important than the method." ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের কর্তব্য সম্বন্ধে Sacchini-র একটি বিশেষ সঙ্গতিপূর্ণ উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করি : "when pupils love the masters, they will soon love his teaching. Let him therefore, show an interest in everything that concerns them, and not merely in their studies. Let him rejoice with those that rejoice, and not disdain to weep with those that weep. Let him unite the grave kindness and authority of a father with a mother's tenderness."

নূতন শিক্ষানীতির ইঙ্গিত—কমেনিয়াস্ ১৫৯২-১৬৭১

ভগবান যাঁহাদের মহৎ কর্মের পথে আহ্বান করেন অনেক সময় তাঁহাদের দুঃখের আগুনে পোড়াইয়া পরীক্ষা করিয়া লন। জন্ এ্যমোস্ কমেন্স্কি বা কমেনিয়াসও এমনি একজন দুঃখতিলকচিহ্নিত সাধু মানব-প্রেমিক। তাঁহার সমস্ত জীবন দুঃখ সংগ্রাম ও বাধা বিপত্তির মধ্যে কাটিয়াছে কিন্তু তিনি বিশ্বাস হারান নাই, মানুষের প্রতি তিক্ত ও বিতৃষ্ণ হন নাই, সত্যের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি জাত শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মকে জীবনের ব্রত বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সমস্ত জীবন ভরিয়াই উন্নততর শিক্ষা-ব্যবস্থা আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সংস্কারমুক্ত মনস্বিতা দ্বারা তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে এমন কতগুলি মৌলিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন যাহাতে নূতন যুগের শিক্ষার মূলনীতির স্পষ্ট ইঙ্গিত বর্তমান। তাঁহার যুগের পক্ষে তাঁহার সাহসিক চিন্তাধারা বিস্ময়কর তো বটেই, আজিকার দিনেও তাহা শ্রদ্ধা ও বিবেচনার যোগ্য। পরবর্তী শতাব্দীতে ইয়োরোপের শিক্ষাক্ষেত্রে পেস্তালৎসীর যে সম্মানের আসন, সপ্তদশ শতাব্দীতে কমেনিয়াসও অনুরূপ সম্মানের অধিকারী। পরবর্তী শিক্ষাবিদ্দের উপর তাঁহার চিন্তার প্রভাব অসামান্য।

কমেনিয়াস্ জন্মগ্রহণ করেন ১৫৯২ সালে মোরাভিয়ার অন্তর্গত নিউনিক্ গ্রামে। তাঁহার পিতা শস্য পেষাই করিতেন। গভীর ধর্মভীরু প্রোটেষ্ট্যাণ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত মোরাভিয়ান্ ব্রিদ্রেন্ (Moravian Brethren) গোষ্ঠির একজন বিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন, তাঁহার পিতা। এই সম্প্রদায়ের প্রভাবের মধ্যেই তিনি লালিত পালিত হন এবং শেষ জীবনে এই সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মযাজকের পদে তিনি বৃত হইয়াছিলেন। মধ্য ও উত্তর ইয়োরোপে তখন প্রাচীন ক্যাথলিক্ ও নূতন প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্মের মধ্যে বিষম কলহ ও বিদ্বেষ চলিতেছিল। এবং এই ধর্মসংঘর্ষের ফলে বহু দুঃখ ও লাঞ্ছনা মোরাভিয়ান ব্রিদ্রেন্দের সঙ্গে কমেনিয়াস্-কেও সহ্য করিতে হইয়াছে।

তাঁহার পিতা মাতা খুব অল্প বয়সেই মারা যান। আত্মীয়রা তাঁহাকে আশ্রয় দেন। কিন্তু তাঁহার লেখাপড়ার কোন ব্যবস্থা হয় না। ষোল বৎসর বয়সে তিনি দৈবাৎ ল্যাটিন ভাষা শিখিবার সুযোগ পান। ইহাতে তিনি এমনই রস পান, যে পরম উৎসাহের সঙ্গে এ ভাষার চর্চায় লাগিয়া যান। পরবর্তীকালে তিনি লিখিয়াছিলেন, "ভগদনুগ্রহে এ ভাষার স্বাদ এমনি তীব্র পিপাসা জাগ্রত করিল যে বাল্যে যে সময় নষ্ট হইয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণের জন্য আমি সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। শুধু নিজের জন্য নয়, অপরের ভালোর জন্যও বটে। যাঁহারা এ স্বাদ হইতে বঞ্চিত তাঁহাদের জন্য আমি দুঃখ বোধ করিতে লাগিলাম, —বিশেষ করিয়া আমার জাতির মানুষদের জন্য, কারণ শিক্ষার বিষয়ে আমার জাতির মানুষেরা বড় অলস ও অসাবধান। তখন হইতেই আমি সতত এই চিন্তা করিতাম, কি করিয়া শিক্ষার আগ্রহ আরও অনেকের মধ্যে জাগ্রত করা যায় এবং কি করিয়াই বা শিক্ষা সহজতর, সুলভতর এবং অল্প আয়াসসাধ্য করা যায়। শিক্ষায় প্রশংসনীয় পারদর্শিতা লাভের সহজ উপায় আবিষ্কার আমার উদ্দেশ্য ছিল।" ইহা হইতেই তাঁহার মানসিক গঠন ও ভবিষ্যৎ কর্ম-পদ্ধতির ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে।[১]

তিনি জার্মানীর বহু সহরে ঘুরিয়া যথেষ্ট অধ্যবসায় সহকারে নানা বিদ্যা আয়ত্ত করেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই তৎকালীন প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ র‍্যাট্‌কে বা র‍্যাটেশিয়াস্-এর শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ১৬১৬ সালে অর্থাৎ মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে ব্যাকরণ শিক্ষাদানের সহজপদ্ধতি সম্পর্কে একখানা ছোট বই প্রাগ সহর হইতে প্রকাশ করেন। প্রায় সেই সময়ই তিনি নিজ জন্মভূমি মোরাভিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজ ধর্মের গীর্জার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ১৬২১ সালে যে গ্রামে তাঁহার গীর্জা অবস্থিত, তাহা রোমান ক্যাথলিক্ ধর্মে বিশ্বাসী স্পানিয়ার্ডরা আসিয়া দখল করিয়া লয় এবং সমস্ত গ্রাম লুণ্ঠন করে। এর ফলে কমেনিয়াসের সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি নষ্ট হয়। এমন কি, তাঁহার সমস্ত পাণ্ডুলিপিও বিনষ্ট হয়। এই বৎসরেই তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটে এবং পরবর্তী বৎসর তাঁহার একমাত্র শিশু সন্তানটিও মারা যায়। ১৬২৪ সালে সে অঞ্চল হইতে সমস্ত প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্মযাজকদের নির্বাসিত করা হয়

১ Comenius. *Preface to Prodromus.*

এবং ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে সমস্ত প্রোটেষ্ট্যাণ্ট অধিবাসীদেরই নিজ দেশ হইতে বিতাড়ণ করা হয়। কিন্তু এই সমস্ত বিপদ ও উৎপীড়ন কমেনিয়াস্ খৃষ্টানসুলভ ধৈর্য ও তিতিক্ষার সঙ্গে বহন করেন।

এই সময়ে বোহেমিয়ার অন্তর্গত স্লওপ্না গ্রামের এক ধনী ব্যক্তি কমেনিয়াস্‌কে আশ্রয় দেন। তিনি ষ্ট্যাডিয়াস্ নামে আর একটি প্রোটেষ্ট্যাণ্ট শিক্ষককেও গোপনে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ষ্ট্যাডিয়াস্ এই ধনী ব্যক্তির তিনটি পুত্র সন্তানের গৃহশিক্ষক ছিলেন। এই ষ্ট্যাডিয়াসের অনুরোধে কমেনিয়াস্ শিশুদের শিক্ষাদানের সুষ্ঠু সহজতর পদ্ধতি সম্পর্কে একটি ছোট বই লিখিয়া দেন।

কিন্তু প্রোটেষ্ট্যাণ্টদের উপর উৎপীড়ন এমন অসহ হইয়া উঠিল যে কমেনিয়াস্ ও তাঁহার ধর্মসঙ্গীরা চিরদিনের জন্য প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু বিদায় মুহূর্তেও কমেনিয়াস্ নতজানু হইয়া স্বদেশের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন।

মাইকেলেট্ ঠিকই বলিয়াছেন "কমেনিয়াস্ তাঁহার স্বদেশ হারাইলেন কিন্তু এবার তিনি সমগ্র বিশ্বেই নিজ দেশ খুঁজিয়া পাইলেন।" তাঁহার সংস্কার-মুক্ততা বাস্তবিকই লক্ষণীয়। তিনি এবার তাঁহার অনুগামীদের নিয়া সাইলে-সিয়ার সীমান্তে পোলাণ্ডের লেজ্না সহরে বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন। এখানে আসিয়াও তিনি প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি তৎকালীন শিক্ষাবিদ্ র‍্যাটিসিয়াস্, হেল্‌ভিকাস্, ক্যাম্পানেল্লা, লর্ড ভেরুলাম ইত্যাদি মনীষীদের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে পাঠ করিলেন। ইহাতে তিনি যথেষ্ট আকৃষ্ট হইলেও বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের পদ্ধতিতে অনেক ত্রুটি ও অপূর্ণতা রহিয়াছে। এবং তাঁহার সংকল্প হইল এ সমস্ত ত্রুটি দূর করিয়া অটল ভিত্তির উপর এমন একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সম্পূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করিবেন, যাহার বিনাশ কোন দিনই হইবে না—"attempting something that might rest upon an immovable foundation, and which, if it could be once found, should not be subject to any ruin." কমেনিয়াস আরো লিখিয়াছেন, "এ বিষয়ে বহুদিন কাজ করিয়া এবং বহু চিন্তা করিয়া এবং শিক্ষার সমস্ত নীতিকেই অভ্রান্ত প্রাকৃতিক নিয়মানুগ

করিয়া, আমি আমার শিক্ষানীতি (Didactica Magna) আবিষ্কার করিয়াছি। ইহা এমন একটি কৌশল যাহা দ্বারা সহজে এবং নির্ভুলভাবে সকল মানুষকে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইবে "the art of readily and solidly teaching all men all things".

তিনি তাঁহার এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনা যে পুস্তকে করিয়াছিলেন তাহা তখনই প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু শিশুদের শিক্ষাবিধি সম্পর্কে একখানা ছোট বই "ভাষাশিক্ষার তোরণের অর্গলমোচন" (Janua Linguarum Reserta—Gate of Tongues unlocked) এ সময় তিনি প্রকাশ করেন এবং ইহাতে তাঁহার প্রচুর যশোলাভ হয়। বহু দেশ হইতে শিক্ষক ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে পত্র দেন। এবং তাঁহার ক্ষুদ্র পুস্তকটি শুধু ইয়োরোপের বিভিন্ন ভাষায় নহে, এশিয়ারও কোন কোন ভাষায় অনূদিত হয়।

এই প্রশংসায় উৎসাহিত হইয়া কমেনিয়াস্ একটি বৃহৎ কাজের প্ল্যান্ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুঃসাহসিক প্ল্যান্ হইল "সকল মানুষকে সব বিষয় শিক্ষা" দিবার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান ও বিভিন্ন বিষয়ে বহু বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সহজ ভাষায় অনেক বই লেখা। ইহার জন্য বহু পণ্ডিত ব্যক্তির বহু পরিশ্রমই শুধু নয়, প্রভূত অর্থব্যয়েরও প্রয়োজন। তাই এই প্ল্যানের আর্থিক দায়িত্ব নিতে পারে, এমন বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যক্তি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নানা দেশ হইতে তিনি আমন্ত্রণ-পত্র পাইলেন। ইহার মধ্যে একটি পত্র, ইংল্যাণ্ডের হার্টলিবের নিকট হইতে। হার্টলিব কমেনিয়াসকে অতীব শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। তিনি ইংল্যাণ্ডের বিদ্বৎসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি উদ্যোগী হইয়া ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টকে রাজী করান দেশের শিক্ষা-সংস্কারের উদ্দেশ্যে কমেনিয়াসকে ইংল্যাণ্ডে আমন্ত্রণ করিতে। এ আমন্ত্রণ পত্র পাইয়া কমেনিয়াস্ লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছিলেন কিন্তু ইংল্যাণ্ডে তখন অন্তর্দ্বন্দ্বের (Civil war) সূচনা দেখা দেয়, এবং এ শিক্ষা-সংস্কারের কাজ স্থগিত রাখা হয়। কমেনিয়াস্ ১৬৪২ সালের অগষ্ট মাস পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে ছিলেন।

২ S. S. Laurie—*John Amos Comenius*. P. 50.

১৬৩৮ সালে কমেনিয়াসকে না জানাইয়া হার্টলিব জানুয়া রেরাম্ (Janua Rerum) পুস্তকটি প্রকাশ করেন। ইহাতে শিক্ষাজগতে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কেহ কেহ এ পুস্তকের তীব্র সমালোচনা করেন। ইহার উত্তরে সেই বৎসরই কমেনিয়াস্ সোনাটুইয়াম্ প্যান্সোফিকোরাম্ ডিল্যুসিড্যাসিও (Sonatuum Pansophicoram Dilucidatio) প্রকাশ করেন। ১৬৩৯ সালে হার্টলিব্ কমেনিয়াসের পূর্বপ্রকাশিত একটি বইএর নূতন সংস্করণ প্রড্রোমাস্ (Prodromus) নামে বাহির করেন। এ বইয়ে কমেনিয়াস্ ল্যাটিন্ শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ যোগ করেন। হার্টলিব্ ১৬৪২ সালে এ বইএর ইংরেজী অনুবাদ (A Reformation of Schools) প্রকাশ করেন।

ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে কমেনিয়াস্ আমষ্টার্ডামের ধনী ব্যবসায়ী ডি গ্রীয়ারের আমন্ত্রণক্রমে সেখানে যান। উদ্বাস্তু প্রোটেষ্ট্যাণ্টদের জন্য মহাপ্রাণ ডি গ্রীয়ারের মুক্তহস্তে দান সেকালে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার নিজ শিক্ষানীতি সম্বন্ধে তাঁহাকে সেই সময়ের মহাপণ্ডিত অক্সেন্ষ্টীয়র্ণ ও জন স্কাইটের কাছে সুইডেনে দীর্ঘ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই পরীক্ষার ফলে এই দুই পণ্ডিত ব্যক্তি কমেনিয়াসের নূতন শিক্ষাপদ্ধতির উৎকর্ষ সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হন, এবং ডি গ্রীয়ার কমেনিয়াস্ ও তাঁহার কয়েকজন সহকর্মীর ভরণপোষণ এবং তাঁহাদের পুস্তক প্রকাশের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু ডি গ্রীয়ার কমেনিয়সের উপর ভার দেন, বিদ্যালয়ে ল্যাটিন শিক্ষার একটি সহজ সংক্ষত, ও সম্পূর্ণ পদ্ধতি প্রণয়ণের। এই সংকীর্ণ কাজ কমেনিয়াসের মনঃপূত ছিল না—(ইহাকে তিনি ভাষার কুটিল পঙ্কে নিমজ্জন—miry entanglements of logomachy"—বলিয়াছিলেন) তথাপি দীর্ঘ আট বৎসর ধরিয়া তাঁহার শিক্ষার মূলসূত্র Didactica Magna—অনুসরণে ভাষা শিক্ষার সহজ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রণয়নে তিনি ব্যস্ত থাকেন। এ সময়ে তিনি প্রাশিয়ার এলবিং সহরে বাস করিতেছিলেন। ইহা প্রসিদ্ধ ডানৎজিগ্ (Dantzig) সহরের ৩৬ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। তিনি কিছুদিন পূর্বে আবার বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রীকে লেজ না হইতে নূতন বাসভূমিতে আনাইয়া লন।

ডি গ্রীয়ার্ দাতা হইলেও কঠিন ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকও ছিলেন। তিনি চাহিতেন কমেনিয়াস্ সব সময় তাঁহার সেই ভাষা শিক্ষার কাজেই ব্যাপৃত থাকিবেন। ইহা নিয়া ডি গ্রীয়ারের সঙ্গে কিছু মনোমালিন্য হয়। কমেনিয়াস্ অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন এবং তাঁহার প্রোটেষ্ট্যাণ্ট অনুগামীদের কল্যাণের জন্যও তিনি অনেক সময় ব্যস্ত থাকিতেন। এ সময় তিনি যথেষ্ট আর্থিক কষ্ট ভোগ করেন এবং তাঁহার সহকর্মীদের মাহিনা ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য তিনি কয়েকটি ছাত্রও পড়াইতেন। এ সমস্ত পরিশ্রমের মধ্যেও তিনি ইউরোপে তৎকালে ত্রিশ বৎসরব্যাপী যে ধর্মযুদ্ধ (Thirty Years' War) চলিয়াছিল সে সম্বন্ধে একটি রাজনৈতিক পুস্তিকা রচনা করেন এবং তাহাতে রোমান ক্যাথলিক্‌দের তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। এই প্রবন্ধের জন্য ভবিষ্যতে তাহাকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। ১৬৪৮ সালে এই যুদ্ধাবসানে ওয়েষ্ট-ফেলিয়ার সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু ইহাতে উদ্বাস্তুদের নিজ দেশে ফিরিবার কোন সর্ত ছিল না। কাজেই কমেনিয়াস ও তাঁহার অন্যান্য প্রোটে-ষ্ট্যাণ্ট সহকর্মীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আশা চিরতরে বিলুপ্ত হইল।

এ সময় অবশ্য তাঁহার আর্থিক অবস্থার কিছু উন্নতি হইল। মোরাভিয়ান্ ব্রিদ্রেন্‌দের সর্বপ্রধান ধর্মযাজকের মৃত্যু হওয়াতে কমেনিয়াসকেই এই পদে বরণ করা হইল। ডি গ্রীয়ার তাঁহাকে যে কাজের ভার দিয়াছিলেন একটি বৃহৎ পুস্তকে (Methodus Linguarum Novissima) তাহার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া একটি সারস্বত মণ্ডলীর (Commission) কাছে তাহা পরীক্ষার জন্য দেন। তাঁহারা এ পুস্তক অনুমোদন করেন। কমেনিয়াস্ এবার এলবিং ত্যাগ করিয়া লেজনায় ফিরিয়া যান।

তিনি ট্যান্সসিলভ্যানিয়ার বিদ্যালয় সংস্কারের ভার নিয়া সারোস্-পাটক্ (Saros-Patak) সহরে গেলেন। এখানে ১৬৫০ হইতে ১৬৫৪ পর্যন্ত তিনি সেই কাজে ছিলেন। এইটি উদ্বাস্তু প্রোটেষ্ট্যাণ্টদের একটি উপনিবেশ ছিল এবং আন্তরিক দরদ দিয়া কমেনিয়াস্ এখানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এখানেই তিনি তাঁর সব চেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ (Orbis Pictus) রচনা করেন। বাস্তবিক পক্ষে এটি পূর্ববর্তী জানুয়ারই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ইহা শিশুদের জন্য রচিত সচিত্র পুস্তক। ইহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন জিনিষের নাম ও ছবির মধ্য

দিয়া দ্রব্য পরিচয়ের সরস চেষ্টা করা হয়। বলা যায় ইহাই শিশুদের জন্য রচিত প্রথম ছবির বই। আজ অবশ্য এ রকম হাজার হাজার বই বাজারে কিনিতে পারা যায়, কিন্তু ইহার প্রথম প্রবর্তনের সম্মান কমেনিয়াসের প্রাপ্য। এই বই ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে নূর্ণবার্গ হইতে প্রকাশিত হয়।

সারোস্ পাটক্ কাজের শেষে কমেনিয়াস্ আবার সপরিবারে লেজ্না ফিরিয়া গিয়াছিলেন। এ সময় সুইডেনের প্রোটেষ্ট্যাণ্ট রাজা পোলাণ্ড আক্রমণ করেন এবং লেজনা অধিকার করেন। ইহাতে মোরাভিয়ান্ ব্রিদ্রেন্ সম্প্রদায় উল্লসিত হন এবং কমেনিয়াস্ প্রকাশ্যে সুইডেনের রাজাকে স্বাগত অভিনন্দন জানাইয়া একখানা পত্র দেন। যুদ্ধাবসানে সন্ধির সর্ত অনুযায়ী লেজ্না সহ আরো কয়েকটি সহর সুইডেনের অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু সুইডেনের সৈন্যদল অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই অঞ্চলের পোলিশ্ অধিবাসীরা বিদ্রোহী হয়, এবং প্রোটেষ্ট্যাণ্টদের সদর ঘাঁটি লেজ্না পুনরায় দখল করিয়া লয়। পোলরা সমস্ত নগর লুণ্ঠন করে এবং প্রোটেষ্ট্যাণ্টদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করে। কমেনিয়াসের প্রকাশ্য রাজনৈতিক মতবাদের জন্য তাঁহার উপর রোমান্ ক্যাথলিকরা বিশেষ ক্রুদ্ধ ছিল এবং যদিও কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরবর্গসহ কমেনিয়াস্ সপরিবারে পলাইয়া যাইতে সক্ষম হন তথাপি তাঁহার গৃহের সমস্ত দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এবারও কমেনিয়াসের যাবতীয় মূল্যবান্ পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে কমেনিয়াস্ লিখিয়াছেন "যেদিন আমার নিঃশ্বাসবায়ু আর বহিবে না, সেদিনই শুধু আমার এ দুঃখ ভুলিতে পারিব।"

জার্মানীর নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি আবার আমস্টারডামে (Amsterdam) এ উপনীত হইলেন। ডি গ্রীয়ারের ছেলে কমেনিয়াসকে সম্মানের সঙ্গে আশ্রয় দেন। জীবনে কমেনিয়াস্ সুখশান্তির মুখ দেখেন নাই কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি শান্তি ও সম্মানের সঙ্গে কাটাইয়া আশী বৎসর বয়সে ১৬৭১ সালে প্রাণত্যাগ করেন। সারাজীবন শিক্ষা সংস্কারের যে চেষ্টা তিনি করিয়া গিয়াছেন তাহার ফল তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই—কিন্তু অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ কর্তব্য কর্ম তিনি করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি লিখিয়াছিলেন "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

সমস্ত জীবন উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া আমি কাজ করিয়া গিয়াছি…মঙ্গলের জন্য আকাঙ্ক্ষা, তাহা যে ভাবেই হৃদয়ে সঞ্চারিত হউক না কেন, সমস্ত কল্যাণের উৎস ভগবানের নিকট হইতে প্রবাহিত, তাহা ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীর ন্যায় প্রাণপ্রদ।" তাঁহার শ্রম ও ঐকান্তিকতা বৃথা হয় নাই। ভবিষ্যৎকাল শিক্ষা-ক্ষেত্রে তাঁহাকে নূতন পথের সার্থক সন্ধানী হিসাবে সাধু পেস্‌তা লৎসীর মতই সম্মানের অধিকারী বলিয়া মনে করিয়াছে।[৩]

শিক্ষা কাহার জন্য, কিসের জন্য? কমেনিয়াসের পূর্বে যে সব শিক্ষাবিদ্ আসিয়াছিলেন, তাঁহারা জানিতেন শিক্ষার উদ্দেশ্য দেশের শাসনভার গ্রহণ করিতে পারে এমন কুশলী অভিজ্ঞ মানুষ তৈরী করা। অথবা কেহ কেহ মনে করিতেন, বিদ্যা বা ধর্মচর্চায় রত থাকিবেন এমন পণ্ডিত বা ধর্মপ্রচারক প্রস্তুত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু কমেনিয়াসই প্রথম সাহস করিয়া বলিলেন শিক্ষা সকল মানুষের জন্য, এবং সে শিক্ষা শুধু বিশেষ একটি বিষয়ে নয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য সর্ববিষয়ে সব মানুষকে জ্ঞানদান "to teach all things to all man"। এত বড় দুঃসাহসের কথা,—পৃথিবীর মানুষের জন্য এত বড় আশার কথা ইতিপূর্বে আর কেহ বলেন নাই। শিক্ষা শুধু ধনীর জন্য নয়, শিক্ষা শুধু পুরুষের জন্য নয়, শিক্ষা শুধু বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের জন্য নয়—সকল মানুষের অধিকার আছে শিক্ষার—যেমন আছে অধিকার বাঁচিয়া থাকিবার। তিনি একটি ফাঁকা আদর্শ প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার সমস্ত শ্রম সমস্ত চিন্তা তিনি ব্যয় করিয়াছেন এই সার্বজনীন শিক্ষা কি ভাবে স্বাভাবিক ও সহজ ভাবে দেওয়া যাইতে পারে তাহার উপায় ও পদ্ধতি নির্ধারণে। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Didactica Magna-র মুখবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন "এই পুস্তকে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে সমগ্র খৃষ্টান জগতের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। নগর, গ্রাম, স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সমস্ত বালক-বালিকাদের জন্য শিক্ষাদান উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় স্থাপন করা যেমন প্রয়োজন, কি ভাবে অল্পকালের মধ্যে এবং আনন্দের মধ্য দিয়া সমস্ত বিজ্ঞান বিষয়ে সম্যক জ্ঞান শিক্ষা দান করা যায় এবং ছাত্র ছাত্রীরা শুদ্ধ নৈতিক চরিত্র ও

---

৩ Quick· *Essays on Educational Reformers*—P. 119-134.

ভগবৎ বিশ্বাসের অধিকারী হইয়া বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে সফল ও সুখী হইতে পারে তাহারও সম্পূর্ণ পদ্ধতি বর্ণনা করা হইয়াছে।"

সার্বজনীন শিক্ষা সম্বন্ধে কমেনিয়াসের মতের মূল তাঁহার গভীর ধর্ম-বিশ্বাস। প্রত্যেক মানুষ ভগবানেরই প্রতিচ্ছবি—প্রতি মানুষের মধ্যেই আছে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা ও অসীম বিকাশের সম্ভাবনা। কাহাকে ভগবান্ কোন কাজের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা কেহ বলিতে পারে না তাই প্রত্যেক মানুষকেই প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞানের সুযোগ দিতে হইবে।[৫] কমেনিয়াসের Pansophia বা সর্ববিদ্যা সংগ্রহের ইহাই উদ্দেশ্যে।

কমেনিয়াস্ শুধু স্বপ্নবিলাসী দার্শনিকই নন, তিনি শিক্ষক; সমস্ত জীবন তিনি শিক্ষক হিসাবে শিক্ষা বিতরণ করিয়াছেন সুতরাং তাঁহার শিক্ষার আদর্শ কি করিয়া সুষ্ঠু পদ্ধতি অবলম্বনে সার্থক হইতে পারে, ইহাই ছিল জীবনব্যাপী তাঁহার চিন্তা ও পরীক্ষা। তিনি বাস্তব দার্শনিক—a practical philosopher.

তৎকালীন শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটিগুলি তাঁহার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী দৃষ্টি এড়ায় নাই, এবং অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবেই সে ত্রুটিগুলি তিনি বিচার করিয়াছেন। তিনি প্রচলিত বিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে বলিয়াছেন "এগুলি ছাত্রদের কাছে বিভীষিকা, মনন চিন্তনের হননশালা। বিদ্যালয়ের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতির ফলে ছাত্রদের মনে সাহিত্য সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা জন্মে। সেখানে শুধুই সময়ের অপচয়। সেখানে দশ বৎসরে যাহা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা এক বৎসরেই শিখানো যায়, সেখানে ধীরে ধীরে রুচি ও শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ অনুযায়ী শিক্ষা না দিয়া তাড়াতাড়ি জোরজবরদস্তি করিয়া বিদ্যা গিলাইবার চেষ্টা করা হয়। তাহা স্বচ্ছ সহজ ও পরিচ্ছন্ন ভাবে ছাত্রদের মনের সামনে উপস্থাপিত করা উচিত। তাহা যদি বিভ্রান্তিকর ও জটিল ভাবে প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে কেবলই কথা দিয়া মনের পুষ্টিসাধনের নিষ্ফল চেষ্টা করা হয়।[৬]

প্রকৃতির অমোঘ নিয়মানুসরণই শিক্ষার প্রকৃত উপায়। বাহ্যপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির নিয়ম মূলতঃ এক। তবে বাহ্যপ্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কারের চেয়ে

---

৪ Keatinge—*The Great Didactic of Comenins—Subtitle.*
৫ Rusk—*Doctrines of Great Educators*. P, 89.
৬ S, Laurie—*John Amos Cominius* P. 59.

অন্তর প্রকৃতি বা মনুষ্যস্বভাবের নিয়ম আবিষ্কার কঠিন। "ভগবদ্দত্ত বিধানানুযায়ী মানুষের পূর্ণ বিকশিত স্ব-ভাবই হইল মনুষত্ব (ক) মানুষ সর্ববিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবে (খ) পৃথিবীর সমস্ত দ্রব্যের এবং নিজ প্রবৃত্তির সে প্রভু হইবে (গ) মানুষ সমস্ত বস্তু ও ঘটনার কারণ হিসাবে ঈশ্বরকে স্বীকার করিবে। প্রকৃতিই মানুষের অন্তরের জ্ঞান, নৈতিকতা ও ঈশ্বরে সমর্পণের সুবুদ্ধি ও আকাজ্ক্ষার বীজ রোপন করিয়াছেন। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল এই বীজ বা সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ। সমস্ত মানুষেরই শিক্ষার প্রয়োজন আছে। শিক্ষার পরিপূর্ণ সুযোগ যাহাতে শিশু পায় সে জন্যই ভগবান্ তাহাকে অন্য সমস্ত বিষয়ে অসহায় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।"[৭]

প্রচলিত শিক্ষা স্বভাব বিরুদ্ধ বলিয়াই ইহাতে বহু শ্রমের অপচয় ঘটে, এবং শিক্ষার্থীর মনকে ইহা আকর্ষণ করিতে পারে না। প্রচলিত বিদ্যালয়ে শুধু ভাষা শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হয়, তাহাও শিশুর মাতৃভাষা নয়, ল্যাটিন ভাষা। ভাষা শিক্ষার পদ্ধতিও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। প্রসিদ্ধ লেখকদের লেখার মধ্য দিয়াই ভাষার সঙ্গে জীবন্ত পরিচয় ঘটে, নীরস কঠিন ব্যাকরণের সূত্র দিয়া ভাষা শিক্ষার প্রচলিতবিধি নিষ্ফলই শুধু নয়, সেই ভাষার প্রতি শিক্ষার্থীকে ইহা বিদ্বিষ্টই করিয়া তুলে। বিদ্যালয়গুলিতে বাস্তব পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রকৃতির দ্রব্যাদির সঙ্গে পরিচয়ের কোন চেষ্টা হয় না। প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত, স্বচ্ছন্দ ও আনন্দময়। কিন্তু শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হয় শাসন ভীতি ও তাড়না দ্বারা। কমেনিয়াস বলিয়াছেন "মাছের পক্ষে জলে সাঁতার দেওয়া, পাখীর পক্ষে আকাশে ওড়া, পশুর পক্ষে দ্রুত বিচরণ যেমন সহজ ও স্বাভাবিক, শিশুর পক্ষে শিক্ষাও তেমনি সহজ ও স্বাভাবিক।" অ্যারিষ্টট্‌লও অনুরূপ কথাই বলিয়াছিলেন "মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আকাজ্ক্ষার বীজ উপ্ত আছে, শিক্ষা সেই বীজকে স্বাভাবিক গতিতে মহীরূহে বিকশিত করে।"

প্রকৃতিতে প্রত্যেক জিনিসেরই বিকাশের উপযুক্ত সময় আছে, সেখানে কোন অযথা ত্বরা নাই। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ধৈর্য ধারণ করিতে হইবে। কমেনিয়াস্ বলেন "কাঁচা ফল কেবল সেদিনেরই জন্য, ইহা টিঁকে না। কিন্তু পরিণত পুষ্ট ফলটি সমস্ত বৎসর ধরিয়া ঘরে রাখা চলে। শিক্ষার

---

৭ Quick—*Essays on Educational Reformers*. P. 135.

এই নীতি রুশো ও মন্তেসরী বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতির নিয়ম শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া কমেনিয়াস্ বলিলেন যে প্রত্যেক বিষয়ে শিক্ষার পূর্বে সুশৃঙ্খলভাবে তাহার উপাদান প্রস্তুত করা প্রয়োজন। পূর্বে উপাদান সংগ্রহ,—তাহার পর রূপদান (form)। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা তাহার বিপরীত। বস্তুপরিচয় না করাইয়াই ভাষার ভিত্তিহীন সৌধ গড়িবার চেষ্টা নিষ্ফল হইতে বাধ্য।

প্রকৃতির সৃষ্টিতে মূল উপাদান প্রথমে আসে পরে আসে অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় বাহ্য অলংকার,—শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রথম শিক্ষণীয়, বিষয়ের মূল প্রয়োজনীয় অংশ। ক্রমশঃ খুটিনাটি জটিল অংশ শিখাইতে হয়। কাজেই কোন বিষয় শিক্ষা দিতে গেলে প্রথম চাই বোধ, তারপর সে বিষয় অধিগত করিবার জন্য চাই স্মৃতিশক্তি ও মুখস্থের ব্যবহার, তাহার পরে শিক্ষণীয় ভাষার কারুকার্য। প্রচলিত বিদ্যালয়ের পদ্ধতি একেবারে বিপরীত।

প্রকৃতিতে সকল বস্তুরই আছে ক্রমপরিণতি—সেখানে বিশৃঙ্খল উল্লম্ফন নাই। শিক্ষাক্ষেত্রেও সযত্নে শিক্ষার বিষয় ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতে হইবে। প্রত্যেক দিনের, মাসের, প্রত্যেক শ্রেণীর কাজ পূর্ব হইতেই সুচিন্তিতভাবে সুষ্ঠু পরিণতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্থির করিয়া রাখিতে হইবে। প্রকৃতির ক্ষেত্রে যেমন শৈথিল্য নাই, শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষক বা ছাত্রের শৈথিল্য ক্ষমার অযোগ্য। যতক্ষণ লোহা তাতিয়া লাল থাকে ততক্ষণই তাহা গড়িয়া পিটিয়া ইচ্ছামত রূপ দেওয়া চলে—মনের ক্ষেত্রেও মনোযোগ ও আগ্রহ শিথিল হইলে কাজ নষ্ট হয়।

প্রকৃতি তাহার ফুটন্ত বাড়ন্ত প্রাণকোরকগুলিকে ক্ষতি হইতে রক্ষা করে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও অপরিণত শিশুর মনকে সর্বপ্রকার হানিকর প্রভাব হইতে রক্ষা করিতে হইবে। অসৎ সংসর্গ ও কুৎসিত উত্তেজক পুস্তক হইতে তাহাদিগকে সর্বপ্রযত্নে দূরে রাখিতে হইবে।[৯] অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৃহের পরিবেশ কলহ, হিংসা, দ্বেষ দ্বারা কলুষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত বিদ্যা পিতামাতার নাই। তাহা ছাড়া সমবয়স্ক অন্যান্য শিশুদের সাহচর্যে শিক্ষালাভ

৮ Comenius—*The School of Infancy*. Ch. XJ.
৯ Quick—*Essays on Educational Reformers*. P. 137

সহজ, আনন্দময় ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়। এক শিশুর উৎকর্ষ ও কুশলতা অন্য শিশুদেরও উদ্বুদ্ধ করে। উপদেশ দ্বারা শিক্ষা সামান্যই হয়। কিন্তু শিক্ষক বা অন্য ছাত্রদের ক্রিয়া শিশুর মনে গভীর ছাপ রাখে।[১০] বিদ্যালয়ই মানুষের পূর্ণ বিকাশলাভের উপযুক্ত ক্ষেত্র। পরবর্তীকালে রুশোও প্রকৃতির নিয়মানুসারী শিক্ষার কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার কাল্পনিক আদর্শছাত্র গৃহ হইতে দূরে প্রকৃতির নির্মল পরিবেশে কেবলমাত্র গৃহশিক্ষকের সাহচর্যে বড় হইয়া উঠিয়াছিল। রুশোর চেয়ে কমেনিয়াসের শিক্ষাদর্শ এবিষয়ে অধিকতর সত্য ও সফল।

বিদ্যালয়ের বহিরঙ্গ রূপ এবং অন্তরঙ্গ পদ্ধতি এই সব বিষয়েই কমেনিয়াসের মত সুস্পষ্ট, এবং অনেক ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনকভাবে আধুনিক। শিশুর মনকে শিক্ষায় আকৃষ্ট করিতে হইলে বিদ্যালয়ের বহিরঙ্গ রূপটি উপেক্ষা করা চলে না। তাই কমেনিয়াস বলিয়াছেন, বিদ্যালয়গৃহ খোলা-মেলা, পরিচ্ছন্ন ও সুশোভিত হওয়া প্রয়োজন। ছাত্রদের খেলা ও অঙ্গসঞ্চালনের জন্য মাঠ এবং তাহাদের পর্যবেক্ষণ-শক্তি কুশলতা ও রুচিবোধ বিকাশের জন্য সুন্দর ফুল ও ফলের বাগান থাকা প্রয়োজন। এ সার্বজনীন বিদ্যালয়ের দ্বারে ধনী দরিদ্র, স্ত্রীপুরুষে বিভেদ থাকিবে না। বহু পরবর্তী কালের কিণ্ডারগার্টেন ও নার্সারী স্কুলের আদর্শের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা কমেনিয়াসে পাই।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রদের রুচি, প্রবৃত্তি ও ক্ষমতার কথা স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন—ইহা আধুনিক শিক্ষানীতির একটি মূলসূত্র। রুশোর পর হইতে ক্রমেই এই সূত্রটি ক্রমশই অধিকতর গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। কিন্তু কমেনিয়াসের সময়ে এ ধারণা নিতান্তই অভিনব ছিল। শিক্ষক তাড়না দ্বারা, শাস্তির ভয় দেখাইয়া ছাত্রদের শিখাইবেন, ইহাই ছিল প্রচলিত বিধি। এখনও বেত্রসঞ্চালনের রাজত্বের সম্পূর্ণ অবসান হয় নাই। যাহা হউক, কমেনিয়াস্ বলিয়াছেন, কোন বিষয় শিক্ষা দিতে হইলে তাহা কি ভাবে ছাত্রদের কাছে আকর্ষণীয় হইবে শিক্ষককে সে বিষয়ে চেষ্টিত হইতে হইবে। প্রত্যেকটি বিষয়ই যথাসম্ভব সরস, সহজ, যুক্তিপূর্ণ ভাবে ছাত্রদের শক্তি অনুযায়ী

---

১০ Keatinge—*The Great Didactic* Ch VII § 7 (III)

তাহাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হইবে। তাহাদের পুস্তকাদি সুদৃশ্য ও সচিত্র হইলে তাহারা উৎসাহিত হয়। পিতামাতা সর্বদা শিক্ষার মর্যাদা সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের অবহিত করাইবেন এবং শিক্ষক ও বিদ্যায়তনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন। যাহারা লেখাপড়ায় ভাল হইবে তাহাদের প্রশংসা করিতে হইবে এবং উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে হইবে। গল্প, উপকথা ইত্যাদি দ্বারা তাহাদের পাঠ মনোহারী করিয়া তুলিতে হইবে।

শাস্তিদান সম্বন্ধেও কমেনিয়াসের মত খুবই আধুনিক। এ বিষয়ে রুশোর কৃতিত্ব বহু প্রশংসিত। কিন্তু খুব সম্ভব রুশোর মতবাদ কমেনিয়াসের দ্বারা প্রভাবিত। কমেনিয়াসের মতে নৈতিক অপরাধ ভিন্ন অন্য ত্রুটির জন্য ছাত্রদের শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। ছাত্রেরা পড়াশুনা যদি না পারে বা না বোঝে তবে সে অপরাধ ছাত্রের নয়, শিক্ষকের। কমেনিয়াস্ একটি সুন্দর উপমা দিয়া বলিতেছেন, "বীণাযন্ত্রটি বেসুরা বাজিলে গুণীশিল্পী যন্ত্রটিকে বদ্ধ-মুষ্টি বা যষ্টিদ্বারা আঘাত করেন না, অথবা প্রাচীর গাত্রে নিক্ষেপ করেন না। পরন্তু বৈজ্ঞানিক রীতি অনুযায়ী ধৈর্যের সঙ্গে ইহার তারগুলিকে সুরে বাঁধিতে চেষ্টা করেন এবং কোন ত্রুটি থাকিলে তাহা সংশোধন করেন। শিক্ষার্থীদের মনে জ্ঞানস্পৃহা জাগ্রত করিতে হইলেও তেমনি ধৈর্য, কুশলতা ও সহানুভূতি প্রয়োজন। অন্য কোন পন্থায় তাহাদের আলস্য বিদ্বেষে, এবং উপযুক্ত শ্রমের অভাব নিতান্ত নির্বুদ্ধিতায় পরিবর্তিত হইবে।"[১১]

শৈশব হইতে যৌবন পর্যন্ত সম্পূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতির জন্য কমেনিয়াস্ চারিটি স্তর নির্দেশ করিয়াছেন (১) শৈশবে মাতৃবক্ষ (২) বাল্য ও কৈশোরে মাতৃভাষা-শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়। ছয় হইতে বার বৎসরের ছেলে মেয়েদের জন্য এই সার্বজনীন বিদ্যালয়। (৩) ল্যাটিন ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় বা জিম্‌নাসিয়াম (৪) আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ভ্রমণ।

শৈশবে মাতৃক্রোড়েই শিশু তাহার শিক্ষালাভ করিবে। তাহার নিকট-আত্মীয়পরিজন এবং সংসারও তাহার দেহ ও মনের পুষ্টি জোগাইবে, কিন্তু মা-ই শিশুর শ্রেষ্ঠ আশ্রয় ও শিক্ষাদাত্রী।

---

[১১] Keatinge—*The Great Didactic of Comenius*. Ch. XXVI

কমেনিয়াসের সার্বজনীন বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহা তাঁহার মমতা ও সুশৃঙ্খল চিন্তার পরিচায়ক। এ বিদ্যালয় ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে। প্রত্যেক শ্রেণীতে এক বৎসর করিয়া পড়িতে হইবে। সকালে দুই ঘণ্টা ও বিকালে দুই ঘণ্টা স্কুল বসিবে। দুপুরে খাওয়া, দাওয়া, বিশ্রাম ও দুই ঘণ্টা নিজে নিজে ঘরে পড়িবার জন্য (home study) নির্দিষ্ট থাকিবে।

সকালে মন সতেজ থাকে, সে সময় নূতন পড়া শেখা ও পুরান পড়া মুখস্তের সময়। বিকালে হাত ও গলার কাজের সময়। প্রত্যেক ক্লাশের জন্য একটি বইই নির্দিষ্ট থাকিবে এবং একজন শিক্ষকই এক একটি শ্রেণীর ভারপ্রাপ্ত হইবেন। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট বই সুচিন্তিতভাবে লিখিত হইবে। বিষয় বিভাগ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধ, প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহ, প্রতি মাসের পাঠক্রম পূর্বেই সুশৃঙ্খলভাবে নির্দিষ্ট করিতে হইবে। এ বিদ্যালয়-গুলিতে মাতৃভাষা শিক্ষাই প্রধান বিষয় হইবে। প্রচলিত বিদ্যালয়গুলির মত এখানে এ বিষয়ে অবহেলা তো থাকিবেই না বরং বিপরীতই হইবে। কারণ কমেনিয়াসের মতে পণ্ডিতদের ভাষা ল্যাটিন্ শিখাইতে হইলেও প্রথম দেশীয় মাতৃভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকা একান্ত দরকার।

শিশুদের সর্বদা উৎসাহপূর্ণ কর্মে ব্যাপৃত রাখিতে হইবে, তিনি প্রাচীনদের মত খেলা-ধূলার বিরোধী নন। আলস্যকেই তিনি ছাত্রজীবনের প্রধান শত্রু বলিয়া মনে করেন। তিনি তাই বলিয়াছেন "অলস হইয়া বসিয়া থাকিবার চাইতে খেলাধূলা অনেক ভাল।" ইহাতে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের মধ্য দিয়া শিশুদের উদ্যম বিকশিত হয়।

প্রচলিত বিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁহার একটি প্রধান অভিযোগ এই যে, এখানে শিক্ষা নিতান্তই অবাস্তব। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক নাই। "বিদ্যালয়ে যাহা তাহারা শিখে, তাহা যেন যত্ন করিয়া বাক্সে ভাজ করিয়া রাখে। ভবিষ্যতে জীবন-সমুদ্রযাত্রার পথে হয়তো সে সব পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে পারিবে। কমেনিয়াস এবং পরবর্তীকালে রুশো, ফ্রোএবেল, মন্তেসরী সকলেই এই পদ্ধতির ঘোর বিরোধী। সহজেই অনুমেয় কমেনিয়াস্ ভূগোল, ইতিহাস, জ্যামিতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বস্তুগতভাবে শিক্ষা দেওয়ার কথা

বলিয়াছেন। এবং কি করিয়া এ শিক্ষা দিতে হইবে তাহার পদ্ধতিও তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। বেকনের মত কমেনিয়াসও বারে বারে বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়দ্বারা বস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় শিশুশিক্ষার একটি মূল সূত্র।

কমেনিয়াস পরবর্তী কালে পেস্তানৎসীর মত সমস্ত জটিল বিষয়েই সহজ ও যুক্তিগত বিন্যাসের পক্ষপাতী। কমেনিয়াস বিশ্বাস করেন শিশুকে যুক্তি-অনুগত প্রাণী বলিয়া মনে করিয়া সমস্ত বিষয়ই সহজ ও যুক্তিসঙ্গত ভাবে তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হইবে। ইহাতে অল্প সময়ে বহু বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইবে।[১২]

কমেনিয়াস্ শিক্ষার অর্থ শুধু বুদ্ধিবিকাশই মনে করেন নাই। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কুশলতালাভ ও রুচিবিকাশকেও তিনি অগ্রাহ্য করেন নাই। শিশুরা অঙ্কন, উদ্যানরচনা, ফুল গাছের যত্ন ইত্যাদিও শিখিবে। অঙ্কন সম্বন্ধে তিনি একটি মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন যাহা শিক্ষকদের স্মরণ রাখা কর্তব্য। কমেনিয়াস্ বলিয়াছেন "শিশুরা যাহা আঁকিল তাহা নির্ভুল হইল কিনা তাহাতে কিছু আসে যায় না—শুধু দেখিতে হইবে ইহাতে যেন তারা আনন্দ পায়।"

সামাজিক শিষ্টতা ও নীতিশিক্ষাও তিনি শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাঁহার মতে সার্বজনীন বিদ্যালয় সমস্ত মানুষে শ্রদ্ধা উদ্রেক করিবার এবং শোভন ভদ্র আচরণ শিক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র। কমেনিয়াসের এই গণতান্ত্রিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমান যুগের প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

অধিকাংশ ছেলে মেয়ের পক্ষে দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেশী পড়া শুনা হইবে না। মেধাবী ছাত্রেরা ইহার পর উচ্চতর ল্যাটিন স্কুলে পড়িয়া ল্যাটিন ও অন্যান্যভাষা শিক্ষা করিবে। এখানেও কোন জাতিভেদ থাকিবে না, কারণ যাহাদের মেধা আছে ভবিষ্যতে তাহারাই দেশের শ্রেষ্ঠ পদগুলির ভার নিবে। বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতম শিক্ষার স্থান। এখানেও প্রবেশের একমাত্র মাপ-কাঠি, মেধা।

বাস্তবিক পক্ষে কমেনিয়াস্ তাঁহার কালের পূর্বে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার উদার ও নির্ভীক শিক্ষানীতি তাঁহার নিজকালে মানুষ গ্রহণ করে নাই।

[১২] *Comenius—School of infancy*. Ch. VIII. 6, P46.

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতেও তাঁহার মৌলিক চিন্তাধারা আদৃত হয় নাই। বিংশ শতাব্দীতেই আবার তাঁহার শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে আগ্রহ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতেও খ্যাতনামা ঐতিহাসিক হালাম্ কমেনিয়াস্ সম্পর্কে এমন ভ্রান্ত উক্তি করিয়াছেন যে কমেনিয়াস ল্যাটিন্ ভাষা সহজে শিখিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে কমেনিয়াস্এর পদ্ধতি প্রশংসনীয় এবং তাঁহার নিজ কালেও তিনি এজন্য প্রশংসা পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মৌলিকতা ও সংস্কারমুক্ততা অনেক বেশী প্রশংসা পাইবার যোগ্য।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য কমেনিয়াসের শিক্ষানীতিতে শিক্ষার পদ্ধতি ও বিদ্যালয়ের সংগঠন অধিকতর গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, এ বিষয়ে তিনি পরবর্তী যুগের হারবার্টের সমধর্মী। ইহাও সত্য যে, পদ্ধতি ও সংগঠনের উপর তাঁহার সমস্ত চিন্তা নিবদ্ধ থাকাতে তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের কথা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছেন। শিক্ষাকে সফল করিতে হইলে, ছাত্রের মধ্যে শিক্ষাক্রিয়াকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে গেলে, শিক্ষাকে জীবনের অঙ্গ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে গেলে, চাই মরমী দরদী শিক্ষক। যেমন রাজনীতিতে তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রে মেথড্ ও অর্গানিজেসনের চেয়ে মানুষ বড়।

শিক্ষাকে প্রবৃত্ত্যনুগ করিবার উৎসাহে রুশোর মত তিনিও কতকটা বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। মানুষের মনের প্রকৃতি ও তাহার উপযুক্ত শিক্ষা-পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে যাইয়া বাহ্যপ্রকৃতি হইতে উপমা দ্বারা সূত্রানুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু উপমা ও যুক্তি যেমন এক নয়, তেমনি বাহ্য নির্জীব প্রকৃতি ও মনুষ্যের মনঃপ্রকৃতির নিয়মও ঠিক এক নয়। অগষ্ট ভোগেল্ বলিয়াছেন "(শিক্ষার পদ্ধতি নির্ধারণ কালে) মানুষের মনের গঠন ও গতি নির্ধারণ করিতে চেষ্টা না করিয়া তিনি তাঁহার শিক্ষানীতির ভিত্তি করিলেন পক্ষীর জীবন, বৃক্ষের বৃদ্ধি, সূর্যকিরণের প্রাণপ্রদ প্রভাব ইত্যাদি অর্থাৎ মনুষ্যপ্রকৃতির স্থান অধিকার করিল মনুষ্যহীন প্রকৃতি। নিম্নতর প্রকৃতির নিয়ম হইতে উচ্চতর জীবনের নিয়মানুসরণের চেয়ে অবৈজ্ঞানিক ও অনির্ভরশীল পদ্ধতি আর কিছু হইতে পারে না।[১৩] অবশ্য এ কথাও স্মরণ

১৩ A. Vogel—*Gesch. d. Padagogik ols Wissemschaft*. P 94.

রাখিতে হইবে যে ফ্রোএবেল-এর মত এই ধার্মিক মানুষটিও বিশ্বাস করিতেন যে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই ঐশী শক্তি দ্বারা গ্রথিত ও চালিত। তাই বৃক্ষ, পশু, পাখীতে যাহা সত্য, মানুষের মধ্যেও তাহা সত্য। সপ্তদশ শতাব্দীর কমেনিয়াসের মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান খুব নির্ভুল ছিল না ইহাতে অগৌরবের কিছু নাই। বরং আশ্চর্য হইতে হয় শিশুর বিকাশের ধারার সঙ্গে শিশুর শিক্ষার ধারাও অনুবর্তী হইবে এবং সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্যের সূত্র লক্ষণীয়, আধুনিক বিজ্ঞান ও শিক্ষানীতির এই মূল্যবান্ কথাগুলি এত পূর্বেই এত স্পষ্ট করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং তাহা শিক্ষার বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবহারের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্বই প্রকাশ পাইতেছে।

কমেনিয়াসের অবিনশ্বর কীর্তি যে তিনিই প্রথম সকল মানুষের জন্য শিক্ষার দাবী করিয়াছিলেন এবং শৈশব হইতে যৌবন পর্যন্ত সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতির একটি বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধর্মবিশ্বাস তাঁহার শিক্ষাদর্শের ভিত্তি হইলেও তিনি বিজ্ঞানের বিরোধী না হইয়া বিজ্ঞানের প্রতি গভীর আস্থাশীল ছিলেন। তাঁহার সংস্কারমুক্ত মন তাঁহার বিরোধী রোমান ক্যাথলিক্ জেস্যুইটদের শিক্ষাপদ্ধতির উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। গণতন্ত্রের ধারণার অভ্যুদয়ের বহু পূর্বেই তিনি গণতন্ত্রানুমোদিত সার্বজনীন বিদ্যালয় ও স্ত্রীলোকের শিক্ষার সমান অধিকারের কথা প্রচার করিয়াছিলেন এবং তাহা রূপায়ণেও চেষ্টিত হইয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ বস্তুজ্ঞান শিশুশিক্ষার একটি মূলভিত্তি হওয়া উচিত, আধুনিক শিক্ষারীতির এই সূত্রটি তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়াই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে নির্মম শাসন ও তাড়নার নিন্দা করিয়া তিনি তাঁহার সংবেদনশীল উদার মনের পরিচয় দিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে শিক্ষার নব-যুগের ইঙ্গিত তাঁহার চিন্তায় ও কর্মে সুপরিস্ফুটিত। সকল মানুষকে সকল বিদ্যাদানের যে স্বপ্ন তিনি দেখিয়াছিলেন তাহা আজও সফল হয় নাই। হয়তো তাহা কোন দিন সফল হইবেও না। তথাপি যিনি মানুষকে এত বড় মর্যাদা দিয়াছেন, তাহার শক্তিতে এতখানি বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহার অপূর্ণতা ও অসাফল্য সত্ত্বেও তিনি সমগ্র মানবজাতির নমস্য।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে দরিদ্র ও শ্রমিকের সন্তানদের শিক্ষাব্যবস্থা

অষ্টাদশ শতাব্দী ইংল্যাণ্ডের পক্ষে পরম গৌরবের যুগ। ব্রটিশ সাম্রাজ্যের স্থত্রপাত হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে লুণ্ঠিত অপরিমেয় ঐশ্বর্যের স্বর্ণাভা ইংল্যাণ্ডের বিত্তবানদের ভাণ্ডারকে দ্যুতিমণ্ডিত করিয়াছে। বাণিজ্য ও শিল্পে ইংল্যাণ্ড তখন ইউরোপে সর্বাগ্রগণ্য। প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রচুর অবসর একদিকে ধনীদের বিলাসব্যসনে মানুষের চোখ ভুলাইতে লাগিল আবার ইহার ফলে শিল্প, সাহিত্য, সুকুমার কলার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিল। ষ্টিম ইঞ্জিনের আবিষ্কার ও বয়ন শিল্পে যন্ত্রাদির ব্যবহারের ফলে ছোট ছোট কুটির শিল্পের পরিবর্তে বড় বড় ফ্যাক্টরীতে উৎপাদন-ক্ষমতা প্রচুর বাড়িয়া গেল। সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, আমেরিকা আবিষ্কারের ফলে এই যন্ত্রোৎপাদিত পণ্যের বিরাট বাজার ইংল্যাণ্ডের ধনীসম্প্রদায়ের আয়ত্ত হইল। কোনো যুগে ইংল্যাণ্ড এত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয় নাই। এ ঐশ্বর্যের ছিটে ফোঁটা ভাগ কৃষক ও মজুরও পাইল। কাজেই সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া একটা আরাম ও সন্তুষ্টির আবহাওয়া বহিতে লাগিল।

একটি সুস্থ সভ্য সমাজে শ্রেণীবিভাগ থাকিবে একথা সেকালের মানুষ মানিয়া নিয়াছিল। উচ্চবংশীয়েরা ভাল খাইবেন, পরিবেন, চোখঝলসানো পার্টি দিবেন, কুকুরের দল নিয়া খরগোস আর শিয়াল শিকার করিবেন, মোসাহেব এবং অনুচরদের দ্বারা পরিবৃত থাকিবেন, নিম্নশ্রেণীয়দের মধ্যে আমিরী-মেজাজে কৃপাবিতরণ করিবেন ইহাই স্বাভাবিক ব্যবস্থা বলিয়া মনে করা হইত। ইহার জন্য নিম্নস্তরের মানুষদের মনে যে কোন ক্ষোভ ছিল না, তাহা নয়। দেশে দারিদ্র্যও ছিল, কিন্তু সে দারিদ্র্য তেমন অসহনীয় ছিল না। ধনীরা তাঁহাদের ঐশ্বর্য ভোগ করিবেন কিন্তু তাঁহারা উদার ও দয়াবান হইয়া তাঁহাদের অনুগতদের পোষণ করিবেন, ইহাই সে যুগের আদর্শ ছিল—"The ideal they sustained was the ideal of a polite and polished world

in which men,—men of quality that is, for no others counted—would be ashamed to be cruel or gross or enthusiastic, in which the appointments of life would be spacious and elegant and the fear of ridicule the potent auxiliary of the law in maintaining the decorum and harmonies of life." গিবনের মত চিন্তাশীল ঐতিহাসিকও এই মনে করিয়া সন্তুষ্টি লাভ করিলেন যে ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন সমৃদ্ধিই সভ্যতা বিকাশের শেষ স্তর। অসভ্য বর্বর জাতিদের বিরুদ্ধে সভ্যতা জয়যুক্ত হইয়াছে এবং তাহার অপ্রতিহত উর্ধ্বগতি চলিতেই থাকিবে। তিনি লিখিলেন, we may therefore acquiesce in the pleasing conclusion that the world has increased and still increases the real wealth and happiness, the knowledge and perhaps the virtue of the human race.[2] কিন্তু কি মূল্যে এই সমৃদ্ধি ক্রীত হইয়াছিল? এই শিল্পবিপ্লবের ফলে দ্রুত কলকারখানা ফ্যাক্টরী স্থাপিত হইতে লাগিল। এ সমস্ত ফ্যাক্টরীতে শ্রমিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও মানবোচিত অধিকারের দিকে এতটুকুও দৃষ্টি ছিল না। দ্রুতলব্ধ লাভের লোভে হঠাৎ ফাঁপিয়াওঠা ধনীর দল সস্তায় শ্রমিক নিয়োগ করিতে লাগিলেন, তাহাদের নির্মমভাবে খাটাইতে লাগিলেন। গ্রাম্য সমাজের দারিদ্র্য হইতে মুক্তির আশায়, আর নগদ মজুরীর লোভে সহস্র সহস্র গ্রাম্য কৃষক ও কুটির-শিল্পী ফ্যাক্টরীর পাশে গজাইয়া ওঠা সহরের অস্বাস্থ্যকর এবং দুর্নীতিপূর্ণ বস্তিতে আসিয়া আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিল। গ্রাম্য সমাজের শাসনবন্ধন রহিল না। মজুরী কম দিতে হয়, তাই প্রচুর পরিমাণে অল্পবয়স্ক বালক বালিকা কয়লার খনিতে, কাপড়ের কলে নিযুক্ত হইতে লাগিল। দেহে মনে, নৈতিকধর্মের অভাবে এই শিশুরা পঙ্গু হইয়া গড়িয়া উঠিতে লাগিল। পূর্বেও দরিদ্রের সন্তানেরা অল্প বয়স হইতে পেটের দায়ে রোজগার করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু তখন কৃষকের শিশু তাহার পিতা মাতা ও আত্মীয়দের সাহচর্যেও কাজ করিত। তাড়ন, পীড়ন ছিল, কিন্তু স্নেহও ছিল, আর ছিল

1. H. G. Wells. *History of the world*. vol. II
2. Gibbon. *Decline and Fall of the Roman Empire.*

সংসারের স্নিগ্ধ পরিবেশ। আর যাহারা নানা শিল্পকাজে লাগিত, তাহারা কোন ওস্তাদ শিল্পীর (Master craftsmen) কাছে কাজ শিখিত, (apprentice) তাঁহাদের বাড়ীতেই থাকিত। সেখানে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সত্ত্বেও একটি সামাজিক পরিবেশ হইতে তাহারা দেশের কৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাহাদের খেলার মাঠ ও খোলা নির্মল আকাশ তখনো ফ্যাক্টরীর কালো দানব কাড়িয়া লয় নাই। তাহাদের জীবন কোনদিনই সুখের ছিল না। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের প্রথম দিকে তাহাদের জীবনে যে দুর্গতি ও অভিশাপ নামিয়া আসিয়াছিল তাহার বুঝি তুলনা নাই। *Our Schools* নামে সুলিখিত ক্ষুদ্র পুস্তিকায় Norman Fisher লিখিয়াছেন: By the eighteenth century Great Britain was, in comparison with the rest of Europe, socially united, politically tranquil, outstandingly successful in trade and colonization, and in consequence outstandingly rich."......In the later eighteenth century and the early nineteenth century a series of inventions made it possible to produce large quantities of goods on power-driven machines and to transport the raw materials and finished products to and from the places of production. The steam engine and the big power-driven machines that could not be installed in the worker's cottages were set up in factories near to the sources of coal and water and to the centres of communication. Around the factories sprang up the industrial towns. The country-side......declined in relative importance...... the towns grew with catastrophic and ever-accelerating speed...... They became dense, chaotic and insanitary, not communities but agglomerations of humanity around the centres of production and transport...it was not only that foul and insanitary houses were packed with reckless disregard for the health, morals and well-being of their inhabitants......the new slums were not only squalid,

as many rural villages had been, they were utterly divorced from the countryside. The new factories not only imposed long hours and low wages, common enough before, they imposed a harsh discipline on the worker. For the scanty hours of leisure there was no longer the potato patch and the village green, only the festering tenement and the ginshop. The majority of children no longer grew up under the daily tutelage of parent or master but under the lash of the overseer with a day's work of twelve or sixteen hours for a pittance—their playground not the fields, but the gutters. They no longer learned a trade but the routine skill of tending a machine ; no longer knew a master, but a boss, growing more distant and impersonal as the scale of industry increased. If still not servile, they become resentful and class-conscious."[৩]

দেশের সর্বসাধারণের শিক্ষার অধিকার আছে, এবং শিশুশিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের, একথা তখনো অল্প মানুষের চিন্তায়ই আসিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী বিপ্লব যে নূতন চিন্তাধারায় ইয়োরোপকে প্লাবিত করিয়াছিল তাহার ফলে এবং মণ্টেস্কু (১৮৪৫) ইত্যাদি মনীষীদের চিন্তার ফলে ফ্রান্সে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলি রাষ্ট্রপরিচালনাধীন হইয়াছিল। জার্মানীতেও এ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনের আদর্শে বিশ্বাসী ইংল্যাণ্ডে এ ধারণা বিস্তৃত হইতে বিলম্ব ছিল। ইংল্যাণ্ডের দরিদ্র মানুষও ইহা কখনও পছন্দ করে নাই যে, তাহাদের সাংসারিক ব্যাপারে এবং তাহাদের সন্তানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে। তা ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং উনবিংশ শতাব্দীতেও অনেকদিন পর্যন্ত শিক্ষা বলিতে উচ্চবংশীয় ধনীর দুলালদের শিক্ষাই বুঝাইত। উচ্চতম শিক্ষার কেন্দ্র অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক শিক্ষার কেন্দ্র হ্যারো, ইটন্, ইত্যাদি পাবলিক্ স্কুলের দ্বার দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের জন্য কার্যতঃ বন্ধই ছিল।

---

[৩] Norman Fisher—*Our Schools*. P. 29

ইহা এত ব্যয়সাধ্য ছিল যে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের পক্ষে এ সব বিদ্যালয়ে শিক্ষা-লাভ অসম্ভব ছিল। অবশ্য অত্যন্ত মেধাবী ও কৃতী ছাত্রদের জন্য কিছু বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। রাজা বা রাণীদের পৃষ্ঠপোষকতা থাকিলেও এ বিদ্যালয় সমূহ রাষ্ট্র চালিত নয়। দেশের অভিজাতদের সন্তানেরা যাহাতে ভবিষ্যতে দেশের শাসন পরিচালনায় অভ্যস্ত হইতে পারেন সে জন্য এ সব বিদ্যালয়ে সুব্যবস্থা ছিল। খেলা ধূলা ও আদবকায়দা শিক্ষার উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হইত। আর জোর দেওয়া হইত গ্রীক্ ও ল্যাটিন শিক্ষার উপর। শিক্ষার পাঠ্যবিষয় সংকীর্ণ ছিল। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সহিত এই বিদ্যালয় সমূহ সঙ্গতি রাখিয়া চলিতেছিল না। প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গীই প্রবল ছিল। তবে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ শিক্ষা-মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে তাহাদের সংকীর্ণ আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষাকার্য নিষ্ঠার সঙ্গেই পরিচালিত হইত এবং এই সব বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ভবিষ্যতে নানা ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একদিকে অভিজাতদের শিক্ষার জন্য এত ব্যয় ও উপকরণবাহুল্য, অন্যদিকে শিশুশিক্ষা ও জনসাধারণের শিক্ষার ক্ষেত্রে ছিল চরম অবহেলা। ধর্মীয় সংস্থা ও ভূম্যধিকারী ধনী ব্যক্তিরা দয়া করিয়া যে সামান্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন তাহা ছিল যেমনি অপ্রচুর, তেমনি নিকৃষ্ট ও নিরানন্দময়।

অল্প শিক্ষিত শিক্ষিকার বিদ্যালয়ে (Dame School) দরিদ্রের সন্তানেরা সামান্য লেখা, পড়া ও অঙ্ক (3 R's) শিখিবে এবং রবিবারের বিদ্যালয়ে (Sunday School) বাইবেল হইতে কিছু ধর্ম শিক্ষা করিবে, ইহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। দরিদ্রের সন্তানেরা উচ্চশিক্ষা লাভ করিবে ইহা সমাজের কর্তারাও পছন্দ করিতেন না, ধর্মযাজকগণ ও (Church) ইহা পছন্দ করিতেন না। রাষ্ট্রের প্রধান রাজরাজরারা দরিদ্রের উচ্চশিক্ষাকে বিপ্লব ও উচ্ছৃংখলতার কারণ বলিয়াই মনে করিতেন। ফরাসী বিপ্লবের পরে তাঁহাদের মধ্যে এই মনোভাব আরো প্রবল হইয়াছিল। পোপের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া যে সংস্কার আন্দোলন (Reformation) সুরু হইয়াছিল ইংল্যাণ্ডে অষ্টম হেন্‌রী নিতান্তই ব্যক্তিগত স্বার্থে তাহার সুযোগ লইয়া রোমান্ ক্যাথলিকদের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিলেন ইহার ফলে ইংল্যাণ্ডে শিক্ষার সংকোচই ঘটিল। H. G. Wells-এর মতে

"The Reformation, the Reformation that succeeded, the Reformation that is of the Princes, by breaking up educational facilities largely destroyed the poor scholar and priest class whose persuasion of the crowd had rendered the Reformation possible.

The Princes of the Protestant countries when they seized upon the national churches, early apprehended the necessity of gripping the universities also. Their idea of education was the idea of capturing young clever people for the service of their betters. Beyond that, they were disposed to regard education as a mischievous thing."[8]

ইংল্যাণ্ডে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দ্বিজাতিতত্ত্বের (the two nations) কু-ব্যবস্থা আজও সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই। একদিকে ধনীর সন্তানদের জন্য ব্যয়-বহুল উপকরণবহুল উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা সুশিক্ষার আয়োজন, আর অন্যদিকে দরিদ্রের শিশুদের শিক্ষার প্রতি প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা। দেশের উচ্চ ও নীচের মধ্যে এই প্রভেদ অষ্টাদশ শতাব্দীতেই সর্বাধিক প্রকট হইয়াছিল। Lester Smith তাঁর *Education in Great Britain* পুস্তকে লিখিয়াছেন: "the nation was never more sharply divided educationally than in the eighteenth century, and much as we may admire the splendour of its civilization it is impossible to forget that it was associated with a lamentable amount of off-stage misery, of which childhood bore an ample share. The literature, the salons, the vast country mansions, Capability Brown's gardens, the Adam's fire-places, the Sheraton furniture, the portraits and the paintings, the grand tour, the oratory enriched by classical quotations, the Kit-cat Club—all these and other manifesta-

[8] H. G. Wells, *Outline of History*—Vol II P. 540.

tions of art, wit and elegance would not have been possible without the grudging service of a large helot class, many of whose children were reared from infancy in an atmosphere of toil and misery. "Scarce anything above four years old," says Defoe, "but its hands were sufficient for its own support"[৫] একটি সভ্য এবং ক্রমসমৃদ্ধিশীল জাতির পক্ষে সামান্য মুষ্টিমেয় কয়জন সুশিক্ষিত হইবেন আর দেশের অগণিত বিপুল জনসাধারণ শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া মূর্খ হইয়া থাকিবে এই অবস্থা যে বিষম দুর্লক্ষণ তাহা হৃদয়বান্ ও বুদ্ধিমান্ Adam Smith বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *Wealth of Nations*-এ (১৭৭৮) জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জনসাধারণের শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে জনমত তখনই সচেতন হইয়া ওঠে নাই। যদিও দরিদ্রের শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু কিছু চেষ্টা তখন হইতে সুরু হইল তথাপি ১৮০৭ সালে Samuel Whitboead যখন ধর্মীয় সংস্থার পরিচালনায় সরকারী ব্যয়ে প্রত্যেক Parish-এ একটি করিয়া শিশু বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন (Parochial School Bill) তখন পার্লামেন্ট এ প্রস্তাব নাকচ করিয়া দেন। এমন কি সরকারী কর্তৃত্ব সম্বন্ধে শ্রমিকদের মনে এমনি গভীর বিরূপতা ছিল যে তাহাদের শিশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রস্তাবকে অনেকদিন পর্যন্ত তাহারা 'ইহা বড়লোকদের গরীবদের ব্যাপারে "ফোঁকর দালালি" করিবার চেষ্টা' মনে করিয়া ইহার বিরুদ্ধতা করিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে সর্বসাধারণের শিক্ষার জন্য ব্যাপকভাবে শিশু বিদ্যালয় স্থাপন সুরু হয় নাই। Adamson লিখিয়াছেন: "whereas the continental liberals regarded education as a legitimate public service like that of military defence or the administration of justice, a service whose cost and advantages were shared by all citizens, the majority of responsible Englishmen down to 1870 thought

---

৫ W. O. Lester Smith—*Education in Great Britain*, P. 76.

of education as a gift conferred by the well-to-do and by the country upon the labouring poor."

উনবিংশ শতাব্দী হইতে দেশের ধনীসম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থেই শিশুশিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন। যন্ত্র চালনা করিতে হইলে কিছুটা পরিমাণ বুদ্ধির বিকাশ প্রয়োজন এবং সেই জন্যই লেখাপড়া দরকার। দেশের শিল্প-বহুল কুশ্রী সহরগুলিতে শিশুরা যে অস্বাস্থ্যকর ও দুর্নীতিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে শিক্ষা ও সদাচার ব্যতিরেকে অমানুষ হইয়া উঠিতেছিল তাহাতে চিন্তাশীল ও সহৃদয় মানুষেরা চিন্তিত হইয়া উঠিতেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যে দরিদ্র জনগণের দুঃখের কথা Defoe (১৬৫৯-১৭৩১) Fielding (১৭০৭-৫৪) ও Goldsmith (১৭২৮-৭৪) অত্যন্ত দরদের সঙ্গে অঙ্কন করিয়াছেন।

এই সময় হইতেই ইংল্যাণ্ডে সমাজসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা যায়। ফ্যাক্টরীগুলিতে শ্রমিকদের প্রতি যে অমানুষিক ব্যবহার করা হইত, বিশেষ করিয়া শিশু শ্রমিকদের যেমন নির্মমভাবে খাটানো হইত এবং তাহাদের উপর যে উৎপীড়ন হইত তাহাতে দেশের জনসাধারণ ক্রমশঃ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। দেশের হৃদয়বান শিক্ষিত মানুষেরাও ইহার প্রতিকারের জন্য আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ১৮০২ সালে প্রথম ফ্যাক্টরী আইন পার্লামেণ্টে পাশ হয়। তাহাতে শিশুদের রাত্রিকালে ফ্যাক্টরী বা খনিতে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ হয়। তাহার পর হইতে শ্রমিক ও শিশুদের অবস্থা উন্নয়নের চেষ্টা চলিতে থাকে এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য-রক্ষা ও শিক্ষার দায়িত্ব ক্রমশঃ খনি ও ফ্যাক্টরী মালিকদের উপর চাপানো হইতে থাকে। যাহারা মালিকদের লুব্ধতা ও হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে দরিদ্র শ্রমিকদের অধিকারের জন্য তাহাদের চিন্তা, বক্তৃতা ও লেখার মধ্য দিয়া লড়াই করিয়াছিলেন—তাহাদের মধ্যে John Stuart Mill, Carlyle, Newman ও Dickens-এর নাম ইংল্যাণ্ডের এবং পৃথিবীর শ্রমিক সমাজ চিরদিন পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিবে।

এই সমাজসংস্কারের সূত্রেই শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথা উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের মানুষেরা বুঝিতে পারেন। সমাজের দুর্নীতি

দূর করিতে হইলে, দক্ষ শ্রমিক তৈরী করিতে হইলে, বুদ্ধিমান নাগরিক তৈরী করিতে হইলে এবং সুস্থ সমাজের প্রধান অবলম্বন সৎ মানুষ সৃষ্টি করিতে হইলে, দেশব্যাপী মানুষকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, এ কথাটি অস্পষ্টভাবে হইলেও তখন হইতে মানুষ বুঝিতে শিখিল। নাগরিক অধিকার ক্রমশঃ সর্বসাধারণেও বিস্তৃত করিয়া দিতে হইবে, এ দাবী তখন হইতেই উচ্চারিত হইতে ছিল। ১৮৩২ সালের Reforms Act-এর দ্বারা সম্পত্তির অধিকারী মাত্রই ভোটের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ একটি অনতিবৃহৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজনৈতিক অধিকারের স্বাদ পাইয়াছিল। ইহা বুঝিতে পারা গিয়াছিল ধনী ও মধ্যবিত্তদের বাধা সত্ত্বেও সম্পত্তিহীন শ্রমিকও অদূরভবিষ্যতে এ অধিকার লাভ করিবেই। বাস্তবিক পক্ষে ১৮৬৭ সনে আদর্শবাদী Disraeli দেশের হিতের জন্য, ইহার ফলে সম্ভবতঃ নিজ টোরী দলের হাত হইতে রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুত হইবে, ইহা জানিয়াও, সহরের প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের ভোটের অধিকার দান করিয়াছিলেন। তখন শ্রমিকদের শিক্ষার প্রতি কতকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেই যেন রক্ষণশীল রাজনীতিবিদদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তাঁহারা বুঝিলেন ভোটের অধিকারপ্রাপ্ত শ্রমিক প্রভুদের এখন হইতে সুশিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে দেশ রসাতলে যাইবে……'in 1867 Disraeli caught the Whigs bathing, and ran away with their clothes in the form of a Franchise Act which gave the vote to the working men of the towns, whereupon it was agreed without enthusiasm that we must now at least educate our masters.'

দরিদ্র ঘরের কিশোর ও যুবকদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা যে নিতান্ত প্রয়োজন তাহা আর এক কারণেও ইংল্যাণ্ডের লোক বুঝিতে পারে। ইংল্যাণ্ড নানা যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িতেছিল এবং সৈন্যসংগ্রহকালে ইহা দেখা যাইতে লাগিল অধিকাংশ যুবক দেহের দিক হইতে অপুষ্ট ও রুগ্ন এবং মানসিক দিক হইতে অপরিণত। কিন্তু বর্তমান কালের যান্ত্রিক যুদ্ধের পক্ষে স্বাস্থ্যহীন ও বুদ্ধিহীন সৈনিক নিতান্ত অনুপযুক্ত। তাই দেশের কিশোর ও যুবকদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা যে নিতান্তই প্রয়োজন ইহা বুঝা যাইতে লাগিল। এজন্য অনুসন্ধান ও প্রতিকারের জন্য কমিটি গঠিত হয়। ১৮৪৫ সালে প্রথম

Public Health Act পাশ হয়। স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রথম সেক্রেটারী Edwin Chadwick এ বিষয়ে যথেষ্ট তৎপরতা দেখান। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। ১৮৬১ সালে তিনি লিখিয়াছিলেন: A special Sanitary Service applicable to schools is needed for the correction of common evils of their construction and the protection of the health of the children therein." তখন তাঁহার উপদেশে বেশী লোকে কর্ণপাত করে নাই। বুয়র যুদ্ধের সময় এ প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয় এবং ক্রমশঃ বিদ্যালয়ে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য চেষ্টা চলিতে থাকে। ১৯০৭ সালে National Health Service ব্যবস্থা প্রচলিত হয়।

এই উপলক্ষে আর একজন Civil Servant-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি শিক্ষাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রথম সেক্রেটারী Kay-Shuttle worth। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যাণ্ডে শিক্ষার বিস্তার ও সংস্কারের জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা জগতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার কার্যের প্রশংসা করিতে গিয়া Mr. G. M. Young লিখিয়াছেন: that the late Victorian democracy was not altogether unfit for its responsibilities was in the main the work of one man, and if history judged men less by the noise than by the difference they make, it is hard to think of any name in the Victorian age which deserves to stand above or even beside Kay-Shuttleworth's.

ক্রমশঃ এবং ধীরে ধীরে শিক্ষার বিস্তার ও সংস্কারের চেষ্টা চলিতে থাকে নানা কমিশন গঠিত হয় এবং নানা বিতর্কও উত্থিত হয়। দুটি বিষয়েই বিশেষভাবে বিতর্ক বেশী হয় (১) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয় (২) বিভিন্ন ধর্মমতবাদ শিক্ষাদান।

তখন ইন্‌কাম্ ট্যাক্স-এর হার বাড়াইয়া পাউণ্ডে ১ শিলিং করা হয় এবং ধনী ও ব্যবসায়ীরা ইহা নিয়া খুব আপত্তি করিতে থাকেন। তাহা ছাড়া ক্রীমিয়ার যুদ্ধের ব্যয়ে ইংল্যাণ্ড ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। ইংল্যাণ্ডে শিক্ষার জন্য

সরকারী ব্যয় বৎসরে ২০,০০০ পাউণ্ড হইতে বাড়িয়া ১০ লক্ষ পাউণ্ডে পৌঁছিবে কর্তৃপক্ষের মনে এমন আশঙ্কা দেখা দেয়। সুতরাং ১৮৫৮ সালে "দেশে সাধারণ শিক্ষার অবস্থা এবং স্বল্পব্যয়ে সুষ্ঠু প্রাথমিক শিক্ষার সম্বন্ধে বিবেচনা ও উপায় নির্দেশের জন্য" Newcastle Commission গঠিত হয়। ১৮৬১ সালে তাঁহাদের রিপোর্টে এই সুপারিশ করা হয় যে (১) সরকার প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ না করিলেও ধর্মীয় সংস্থাগুলিকে এ ব্যাপারে সীমাবদ্ধ আর্থিক সাহায্য দান করিবেন। (২) ছাত্রদের পরীক্ষার ফলের উপরই প্রত্যেক বিদ্যালয়ের আর্থিক সাহায্য ও তাহার পরিমাণ নির্ভর করিবে। এই দ্বিতীয় দুষ্টনীতির ফল হইল এই যে অনেক বিদ্যালয়ের সাহায্য বন্ধ হওয়ায় সেগুলি উঠিয়া গেল। ইহাতে বাস্তবিক পক্ষে শিক্ষার সঙ্কোচই ঘটিল। কার্লাইল ইতিপূর্বে 'মেহনতী মানুষ' (Drudges)-এর পক্ষ হইয়া লড়াই করিয়াছিলেন এবং ইহাই দাবী করিয়াছিলেন যে, যাহারা গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়ান (Dandies) তাহাদের সন্তানদের মত মেহনতী মানুষের সন্তানদেরও সুশিক্ষার অধিকার রহিয়াছে। শোষণকারী ধনীর (Mr. Gadgrinds) স্বার্থেই এমন অন্যায় কার্পণ্য প্রদর্শন করা হইতেছে এজন্য চার্লস্ ডিকেন্স তাঁহার Bleak House-এ ধনীদের মুখোস খুলিয়া দিলেন : "He hated the Mr. Gadgrinds who denied drudgism the decencies of education and in his inimitable way showed them up in their true colours as hard-hearted bullies of the desolate and oppressed।" ক্রমশঃই দেশের জনসাধারণের শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে দাবী প্রবলতর হইতে লাগিল। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক, সর্বব্যাপী ও সরকারী দায়িত্বে (State-controlled, free and universal) হওয়া উচিত, J. S. Mill এই মত প্রচার করিয়া দেশের জনমতকে জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিলেন। সরকারী শিক্ষা পরিদর্শক (H. M. I.) সাহিত্যিক Matthew Arnold ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া এই মত সমর্থন করেন, অবশ্য তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার উপদেশ দিয়াছিলেন এবং সামান্য মাহিনা রাখা অনুচিত মনে করেন নাই।

১৮৬৩ সালে প্রাচীনপন্থী (Tory) ডিস্‌রেলী অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়া (Leap

in the dark) সহরের শ্রমিকদেরও ভোটাধিকার দিয়াছিলেন ইহা বলা হইয়াছে। প্রাচীনপন্থী টোরীদল, শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকার অধিকতর ব্যয় করিবেন, ইহার বিরোধী ছিলেন কিন্তু দেশের জাগ্রত জনমত ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল।

পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন (General Election)-এ টোরীদল পরাজিত হইলেন এবং সংস্কারপন্থী হুইগ্ (Whig) দল Gladstone-এর নেতৃত্বে পার্লামেন্টে জয়লাভ করিলেন। মন্ত্রী (Chancellor of the Exchequer) Forster-এর সহযোগিতায় Gladstone বিষম বাধা সত্ত্বেও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রথম Education Act পাশ করেন। ইহাতে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব প্রথম স্বীকৃত হইল। ধর্মীয় সংস্থাগুলি (তাহাদেরই চেষ্টায় এ পর্যন্ত অধিকাংশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল এবং পরিচালিত হইতেছিল) শিক্ষাকে সরকারী আয়ত্বাধীনকরণ (Secularisation of education)-এর বিরুদ্ধে প্রবল বাধা উত্থাপন করেন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বিশ্বাসী অনেক সংস্কারপন্থীও নীতিহিসাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন। তাহা ছাড়া এই সব বিদ্যালয়ে কি প্রকার ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা নিয়াও তুমুল কলহ হইল। যাহা হউক, বিবেকের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া (conscience clause) বিরোধী ধর্মসংস্থাগুলির মধ্যে একটা আপোষ হইল। এই আইনের ফলে স্থানীয় শিক্ষাবোর্ড (স্থানীয় প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত) স্থাপনের ব্যবস্থা হইল। তাঁহাদের উপর সরকারী কর্তৃত্বাধীনে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্ব ও উহার ব্যয় নির্বাহের জন্য মাথাপ্রতি ৩ পেন্স হারে কর ধার্য (local rates) করিবার অধিকার দেওয়া হইল। ইংল্যাণ্ডে জনসাধারণের শিক্ষার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রথম স্বীকৃত হইল। শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি খণ্ড বিপ্লব ঘটিয়া গেল—"a minor revolution had taken place: democracy was on the march"। ইহার মূল্য সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ্ Professor Trevelyan লিখিয়াছেন: "England had obtained, late than never, a system of education without which she must soon have fallen to the rear among modern nations. A school had

been placed within the reach of every child at a very low charge and the local authority might, if it wished, make attendance cumpulsory.[৬] বাস্তবিকপক্ষে ১৮৮০ সালে ইংল্যাণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইল। ১৮৭০ হইতে ১৮৯০ সালের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা দ্বিগুণ হইল। ১৮৯১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হইল।

১৮৭০ সালের Education Act-এর ফল যে দেশের শিক্ষাবিস্তারের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল তাহা নীচের কয়েকটি সংখ্যা হইতেই বুঝা যাইবে। পঁচিশ বৎসরের মধ্যে ৫২৬০টি নূতন বোর্ডস্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। ধর্মীয় সংস্থা(Churches)গুলিও নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা দ্বারা ৫৬৮১টি নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। রোম্যান ক্যাথলিকেরাও পিছনে রহিলেন না। তাঁহারাও অনেক নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। পূর্বে তাঁহাদের স্থাপিত ৩৫০টি বিদ্যালয় সরকারী সাহায্য পাইত, তাহা বাড়িয়া সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা এক হাজারের উপরে দাঁড়াইল। ১৮৯৯ সালে গঠিত Education Board খুব ভাল কাজ করিতেছিল না। তাহাদের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে Arthur Balfour-এর রক্ষণশীল গবর্ণমেণ্ট নূতন এক শিক্ষা আইন (Education Act 1902) প্রণয়ন করিলেন। Education Board উঠাইয়া দেওয়া হইল। স্থানীয় স্কুল বোর্ডের পরিবর্তে County এবং County Borough Councils নূতন করিয়া গঠন করিয়া অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক করা হইল। সরকারী কর্তৃত্বের বাহিরে ধর্মীয় সংস্থা দ্বারা স্থাপিত বিদ্যালয়গুলিও এই আইন অনুসারে স্থানীয় রেট্ হইতে সাহায্যের অধিকারী হইল।

তুমুল বিতর্কের পর এবং সংস্কারপন্থীদের (Liberal) প্রবল বাধা সত্ত্বেও এ বিল পাশ হইল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৮ সালে আর একবার শিক্ষা আইনের সংস্কার (Education Act 1918) হয়। কিন্তু অর্থাভাবে এ

---

৬ G. M. Trevelyan—*English Social History.*

বিলের নির্দেশ অনুযায়ী শিক্ষা-সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের কাজ যথোচিত ভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তবে এ সমস্ত আইনের ফল ইংল্যাণ্ডের পক্ষে শুভ হইয়াছে। দেশের জনসাধারণের শিক্ষার প্রতি পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী মনোযোগ দেওয়া হইতেছে, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় বহুগুণ বাড়িয়াছে, শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক হওয়ায় এবং বিদ্যালয়ে শিশুদের নানাভাবে সাহায্যের ব্যবস্থা হওয়াতে দরিদ্র ও শ্রমিকদের সন্তানেরাও ধনীর সন্তানদের মত উন্নত প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাইয়াছে। এবং শিক্ষা ক্রমশঃই ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত হইয়া রাষ্ট্রায়ত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন (Education Act 1944) সমস্ত রাজনৈতিক দল ও ধর্মীয় সংস্থাদের সম্মতি অনুসারে এবং সমবেত চেষ্টায় গঠিত হইয়াছে। ইহাই ইংল্যাণ্ডের বর্তমান শিক্ষাবিধি। ইহা দ্বারা দেশের উচ্চতম হইতে প্রাথমিক, পুস্তকভিত্তিক (academic) শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা সামগ্রিক একটি সুবিন্যস্ত প্ল্যানে গ্রথিত করা হয় ও রাষ্ট্র-পরিচালনাধীন করা হয় এবং এই আইনে দেশের কিশোরদের মাধ্যমিক শিক্ষার (Secondary Education) দায়িত্বও রাষ্ট্র স্বীকার করিয়া নেয়। ধীরে ধীরে বহু আন্দোলনের জন্য এবং বহু বাধা বিপত্তি সত্ত্বে দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের সন্তানদের পক্ষেও সমস্ত শিক্ষালয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে।[৭]

---

[৭] Barnard—*Short History of English Education.*

ইংল্যাণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষায় ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনের প্রভাব

১৯৪৪ সালের শিক্ষা-আইন ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক ও সুদূরপ্রসারী সংস্কার। এই আইনের দ্বারা ইংল্যাণ্ডের সরকার ১১ বৎসরের উপরে প্রত্যেক বালক বালিকার মাধ্যমিক শিক্ষার ভার লইলেন। ইতিপূর্বে জনসংখ্যার সামান্য অংশই মাধ্যমিক শিক্ষার অধিকার পাইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৪ সালের আইনে স্বীকার করা হইল যে, দেশের প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীর মাধ্যমিক শিক্ষায় অধিকার রহিয়াছে—Secondary Education is to be the right of all, and no longer the privilege of a few.

১৯৪৪ সালের পূর্বে Secondary School বলিতে বুঝাইত এমন কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে কেবল ধনীর সন্তান এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছাত্রদেরই প্রবেশাধিকার ছিল। এ বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র নেওয়া হইত কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা বাছাই করিয়া। অন্যান্য সাধারণ বিদ্যালয়ের তুলনায় এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষিত এবং উচ্চবেতনপ্রাপ্ত শিক্ষক, মূল্যবান এবং সুদৃশ্য বিদ্যালয় গৃহ এবং শিক্ষাসরঞ্জাম এবং অল্পসংখ্যক ছাত্র নিয়া শ্রেণী গঠনের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৪৪ সালের আইনের দ্বারা এই ধরণের বিশিষ্ট বিদ্যালয়গুলির দ্বার সর্বসাধারণ ছাত্রের জন্য যে উন্মুক্ত হইল তাহা নহে। এই ধরণের বিশিষ্ট বিদ্যালয়গুলি পূর্বের ন্যায় ধনী ও তীক্ষ্ণধী ছাত্রদের জন্য চলিতে থাকিবে। কিন্তু দেশের সমস্ত ছাত্র ছাত্রীকে (১১ বৎসরের উপর) তাহাদের যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের সরকারী এবং অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা হইল। ইহা সরকারী দায়িত্ব বলিয়া আইনতঃ স্বীকৃত হইল। পূর্বে সাধারণ বিদ্যালয়গুলির গৃহ বা সরঞ্জাম যে মানের ছিল সরকারী নূতন বিদ্যালয়গুলিতে তার চেয়ে অনেক উঁচু মানের গৃহ বা সরঞ্জামের ব্যবস্থা হইল। সমস্ত সরকারী বিদ্যালয়গুলির জন্য বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং উচ্চ বেতনপ্রাপ্ত শিক্ষকের ব্যবস্থাও হইল। এবং যদিও মাধ্যমিক শিক্ষার নানাপ্রকার বিদ্যালয় স্থাপন

করা হইল, সবগুলি বিদ্যালয়ের পিছনে সরকার সমান অর্থ ব্যয় করিয়া সবগুলিতেই একই ধরণের উঁচু মান প্রবর্তন করিলেন। সবগুলি বিদ্যালয়েই ছাত্র ছাত্রীদের শারীরিক মানসিক ও আর্থিক বিকাশ, শিক্ষা ও আনন্দ বিতরণের সমান ব্যবস্থা হইল। These (schools) will be State-managed and will have the same kind of building and the same kind of amenities. They will enjoy the same holidays and enjoy the same games. In all these schools the studies will be related to the abilities and aptitudes of pupils. The maximum size of classes will be the same for all. এই বিদ্যালয়গুলির বিভিন্নতার সহিত সামাজিক মর্যাদার কোন সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ "ছোটলোক"দের ছেলের জন্য হাতের কাজ শিখাইবার বিদ্যালয় আর "বড়লোক"দের ছেলের জন্য সাহিত্যপ্রধান বিদ্যালয় এমন নহে। সরকার সবগুলি বিদ্যালয়কেই সমান মর্যাদা দিবেন। ছাত্রদের মানসিক বা শারীরিক শক্তি ও রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত ইংল্যাণ্ডে এই আইন অনুযায়ী সর্বত্রই বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ চলিতেছে। বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং আরও বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। পুরাতন বে-সরকারী বিদ্যালয়গুলিও এই আইন অনুযায়ী একটা ন্যূনতম উচ্চমান অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য। প্রয়োজন হইলে মান অনুযায়ী তাহাদের উন্নতির জন্য সরকার আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য করিবেন। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি একমত হইয়া এই আইন প্রণয়ন করিয়াছেন—কাজেই একটা সুনির্দিষ্ট উন্নত Plan অনুযায়ী ইংল্যাণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশঃই অগ্রসর হইবে—এবং অদূরভবিষ্যতেই ইহার সুফল জাতি ভোগ করিবে। জাতির শিক্ষাকে ইংল্যাণ্ড কতটা মর্যাদা দান করে এবং ইহাকে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এই Education Act 1944 তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ১৮৭০ সালের শিক্ষা আইনের দ্বারা সমগ্র দেশকে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার দায়িত্ব সরকার নিয়াছিলেন। ১৯৪৪-এর আইনে সমগ্র জাতির কিশোরদের শিক্ষা আর এক স্তর পর্যন্ত উন্নীত করিবার ভার সরকার গ্রহণ করিলেন।

১৯৪৪-এর পূর্ব পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত শিক্ষাদান সরকারের একটা অবশ্য কর্তব্য এরকম ধারণা ইংল্যাণ্ডে (সমস্ত ইউরোপেই) ছিল না। বড়লোকদের ছেলেদের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল—কারণ তাহারাই ভবিষ্যতে দেশ শাসন করিবে। এই বড়লোকের ছেলেদের জন্য কয়েকটি বিদ্যালয় ধনীদের দানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিও বহুদিন পূর্ব হইতেই দেশে শিক্ষা বিস্তারের সামান্য ভার নিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিতে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের শিক্ষা ব্যবস্থা থাকিলেও দেশে সর্বসাধারণের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় নাই, তাই দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ছাত্রের সংখ্যা সামান্যই ছিল। বরং দরিদ্র লোকদের মনে শিক্ষার প্রতি একটা বিরুদ্ধ ভাবই ছিল। এবং দেশের চিন্তাশীল লোকদের মধ্যেও অনেকে মনে করিতেন—শিক্ষার সুযোগ পাইলে সাধারণ মানুষ ধর্মে অবিশ্বাসী ও নাস্তিক হইয়া পড়িবে। "It would enable the labouring classes to read seditious pamphlets, vicious books and publications against Christianity." কিন্তু ইংল্যাণ্ডে Industrial Revolution-এর পর হইতে রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক কারণেই শিশু ও কিশোরদের অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা (the three R's—Reading 'Riting and 'Rithmatic) দিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতে লাগিল। ১৮০২-এর ফ্যাক্টরী আইনের বিধানে দেখা যায় যে, কাপড়ের কলের মালিকদের তাহাদের কলে ৬ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক কিশোরদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ১৮৩৩ ও ১৮৬৭-এর ফ্যাক্টরী আইন এবং ১৮৯০ সালের মাইন আইনেও অনুরূপ বিধান আরও ব্যাপকভাবে রহিয়াছে। যাহা হউক ধনীদের বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির বা ফ্যাক্টরীর মালিকদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি সম্পূর্ণ "স্বাধীন" ছিল, তাহাদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা প্রায় ছিল না। প্রথম শিক্ষা আইন পাশ হয় ১৮৭০ সালে এবং তখন হইতেই সরকার দেশের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই আইন অনুসারে সমস্ত দেশ জরীপ করিয়া শিক্ষার জন্য কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেকটি অঞ্চল এক একটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আসে। এই বোর্ডের ক্ষমতা ছিল তাহাদের অঞ্চলের

পাঁচ বৎসর হইতে দশ বৎসর বয়সের সমস্ত ছেলে মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠানো বাধ্যতামূলক করা এবং ১৩ বৎসর পর্যন্ত, প্রয়োজন হইলে, বিদ্যালয়ে তাহাদের আটকাইয়া রাখা—"It empowered School Boards for making attendance in schools compulsory, between the ages of five and ten, with power to retain the children till thirteen."

১৯০২-এর শিক্ষা-আইন এবিষয়ে আরও একধাপ অগ্রসর হইল। স্কুল বোর্ডগুলির স্থানে Local Education Authorities প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহাদের হাতে সর্বপ্রকার শিক্ষার ভার দেওয়া হইল এবং যে সমস্ত Secondary Schools ছিল সেইগুলি (Public School বাদে—যেমন Eton. Harrow, Rugby ইত্যাদি ; এই বিদ্যালয়গুলি ধনীদের ছেলেদের জন্য ধনীদের অর্থে স্থাপিত 'স্বাধীন' আবাসিক বিদ্যালয় ও তাহাদের) Local Education Act-এর আওতায় আনা হইল।

১৯৩৬ সালের শিক্ষা আইনে বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স ১৫ বৎসর করা হইয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধ লাগিয়া যাওয়ায় এসমস্ত সংস্কারমূলক কার্য বন্ধ থাকে। যুদ্ধের সময়ে বহু বিদ্যালয় বিধ্বস্ত হইয়া যায় অথবা যুদ্ধের প্রয়োজনে সরকারী কাজে লাগাইতে হয় এবং বড় বড় Industrial Town-এর বিদ্যালয়গুলিকে বাধ্য হইয়া সুদূর গ্রামদেশের অভ্যন্তরে সরাইয়া লইতে হয়। সেই বিশৃঙ্খল অবস্থায় শিক্ষাব্যবস্থাকে কোন প্রকারে টিকাইয়া রাখাই ইংল্যাণ্ডের পক্ষে প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং নূতন সংস্কারের কথা তখন চিন্তাই করা যায় নাই। এটা ইংল্যাণ্ডের জাতীয় চরিত্রের পরম গৌরবের সাক্ষ্য যে, এই বিষম বিপদের মধ্যেও জাতি তাহার শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বপ্রযত্নে আগলাইয়া রাখিয়াছে। যাহা হউক, যুদ্ধের অবসান হইলেই দেশের রাজনৈতিক দলগুলি একত্র হইয়া নূতন করিয়া ইংল্যাণ্ডের শিক্ষার কাঠামো ঢালিয়া সাজাইলেন। তাহারই নাম হইল ১৯৪৪-এর শিক্ষা আইন।

১৯৪৪ সাল পর্যন্ত, আগে যাকে Secondary Schools বলা হইয়াছে, তাহার পাশাপাশি আরো কতগুলি বিদ্যালয়ও ছিল প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার জন্য। যেমন,—Junior, Technical, Commercial এবং Art Schools. ১৯৩৮ সালের হিসাবে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের ১১ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর

বয়স্ক ছাত্র সংখ্যার মোট ৮ জনের মধ্যে একজনেরও কম পড়ে Secondary School-গুলিতে, মোট ২০০ জনের মধ্যে একজনেরও কম পড়ে অন্যান্য বিদ্যালয়গুলিতে—অর্থাৎ মোট ছাত্র সংখ্যার বৃহত্তম অংশই পড়ে Elementary School-গুলিতে। অবশ্য ১৯০০ সালে Elementary School-গুলিতেও উচ্চতর শিক্ষার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল—এগুলিকে বলা হইত Higher Elementary Schools. কিন্তু ১৯১৭ সাল পর্যন্ত দেখা যায় ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস্ মিলাইয়া এ রকম বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫০-এরও কম। অবশ্য এই জাতীয় বিদ্যালয়, যাদের নাম ছিল Central School কোন কোন জায়গায় Local Education Authority-রা স্থাপন করিয়াছিলেন—যেমন লণ্ডনের Central School স্থাপিত হয় ১৯১১ সালে। ১৯১৮ সালের শিক্ষা আইনে একটু বয়স্ক এবং বেশী বুদ্ধিমান ছাত্রদের জন্য Elementary School-গুলির মধ্যেই উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে উৎসাহ দেওয়া হইল। "The Education Act of 1918 encouraged the tendency to experiment in postprimary education by requiring authorities to provide course of advanced instruction for the older or more intelligent children, in attendance at primary schools including children who stay at such schools beyond the age of 14." এই আইনের ফলে দেশের কোন কোন অঞ্চলে কতগুলি Senior School খোলা হইল। এই বিদ্যালয়গুলিতে আশে পাশের সমস্ত Elementary School-এর ছাত্ররা ১১ বৎসর পার হইলে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভর্তি হইত। Local Education Authority সমূহ এইসব স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ইহাতে দেশের উচ্চতর শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৯২৫ সালে দেখা যায় Elementary School-গুলির ১১ বৎসরের উপর বয়সের ছাত্রদের মোট ১৮ জনের মধ্যে ১১ জন ছাত্রছাত্রীই এই প্রকারের Advanced courses শিক্ষাদানের ব্যবস্থাসম্পন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিত।

১৯২৬ সালে Hadow Report প্রকাশিত হয়। এর ফলে ১১ বৎসরের উপরের ছাত্রদের শিক্ষার জন্য Elementary School-গুলি হইতে

পৃথক বিদ্যালয় স্থাপনের অধিকতর চেষ্টা দেখা যায়। Hadow Report যে সব মূল্যবান পরামর্শ (Recommendations) দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঃ

(ক) ১১ বৎসরের উপরের ছাত্রদের শিক্ষা Secondary Education নামে অভিহিত হইবে।

(খ) বিভিন্ন প্রকারের ছাত্রদের বিভিন্ন মানসিক বিকাশ, রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের Secondary School স্থাপন করিতে হইবে।

(গ) ১২ হইতে ১৩ বৎসরের মধ্যে কোন ছাত্র এক জাতীয় Secondary School হইতে অন্য জাতীয় Secondary School-এ ভর্তি হইতে পারিবে। এসব ক্ষেত্রে কেবল ইহাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, এই প্রকার বিদ্যালয় পরিবর্তন (transfer) দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে অধিকতর উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

(ঘ) এই Hadow Report-এর ফলে এবং Board of Education-এর উৎসাহে এবং সাহায্যে ১৯২৬ হইতে ১৯৩৮ পর্যন্ত ১৩ বৎসর ইংল্যাণ্ডে এবং ওয়েলস-এ মাধ্যমিক শিক্ষার বহু প্রসার ঘটিল এবং তাহার মানেরও উন্নতি ঘটিল। বহু Central এবং Senior School আলাদা বা Elementary School-গুলির সহিত সংযুক্তভাবে স্থাপিত হইল। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ সুরু হওয়াতে উন্নতির পথে জাতি বাধাপ্রাপ্ত হইল।

কিন্তু যুদ্ধ ছাড়াও, এ পর্যন্ত সমগ্র জাতির প্রয়োজনের ভিত্তিতে একই উচ্চমানের (the same high uniform standard) শিক্ষা সংস্কারের পথে কতকগুলি বাধা ছিল।

প্রথমতঃ অর্থনৈতিক অসুবিধা—দেশের সব অঞ্চল সমান সমৃদ্ধ নয়। কাজেই কোন কোন অঞ্চলের Local Education Authority (সংক্ষেপে L.E.A.) আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য নূতন ধরণের উচ্চতর মানের বিদ্যালয় গৃহ বা উপকরণের ব্যবস্থা করিতে অক্ষম হওয়াতে কোন কোন অঞ্চল শিক্ষায় অনগ্রসর রহিয়া গেল। তাহা ছাড়া ১৯৩৬ সালের বিশেষ আইন পাশ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সরকারী অর্থ বেসরকারী বিদ্যালয়ের (Voluntary

Schools) গৃহ ইত্যাদি সংস্কার বা উন্নতির জন্য ব্যয় করা যাইত না। এবং Voluntary School গুলির উপর সরকারের কর্তৃত্ব না থাকাতে এবং তাহাদেরও নিজেদের আর্থিক সচ্ছলতা না থাকাতে ছাত্রদের প্রয়োজন অনুযায়ী অধিকাংশ বিদ্যালয়েরই সংস্কার হইত না।

আইনতঃ অন্য অসুবিধাও ছিল। আইনতঃ নূতন Senior School বা Central School-গুলি Elementary School-এর পর্যায়ে পড়ে—সুতরাং Hadow Report অনুযায়ী শিক্ষকদের সংখ্যা, বেতনের হার, প্রতি শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা, লাইব্রেরী এবং অন্যান্য সরঞ্জামের যে আদর্শ নির্দিষ্ট হইয়াছিল—সে অনুযায়ী এই বিদ্যালয়গুলিকে বাধ্য করিবার উপায় ছিল না।

ছাত্রদের বিদ্যালয়ে থাকিবার বয়স (school leaving age) ১৪ বৎসর নির্দিষ্ট ছিল এবং অধিকাংশ ছাত্রই ১২ বৎসরের আগে Elmentary স্কুলের পড়া শেষ করিতে পারিত না। কাজেই এই Senior School-গুলিতে চার বৎসর পড়ার যে পরামর্শ Hadow Report-এ ছিল তাহা কার্যকরী হওয়ার উপায় ছিল না।

যাহা হউক এই সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রচার এবং মান উন্নয়ন ক্রমবর্ধমান গতিতে অগ্রসর হইয়াছে। সর্বসাধারণের শিক্ষার প্রয়োজন সে দেশে বিতর্কের বিষয় নহে এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ইংরেজ জাতি সমস্ত জাতিকে শিক্ষায় উন্নীত করিতে বদ্ধপরিকর। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে সমগ্র জাতির কিশোরদের সরকারী ব্যয়ে শিক্ষার দাবী স্বীকার করিয়া সমগ্র জাতির কিশোরদের মাধ্যমিক শিক্ষার একটা সমান মান (uniform standard) অনুযায়ী বিদ্যা বিতরণের ব্যবস্থা হইল।

১৯৪৪-এর শিক্ষা আইনের কয়েকটি মূল বিধান

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হইল তাহা বলা যাইতেছে :

(১) ১১ বৎসরের উপর প্রত্যেক বালক বালিকার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থার ভার সরকার গ্রহণ করিলেন। এই শিক্ষার জন্য বালক বালিকাদের অভিভাবকদের কোন ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না। শিক্ষা শুধু

অবৈতনিকই হইবে না, শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত সরঞ্জাম, দুগ্ধ এবং টিফিনও বিনা ব্যয়ে ছাত্ররা পাইবে।

(২) ১৯৪৭-এর ১লা এপ্রিল হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্ত সমস্ত বালক বালিকার বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক (compulsory) করা হইল এবং যখনই শিক্ষামন্ত্রী বুঝিবেন সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে তখনই এই বয়স বাড়াইয়া ১৬ বৎসর করা হইবে।

(৩) মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে (Secondary Schools) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি হইতে পৃথক করিতে হইবে।

(৪) যে সমস্ত বিদ্যালয়ের ব্যয় সরকার সম্পূর্ণভাবে বা অংশতঃ বহন করেন (Local Education Authority-র প্রত্যক্ষ অধীন বিদ্যালয়গুলি) অথবা যে সমস্ত বিদ্যালয় 'স্বাধীন' এবং যাহার ব্যয় কোন ধর্ম বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বহন করেন (Voluntary Schools initially provided by a religious denomination or school foundation) তাহাদের সকলের জন্যই বিদ্যালয় গৃহ, সরঞ্জাম, ব্যায়ামাগার, পুস্তকাগার, শ্রেণীর আয়তন, শিক্ষকদের মান (qualifications of teachers), শিক্ষকদের বেতন, শিক্ষার মান ইত্যাদি সম্পর্কে একই ধরণের লিখিত আইন শিক্ষামন্ত্রী প্রচার করিবেন এবং এই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে সমস্ত বিদ্যালয়ই বাধ্য।

(৫) এই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে কোন Voluntary School আর্থিক কারণে অসমর্থ হইলে সরকার প্রয়োজন বোধে সাহায্য করিবেন।

(৬) এখন হইতে Local Education Authority-রাই তাহাদের অঞ্চলে সমগ্র শিক্ষার (primary, secondary and further) জন্য দায়ী থাকিবেন। ইতিপূর্বে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এক Authority এবং মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য অন্য Authority ছিল।

কয়েকটি কারণে এই শিক্ষা আইনের বিধান বৈপ্লবিক বলা চলে। এই আইনের দ্বারা শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডে শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে মূলতঃ বে-সরকারী চেষ্টায়। Public School-গুলি ধনীদের দ্বারা, এবং দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের জন্য অধিকাংশ

বিদ্যালয় Church Society-গুলি (যেমন Church of England, Roman Catholic Church) বা সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠান, (যেমন British and Foreign School Society বা National Society) অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (যেমন Froebel Foundation) দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল এবং ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী মনোভাব ছিল নেতিবাচক। অর্থাৎ সরকার সেখানেই শিক্ষার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন যেখানে শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। কিন্তু ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে ইহা স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হইয়াছে যে দেশের শিক্ষার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব সরকারের। রাষ্ট্র পরিচালনায় শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকৃতির একটি লক্ষণ এই যে President of the Board of Education এর পরিবর্তে একজন মন্ত্রী (Minister of Education) এখন ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা পরিচালনার ভার নিয়াছেন।

ইংল্যাণ্ড অত্যন্ত রক্ষণশীল দেশ—প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা অপরিসীম। তাই প্রাচীন Public School tradition বা Voluntary School-এর উপর হস্তক্ষেপ করিতে সরকার অনিচ্ছুক। কিন্তু এই আইনে Public School-গুলির উপর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা না থাকিলেও Secondary School-গুলি প্রত্যেকটিই শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশ মানিতে বাধ্য। যদিও ইংল্যাণ্ডে লিখিত আইন (Statutory Act) অপেক্ষা প্রাচীন রীতি (convention)-এ অধিকতর বিশ্বাসী তথাপি ১৯৪৪-এর শিক্ষা আইনে শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশসমূহ আইনতঃ লিপিবদ্ধ এবং তাহা প্রত্যেক বিদ্যালয়ের উপর প্রযোজ্য।

ইতিপূর্বে সমগ্র দেশের জন্য একই ধরণের শিক্ষার মান তেমন কড়াকড়ি ভাবে প্রবর্তিত হয় নাই। Local Education Authority-রা Parliament-এর আইনের দ্বারা সৃষ্ট হইলেও শিক্ষার ব্যাপারে তাঁহাদের অঞ্চলে তাঁহারা প্রায় নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। বিদ্যালয় পরিচালনা ব্যাপারে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া উচিত, ইহাই ইংল্যাণ্ডের tradition। তথাপি এই আইনে, শিক্ষা আগের তুলনায় অনেক বেশী কেন্দ্রীভূত (centralised), এবং সরকারী কর্তৃত্ব আগের তুলনায় অনেক বেশী হইয়াছে। অবশ্য এখনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরিক পরিচালনা,

পাঠ্যতালিকা নির্দেশ ইত্যাদি ব্যাপারে সরকার হস্তক্ষেপ করেন না। পরিদর্শন (Inspection), অর্থ সাহায্য (grants) এবং অন্যান্য উপায়ে সরকারী কর্তৃত্ব পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইতিপূর্বে বে-সরকারী বিদ্যালয়ই ছিল অধিকাংশ, কিন্তু ক্রমশঃই সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং তাহাদের ছাত্র সংখ্যাও দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে এবং Voluntary School-গুলি ক্রমেই সরকারী কর্তৃত্বের অধীনে আসিতেছে।

এরূপ সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন করিতে হইলে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যবস্থা (long term planning) একান্ত প্রয়োজন। সেইজন্য Local Education Authority-গুলিকে তাঁহাদের অঞ্চলের জন্য Development Plan তৈয়ারী করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। এই আঞ্চলিক Development Plan-গুলি একত্র করিয়া একটি দেশব্যাপী সামগ্রিক Plan গড়িবার দায়িত্ব শিক্ষামন্ত্রীর। ১৯৪৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এক বৎসরের মধ্যে এই সব Plan দাখিল করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। তাহার পর Plan-গুলি বিবেচনা করিবার পর শিক্ষামন্ত্রী উপযুক্ত পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সাধন করিয়া Local Education Order দ্বারা নির্দেশ দেন—কখন, কোথায়, কি ভাবে নূতন বিদ্যালয় গড়িতে হইবে বা পুরাতন বিদ্যালয়ের সংস্কার করিতে হইবে।

His Majesty's Inspectors (সংক্ষেপে H.M.I.)—শিক্ষামন্ত্রী ও L.E.A.-র মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন H.M.I. মণ্ডলী। ইঁহাদের শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা নাই, কিন্তু ইঁহারা মন্ত্রীকে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদনে সর্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য করিয়া থাকেন। ইঁহারা একদিকে বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিয়া তাহাদের অবস্থা শিক্ষামন্ত্রীকে গোচর করান এবং যাহাতে আইন অনুযায়ী বিদ্যালয়গুলির উন্নতি ঘটে সে বিষয়ে তিনি শিক্ষামন্ত্রীকে পরামর্শ দেন। শিক্ষাক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, যোগ্য এবং ধীরবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকেই কেবলমাত্র H.M.I. নিযুক্ত করা হয়। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এবং L.E.A.-রাও সর্বদা তাঁহাদের কাছে নিজ নিজ সমস্যা সম্পর্কে উপদেশ পাইয়া থাকেন এবং আমাদের দেশের ইনস্পেক্টর মহোদয়গণের মত তাঁহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে ভীতিকর নন। তাঁহারা অত্যন্ত সহানুভূতি-সম্পন্ন বন্ধুত্বের মনোভাব নিয়া শিক্ষকদের সঙ্গে মিশেন, এবং বিদ্যালয়ের উন্নতি

বিধানের সমস্ত প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করেন। Public School বা Voluntary School-গুলির উপর সরকারী কর্তৃত্ব অতিশয় সামান্যই, তথাপি Public School-গুলিও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া H.M.I.-দের উপদেশ চাহিয়া থাকেন। H.M.I. অবশ্য ১৯৪৪ সালের আইনের দ্বারাই প্রথম প্রবর্তিত হয় নাই। ১৯৪৪-এর শিক্ষা আইনের দ্বারা তাঁহাদের গুরুত্ব ও দায়িত্ব আগের তুলনায় অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী তাঁহাদের সাহায্যেই শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় আদর্শ L.E.A.-দের সম্মুখে উপস্থিত করেন এবং সদা-জাগ্রত প্রহরীর মত বিদ্যালয়গুলির উন্নতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। তাঁহারা শিক্ষা সম্পর্কে নানা গবেষণার ফল প্রকাশ করেন, শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য বক্তৃতা এবং অন্যান্য ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধের পরে শিক্ষিত (trained) শিক্ষকের অভাব দূর করিবার জন্য যে Emergency Training Scheme হইয়াছে, তাহা মুখ্যতঃ H.M.I.-দের উদ্যোগেই সাধিত হইয়াছে।

Local Education Authorities: পূর্বেই বলা হইয়াছে L.E.A. দের উপর তাঁহাদের অঞ্চলের শিক্ষার দায়িত্ব প্রত্যক্ষ ভাবে রহিয়াছে। ১৯০২ সালের শিক্ষা আইনের দ্বারা L.E.A.-গুলি সৃষ্টি হয় এবং তাঁহারা School Board-এর স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৪-এর শিক্ষা আইন দ্বারা ক্ষমতা (সোজাসুজি শিক্ষামন্ত্রীর অধীনে আসায়) কিছুটা খর্ব হইয়াছে। ১৯৪৪ সালের আইনের দ্বারা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন হইতে County Council-ই সেই County Borough-র L.E.A. হইবেন— "The local education authority for each county shall be the council of the county and local education authority for each county borough, shall be the county borough council."— ইতিপূর্বে Primary ও Secondary Education-এর Authority অনেক স্থলে ভিন্ন ছিল। এই আইন অনুযায়ী তাঁহাদের একই Authority-র অধীনে আনা হইল।

Secondary School-গুলির শ্রেণী বিভাগ:—১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন ইংল্যাণ্ডের সমস্ত স্তরের শিক্ষাকেই অল্পাধিক পরিমাণে পরিবর্তিত করিল। কিন্তু Secondary Education-এর ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তন

সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইতিপূর্বে Hadow Report এবং Norwood Report-এ বিভিন্ন প্রকার ছাত্রদের পক্ষে বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রয়োজন, ইহা আলোচিত হইয়াছিল। ১৯৪৪ সালের আইনে ইহা স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হইল এবং বিভিন্ন বয়স, বিভিন্ন মানসিক উৎকর্ষ এবং বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর সমমর্যাদাসম্পন্ন Secondary School স্থাপনের ব্যবস্থা হইল। "The 1944 Act requires Secondary Schools to be sufficient in number, character, and equipment to afford for all pupils opportunities of education offering such variety of instruction and training, as may be desirable in view of their different ages, abilities and aptitudes."

ইংলণ্ডের অধিকাংশ Public School এবং প্রাচীন বিদ্যালয়গুলি হইতেছে Grammar School ; এই বিদ্যালয়গুলিতে পুঁথিগত বিদ্যা ও ভাষা ও সাহিত্যমূলক বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়। Abstract বিষয়ে চিন্তা করিতে যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা আনন্দ পায় তাহাদের জন্য এ বিদ্যালয়গুলি উপযোগী। University পর্যন্ত যাইতে যাহাদের আগ্রহ বা সামর্থ্য নাই অথচ উচ্চতর শিক্ষায় যাহাদের রুচি আছে এবং অন্যান্য ছাত্র ছাত্রীদের চেয়ে দীর্ঘতর কাল যাহারা Secondary School-এ থাকিয়া বিদ্যালাভে ইচ্ছুক সে সব ছাত্র ছাত্রীদের জন্য Sixth Form-এর ব্যবস্থা Grammar School-গুলির বিশেষত্ব। আইনতঃ না হইলেও কার্যতঃ Grammar School-এর শিক্ষার মর্যাদা অধিকতর।

কিন্তু অধিকাংশ ছাত্র .concrete বিষয় নিয়া শিক্ষা লাভ করিতে আনন্দ পায় এবং উপকৃত হয়। ভাষা বা সাহিত্যের সূক্ষ্ম রুচি অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রীর কাছে আশা করা যায় না। কাজেই এই অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রীর জন্য Public School Type-এর পুঁথিগত শিক্ষা সময়ের ও শক্তির অপব্যবহার মাত্র। কাজেই সাংসারিক জীবনে কার্যকারী অনেকগুলি বিষয়ে মোটামুটি শিক্ষা এবং নানারকম কাজে দক্ষতা এবং অনুরাগ জন্মাইবার জন্য এবং বর্তমান যুগেরও জীবনের উপযোগী শিক্ষাদানের জন্য বহু সংখ্যক Modern Schools সরকারী ব্যয়ে স্থাপনের ব্যবস্থা হইল। "The majority will do

best in a school which provides a good all-round education in an atmosphere which enables them to develop freely along their own lines. Such a school will give them a chance to sample a variety of "subjects" and skills, and to pursue those which attract them most. It is for this majority that the Secondary Modern School will cater."

আবার কতক ছাত্র বা তাহাদের অভিভাবক ভবিষ্যতে কোন শিল্প বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিযুক্ত হইয়া জীবিকার্জন করিবে এইরূপ স্থির করিয়াছে এবং এ রকম কোন বিশেষ দিকে তাহাদের ঝোঁক রহিয়াছে, এ সব ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন Secondary School-এর ব্যবস্থা করা হইল। Commercial School ও Art School-গুলি এই পর্যায়ে পড়ে।

আইনতঃ সমস্ত বিদ্যালয়গুলি সমান মর্যাদাসম্পন্ন। সরকার সমস্তগুলিতেই একই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া সবগুলির জন্যই সমান উন্নতমানসম্পন্ন শিক্ষার উপযোগী বিদ্যালয় গৃহ, উপকরণ, শিক্ষিত শিক্ষক ব্যবস্থা করিবেন। সরকার সব শ্রেণীর বিদ্যালয়ের জন্যই সমান দায়িত্ব বহন করিয়া থাকেন এবং সব বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা আনন্দ এবং সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য সমান সুযোগ ও সুবিধা দিয়া থাকেন।

Common features of Secondary Schools ;—প্রত্যেক Secondary School (তাহা যে শ্রেণীরই হোক না কেন) লিখিত আইন অনুযায়ী শিক্ষা, শিক্ষার উপকরণ, শিক্ষকের মর্যাদা, ন্যূনতম মান অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে বাধ্য। "Every Secondary School must have an assembly hall, a gymnasium, a library, an art and crafts room for practical activities and a dining room. The gymnasium must be properly equipped, and there must be rooms for changing dress and shower baths. There must be a large level play ground, and playing fields must be provided, either on the school site or in a reasonably accessible situation."…"There is a common maximum of 30 pupils in a

class···the conditions governing approved by the minister as a "qualified" teacher are comprehensive....A common scale of salaries is binding on all employing bodies."

যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী মেধাবী এবং sixth form work-এর যোগ্য, তাহাদের পিতামাতা বা অভিভাবকের ১৫ বৎসরের (Compulsory School leaving age) পর তাহাদের পড়াইবার সামর্থ্য না থাকিলে সরকার হইতে সে সকল ছাত্রছাত্রীদের Maintenance allowance দিবার ব্যবস্থা আছে।

Libraries :—সমস্ত বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত Library রাখিতে হইবে এবং যাহাতে Library-তে নানাপ্রকার বই পড়িতে ছাত্র ছাত্রীরা উৎসাহিত হয় তাহার সমস্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

Instructional Equipment :—শিক্ষার কাজের জন্য উৎকৃষ্ট এবং চিত্তাকর্ষক বিভিন্ন শিক্ষাপ্রদ উপকরণ রাখিতে হইবে। Magic-lantern, film-projectors, radio-set ইত্যাদির ব্যবস্থা সমস্ত বিদ্যালয়েই থাকিবে। বিভিন্ন বয়স ও রুচির ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন ধরণের radio programme প্রতিদিনই ব্যবস্থা থাকে।

The School Community :—ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সামাজিক একত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগরিত ও বিকশিত করিবার জন্য বহুবিধ আয়োজন আছে। School Council elections, ইত্যাদির দ্বারা দায়িত্ববোধ, পরিচালনা ও বাধ্যতা ইত্যাদি শিক্ষায় সাহায্য করা হয়। Picnics, Historical tours, Scientific expeditions, বিভিন্ন ধরণের ক্লাব ও organisation গঠনে উৎসাহ দেওয়া হয়। Boarding School-এ এ বিষয়ে সুযোগ সুবিধা Day School-গুলির (যেখানে ছাত্রছাত্রীরা বাড়ী হইতে আসিয়া, কেবল পড়াশুনার সময় দিনের বেলা একত্রিত হয়) চেয়ে বেশী। তথাপি Day School-গুলি এসব ব্যাপারে কম উৎসাহী নয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে এ বিষয়ে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা বর্তমান।

Creative outlets :—Arts, Crafts, Eurythmics etc. ;—ছাত্র ছাত্রীদের সৃজনী প্রতিভা যাহাতে স্ফুরিত হয় এবং যথাযথ প্রকাশের সুযোগ পায় সেজন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়েই ছবি আঁকা, হাতের কাজ, সাধারণ যন্ত্রপাতি

ব্যবহার দ্বারা জিনিস নির্মাণ, সঙ্গীত শিক্ষা, নাটক ও আবৃত্তির নানাবিধ আয়োজন করা হয়। ইহা শিক্ষার একটা অবিচ্ছেদ্য এবং মূল্যবান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়।

Physical activities—Health and Hygiene :—ছাত্র ছাত্রীদের যাহাতে শরীরচর্চা দ্বারা সবল ও সুস্থ দেহ গঠিত হয়, সেজন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং সর্বপ্রকারের সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে নিয়মিত ভাবে ডাক্তারী পরীক্ষার ফল অনুসারে কোন-না-কোন প্রকারের ব্যায়াম করিতে হইবে। নানা প্রকার ব্যায়ামের ও বিভিন্ন ধরণের খেলাধূলার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক। দুধ এবং টিফিন বিনা ব্যয়ে বা নামমাত্র ব্যয়ে দিবার ব্যবস্থা আছে।

Spiritual values :—ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রী যাহাতে উদাসীন না থাকে—যাহাতে মহৎ আদর্শের প্রতি তাহারা শ্রদ্ধাশীল হয়, সে জন্য ধর্ম ও নীতিমূলক আলোচনা এবং উপাসনা ইত্যাদির ব্যবস্থা সমস্ত বিদ্যালয়ে করা হয়।

Education through interest:—নূতন ধরণের শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে ছাত্রছাত্রীদের আত্মআবিষ্কার ও আত্মবিকাশের সুযোগ দেওয়া। তাহাদের মনকে সজাগ কৌতুহলী ও জিজ্ঞাসু করিয়া তুলিবার জন্য শিক্ষক বন্ধু হিসাবে তাহাদিগকে সর্বদা উদ্বুদ্ধ করিবেন—পথ দেখাইবেন। কাজেই ক্লাশে বক্তৃতার উপর আগের মত জোর দেওয়া হয় না। ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা এবং স্বাধীনভাবে নানা সমস্যার সমাধান করিবার সাহস ও অভ্যাস জন্মাইবার জন্য শিক্ষক সর্বদাই চেষ্টা করেন। তিনি নিজেকে ছাত্রদের উপর চাপান না।

School & Home:—গৃহ ও বিদ্যালয় পরস্পরের পরিপূরক। গৃহের শিক্ষা বিদ্যালয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে। বিদ্যালয় জীবন, সাংসারিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন স্বপ্নজগৎ, এই ধারণা ছাত্র-ছাত্রীদের মনে যাহাতে না জন্মে, সে দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। বিদ্যালয় যাহাতে তাহাদের পক্ষে "কারাগার" না হইয়া আনন্দময় কর্মক্ষেত্র হয় সে বিষয়ে শিক্ষকগণ সজাগ থাকেন। স্কুলের কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা করেন।

Vocational guidance:—ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবনে জীবিকা অর্জন করিতে হইবে, সুতরাং তাহাদের শিক্ষা এমন হইবে যে সেই ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তাহারা যেন প্রস্তুত হইতে পারে। প্রত্যেক ছাত্রের বিদ্যা ও রুচির record শিক্ষকেরা রাখেন এবং সে কোন্ কাজের জন্য বিশেষ-ভাবে উপযোগী, সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সেই অনুযায়ী তাহাকে জীবিকা নির্ধারণ ব্যাপারে সাহায্য করেন। বিভিন্ন সরকারী ও বে-সরকারী ব্যবসায়ী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করেন। জাতির সেবায় যে লোক যেখানে উপযোগী, ইহা নির্ধারণ করিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা হইলেই শক্তির অপচয় নিবারিত হইতে পারে। জীবিকার সুনির্বাচনের উপর ব্যক্তিরও ভবিষ্যৎ জীবনে সুখদুঃখ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে; সুতরাং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদ্ ও বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই নূতন শিক্ষাব্যবস্থা, ছাত্রছাত্রীদের মঙ্গল এবং ব্যক্তির উপযুক্ত বিকাশের দ্বারা সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকেই, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করে।

মাধ্যমিক শিক্ষাসংস্কার পরিকল্পনা

মাধ্যমিক শিক্ষাসংস্কারের নূতন পরিকল্পনা সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত কেহ কেহ নানা ভুল ধারণা পোষণ করিতেছেন। দুই বৎসর পূর্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয় এই পরিকল্পনা পরিষ্কার ভাবে বিবৃত করিয়া একখানি পুস্তিকা (A Plan of Secondary Education) প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে এই পরিকল্পনার স্বরূপ ও তাহার বিরুদ্ধে সকল আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষাবিদ্‌গণের অবগতির জন্য তাহার সারাংশের অনুবাদ প্রকাশ করা হইতেছে।

ভূমিকা

ভারতবর্ষের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা বহু বৎসর পূর্বেই স্বীকৃত হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে নানা প্রস্তাব নিয়া আলোচনা, অন্ততঃ ৪০ বৎসর চলিয়া আসিতেছে। মাধ্যমিক শিক্ষার আদর্শ কি, সমাজ ও ব্যক্তির সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কি, ইহার পাঠ্যবিষয়বস্তু কি হইবে, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত, পাঠ্য-ব্যবস্থা কত বৎসরব্যাপী হওয়া উচিত, এসব বিষয়ে দীর্ঘকাল বিচার বিতর্ক চলিয়াছে ও চলিতেছে। এই প্রশ্ন আলোচনার জন্যে নানা সময়ে একাধিক কমিশন ও কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং এইসব কমিশন ও কমিটি নানা প্রস্তাব করিয়াছেন। সে সব প্রস্তাব দেশের মানুষের প্রশংসা লাভ করিয়াছে কিন্তু সাধারণতঃ এই প্রস্তাবসমূহ কার্যকরী করার চেষ্টা হয় নাই।

মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্ট হইতে ইহা ভাল করিয়াই বোঝা যায় যে, ভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষার মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন এবং ইহা নিয়া দেশে যথেষ্ট আগ্রহেরও সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতবর্ষে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হওয়ার পর, এই সংস্কারের কাজ ত্বরান্বিত করিবার আগ্রহ আরো প্রবল হইয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষার সাহায্যে যেমন একদিকে রাজ্যের দৈনন্দিন নানা কাজে নেতৃত্ব গ্রহণে উপযুক্ত কার্যক্ষম মানুষ তৈরী হইবে, তেমনি আবার ইহাদের মধ্য

হইতে ক্ষুদ্রতর একদল উচ্চনেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম এবং সমগ্র দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণে সমর্থ অতি তীক্ষ্ণধী মানুষেরও উদ্ভব হইবে। তাহা ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার সর্বদেশব্যাপী একটি সাধারণ আদর্শ ও ব্যবস্থা আজ গৃহীত হইয়াছে। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে অনুরূপ সংস্কারের প্রয়োজন বিশেষ করিয়া অনুভূত হইতেছে।

এইজন্য কেন্দ্রীয় সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডগুলির মধ্যে আলাপ আলোচনা অনেক দিন ধরিয়াই চলিতেছে। ১৯৫৩ সাল হইতে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যাঁহারা যুক্ত আছেন—যেমন, বিভিন্ন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকবৃন্দ,—তাঁহারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া এই শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং কি সংস্কার হওয়া উচিত, ও কিভাবে হওয়া উচিত. তাহাও বিবেচনা করিয়া নিজেদের মতামত জানাইয়াছেন। তাঁহারা এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন। ইহার পর ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং বিভিন্ন মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সভাপতিরা এক যুক্ত সম্মেলনে একত্র হইয়া কতগুলি সর্বজনস্বীকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাহার পর এই সিদ্ধান্তগুলি কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড কর্তৃক সমর্থিত এবং বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহার পরে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডও কোন একটি বিষয়েও মতানৈক্য ব্যতিরেকে এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহ এখন এ সব সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে মাধ্যমিক শিক্ষাসংস্কারের নূতন যুগের সূচনা হইয়াছে।

কিন্তু নূতন মাধ্যমিক শিক্ষার যে রূপটি এমন সর্বসম্মত সমর্থন লাভ করিয়াছে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। পুনর্বিন্যাসের প্রথম স্তরগুলি সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রান্ত হইলে, সমগ্র পরিকল্পনাটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়া যায়। যে স্কুলগুলির উন্নয়ন কার্য নিয়া প্রথম কাজ সুরু হইবে সেগুলিকে সযত্নে বাছিতে হইবে, এবং সেগুলির জন্য উপযুক্ত শিক্ষক, সরঞ্জাম ও অন্যান্য সুযোগের সুব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে। প্রথম স্তরের পরীক্ষা সফল হইলে ক্রমশঃ দ্রুততর বেগে পরবর্তী স্তরগুলিও সাফল্যের পথে অগ্রসর হইবে। তাহা হইলে ভবিষ্যতে যে সব বাধা ও অসুবিধা দেখা দিবে

সেগুলি অতিক্রম করা বা দূর করা সহজতর হইবে। কিন্তু যদি প্রথম স্তরেই অসাফল্য ঘটে, তবে তাহার প্রভাব সমগ্র পরিকল্পনাকেই পঙ্গু করিবে।

এত দীর্ঘ ও পুনঃ পুনঃ সমস্ত বিষয়ে আলোচনা সত্ত্বেও এইসব প্রস্তাবের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে অনেকের মনে অনিশ্চয়তা রহিয়াছে। এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে সংক্ষেপে অথচ পরিষ্কারভাবে এই নূতন শিক্ষাবিধির মূল বিষয়গুলি বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং এই সংস্কারের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে সব আপত্তি যুক্তিসঙ্গতভাবে উত্থাপিত হইতে পারে সেগুলি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিলাম মাত্র। আশা করা যায় ইহা দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষাকর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের মধ্যে যে সংশয় ও অনিশ্চয়তা রহিয়াছে তাহা দূরীভূত হইবে।

হুমায়ুন কবীর

পরিকল্পনার পরিচয়

১৯৫৫ সালের ১২ই হইতে ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ডের সভায় সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলিয়াছিলেন, —"সম্ভবতঃ আপনারা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির সর্বাপেক্ষা দুর্বল অঙ্গ। অথচ এই মাধ্যমিক শিক্ষাই নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে উচ্চতর ও মধ্যবর্তী শিক্ষার গুণাগুণ। এই মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের থেকেই আসেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। কলেজ ও উচ্চস্তরের শিক্ষার ছাত্ররাও মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়া আসেন। কাজেই এই অদৃঢ় মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা দেশের সমগ্র শিক্ষা-সৌধকেই দুর্বল করে।"

ঐ সভাতে এই অবস্থা প্রতিকারের জন্য কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারত সরকার তদনুযায়ী শিক্ষাসংস্কারের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর কত বৎসরে শেষ হইবে এবং বিদ্যালয়ে প্রবেশের মান কি হইবে সে সম্পর্কে নিম্নলিখিত সর্বজনসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:—

(ক) প্রথম ডিগ্রী কোর্স (বি.এ.) তিন বৎসরব্যাপী হওয়া উচিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশের ন্যূনতম বয়স হইবে ১৭+

(খ) ১৭+ বৎসর বয়সে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হইবে এবং এই শিক্ষা এমন

হইবে যাহাতে এই শিক্ষার পরেই জীবিকার নানা ক্ষেত্রে ছাত্ররা প্রবেশ করিতে পারে। ইহার মান এমন হইবে যাহাতে এই শিক্ষার পরেই ছাত্ররা তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স গ্রহণের উপযোগী হইবে।

(গ) উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হয়, তাঁহারা যেন এমন একটি কমিটি গঠন করেন যাঁহারা পরীক্ষার জন্য একটি সুসংবদ্ধ পাঠক্রম (Syllabus) প্রস্তুত করিবেন।

(ঘ) মাধ্যমিক স্তরের শেষ শ্রেণীকে একাদশ শ্রেণী বলা হইবে। অন্ততঃ দশ বৎসর বিদ্যালয়ে পাঠের পর এই শ্রেণীতে উঠিতে হইবে। বিভিন্ন রাজ্য সরকার বিদ্যালয়ের সমগ্র পাঠের কাল কত বৎসরব্যাপী হইবে তাহা স্থির করিবেন।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এই সব সিদ্ধান্ত কার্যকারী করিবার জন্য উপযুক্ত আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিবেন। এজন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ সমস্ত নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত করিবার এবং ইহার রূপায়ণের জন্য অর্থব্যবস্থা করিবার অনুরোধ করা হয়।

ইতিপূর্বে ১৯৫৫ সালের ৯ই জানুয়ারী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের সভাপতিগণও নয়াদিল্লীতে অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং ২৫শে জানুয়ারী আন্তঃবিদ্যালয় বোর্ডের এক সভায় পাটনাতে এ সিদ্ধান্তগুলি সমর্থিত হয়।

সাধারণ ভাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভবিষ্যৎ শিক্ষার রূপ এই রকম দাঁড়ায় :—

(ক) আট বৎসর ব্যাপী সুসংবদ্ধ প্রাথমিক (বেসিক) শিক্ষা। সাধারণতঃ এ শিক্ষার কাল হইবে ছয় থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত, তবে এই স্তরের শেষ বৎসরটি ছাত্র-ছাত্রীদের রুচি ও যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে।

(খ) তিন বৎসর ব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর। এ স্তরে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। সাধারণতঃ এই স্তরের ব্যাপ্তি ১৪ বৎসর থেকে ১৭ + বৎসর পর্যন্ত হইবে।

(গ) উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার (Higher Secondary School)

পর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ এবং সেখানে তিন বৎসর শিক্ষার পর প্রথম ডিগ্রী লাভ।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ হইতে প্রভেদ

ইতিপূর্বে ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন বর্তমান প্রস্তাবগুলি কোন কোন বিষয়ে তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ পৃথক। তাঁহাদের প্রস্তাবে প্রকৃত মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরটি কত বৎসরের হইবে, তাহা অনির্দিষ্ট ছিল; তাঁহারা চার বা পাঁচ বৎসরব্যাপী প্রাইমারী বা জুনিয়র বেসিকের পর তিন বৎসরব্যাপী মিড্‌ল্ বেসিক্ বা জুনিয়র সেকেণ্ডারী বা সিনিয়র বেসিক্ স্তর এবং তাহার পর চার বৎসরব্যাপী উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর থাকার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় স্তর কোন কোন ক্ষেত্রে এগার বৎসর ব্যাপী আবার কোন ক্ষেত্রে বার বৎসর হইতে পারিত। ইহাতে মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সমন্বয় কঠিনতর হইত এবং সমগ্র দেশে একই শিক্ষার মান প্রবর্তনেও অসুবিধা ঘটিত।

ইহার পর কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করিবার জন্য একটি ইমপ্লিমেণ্টেশন্ কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটি ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে কয়েকটি বৈঠকে মিলিত হইয়া শিক্ষার নিম্নলিখিত সামগ্রিক রূপ নির্ধারণ করেন:—

(ক) আট বৎসরব্যাপী প্রাথমিক (বেসিক) শিক্ষার স্তর।

(খ) তিন বা চার বৎসর ব্যাপী প্রকৃত মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর। এই স্তরে ছাত্রদের বিভিন্নমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে।

ইহাতেও দেখা যায় ইমপ্লিমেণ্টেশন্ কমিটি প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরটি ১১ বৎসর না ১২ বৎসর ব্যাপী হইবে তাহা স্থির করার ভার রাজ্য সরকারগুলির হাতে ছাড়িয়া দিতেছেন। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন মাধ্যমিক শিক্ষার মান প্রচলিত থাকিলে অসুবিধা ঘটিবে—এই কথা সযত্নে বিবেচনা করিয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড কিছু পরিবর্তিত আকারে শেষ অর্থাৎ জানুয়ারী ১৯৫৫ সালের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন—তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

বর্তমান শিক্ষার যে সমগ্র রূপটি পরিকল্পিত হইয়াছে তাহার উৎকর্ষ বিচার করিতে হইলে কেন প্রাক্‌বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল স্তর বাড়াইয়া ১৭+বৎসর বয়সব্যাপী করা হইল, কেন কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট স্তর তুলিয়া দেওয়া হইল, কেন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রথম ডিগ্রীলাভের কোর্স ৩ বৎসরব্যাপী করা হইল —তাহার কারণগুলি ভাল করিয়া বুঝা দরকার।

মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের ব্যাপ্তি এক বৎসর বৃদ্ধি কেন ?

পূর্বেই বলা হইয়াছে নূতন পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষার সমাপ্তি ঘটিবে ১৭+বৎসর বয়সে। কাজেই প্রাক্‌ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ব্যাপ্তি অন্ততঃ ১১ বৎসর হইবে অর্থাৎ তাহা ৬ থেকে ১৭ বৎসর—পর্যন্ত চলিবে। ইহাতে উচ্চতর মাধ্যমিক বা উত্তর-প্রাথমিক শিক্ষা এক বৎসর বাড়িবে। বর্তমানে বহু রাষ্ট্রেই ম্যাট্রিকুলেশান বা স্কুল লীভিং সার্টিফিকেট পরীক্ষা দশ বৎসর স্কুলে পড়ার পর ১৬+বছর বয়সে নেওয়া হয়। কিন্তু নূতন পরিকল্পনায় প্রত্যেক রাজ্যেই ১১ বৎসর স্কুলে পড়ার পর স্কুল লীভিং সার্টিফিকেট পরীক্ষাটি নেওয়া হইবে। যদি কোন রাজ্য স্কুলে শিক্ষারম্ভের বয়সটি কমাইয়া পাঁচ করিতে চান, তাহাতে কোন বাধা নাই। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক রাজ্যেই স্কুললীভিং সার্টিফিকেট পরীক্ষাটি ১৭+বয়সে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল, আর মোটামুটিভাবে সব রাজ্যেই একই বয়সের ছেলেদের বুদ্ধি ও কুশলতার মান সমান হওয়ার কথা, তাই স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার মানও সর্বত্র একই হইবে। তাহা ছাড়া সংবিধান অনুসারে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে—কাজেই উত্তর-প্রাথমিক বা বুনিয়াদী শিক্ষার পর প্রকৃত মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর বাস্তবিক পক্ষে সর্বত্র তিন বৎসর ব্যাপীই হইবে।

স্কুলে পড়ার সময় কেন এক বৎসর বাড়ান হইতেছে এ প্রশ্ন করা যাইতে পারে। ইহাতে অভিভাবকদের উপর কি আর্থিক চাপ বাড়িবে না? এ আপত্তি একেবারে অমূলক নয়। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার যে প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য পরিকল্পিত হইয়াছে তাহা সফল করিতে হইলে ইহা অবশ্যম্ভাবী। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষাকে কলেজ শিক্ষার প্রস্তুতি হিসাবেই নেওয়া হইয়াছে। নূতন পরিকল্পনায় স্কুলের শিক্ষাকে একটি নিজস্ব সম্পূর্ণ রূপ দেবার চেষ্টা হইতেছে।

নূতন শিক্ষা ব্যবস্থায় যাহাতে দেশের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী নূতন গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়াই ভদ্রভাবে জীবিকা অর্জনের উপযুক্ত বিদ্যা ও নিপুণতা লাভ করিতে পারে, সেই চিন্তা করা হইতেছে। আর একটি উদ্দেশ্য হইল,—যাহাতে স্কুলের পড়া শেষ করিয়া ছাত্রছাত্রীরা কলেজের প্রথম ডিগ্রী ক্লাশে ভর্তির যোগ্যতা লাভ করিতে পারে। এই দুইটি উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে স্কুলের শিক্ষা এক বৎসর না বাড়াইলে চলিবে না।

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিপরীত একটি আপত্তি উঠিতে পারে। কোন কোন রাজ্যে ১১ ক্লাশের পরে স্কুল ফাইন্যালের ব্যবস্থা এখনই আছে। সেখানে কলেজের ইণ্টারমিডিয়েট স্তরও আছে। নূতন ব্যবস্থায় তা উঠিয়া যাইবে। তাহা হইলে কি শিক্ষার মানের অবনতি ঘটিবে না? এই আপত্তির মূলে একটা ভুল ধারণা রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড কত বৎসর ধরিয়া স্কুলে পড়িতে হইবে, তাহার উপর জোর দিতেছেন না—জোর দিতেছেন কত বয়সে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হইবে, তাহার উপর। কোন কোন রাজ্যে যেখানে ১১ বৎসর ধরিয়া স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা আছে সেখানে ১৫ এমন কি ১৪ বৎসর বয়সেও ছাত্রেরা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১৭ বৎসরের আগে কলেজীয় শিক্ষাগ্রহণের জন্য দেহের, মনের ও অনুভূতির উপযোগী পুষ্টি ও বিকাশ ঘটে না। ইহার ব্যতিক্রম কোন কোন ক্ষেত্রে আছে বটে, যেমন কোন কোন মেধাবী বুদ্ধিমান্ ছাত্র বা ছাত্রী কম বয়সেও বুদ্ধির দিক দিয়ে ১৭ বৎসরের মত পরিণতি লাভ করিতে পারে। আবার কোন কোন ছাত্রছাত্রীর পরিণতি সাধারণের চেয়ে পিছাইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু সমগ্র দেশের জন্য সাধারণ কোনও শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের সময় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কথা চিন্তা করিয়াই তাহা করিতে হয়। তাই সকল রাজ্যে ছাত্রছাত্রীদের স্কুল শিক্ষা সমাপ্তিকালীন সর্বনিম্ন বয়স এক বৎসর বাড়াইয়া দিয়া কলেজের শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

এই পরিকল্পনায় ৬ বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ে শিক্ষারম্ভ হইবে। কোন কোন রাজ্যে পাঁচ বৎসর বয়সেই শিক্ষারম্ভের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা

হইতে দেখা যায় পাঁচ বা ছয় যে বয়সেই বিদ্যারম্ভ করা যাক্ না, নয় বা দশ বৎসর বয়সের সময় মোটামুটি সব ছেলেমেয়েরই বুদ্ধি, বিদ্যা বা নিপুণতা সমান হইয়া দাঁড়ায়।

এসব কথা বিবেচনা করিয়া সব রাজ্যেই স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার মান যাহাতে একই রকম হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইহাতে আরও একটি সুফল হইবে। বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে স্কুল শিক্ষার কালের মধ্যে বিভেদ থাকার দরুণ যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তাহারও অবসান ঘটিবে।

ইণ্টারমিডিয়েট স্তর তুলিয়া দিবার কারণ কি ?

প্রশ্ন করা যাইতে পারে, মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপ্তি ১১ বৎসর স্থির না করিয়া, কলেজের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার সমাপ্তি ধরিলেই কি শিক্ষার দিক দিয়া ভাল হয় না? বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন এই সুপারিশ করিয়াছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের মান হওয়া উচিত বর্তমান ইণ্টার-মিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ হওয়া এবং তাহা অন্ততঃ ১২ বৎসর স্কুলে এবং ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে পাঠের পর, সাধারণতঃ ছাত্রদের বয়স যখন ১৮ বৎসর, তখন হওয়া উচিত। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশেও অন্ততঃ ১২ বৎসর স্কুলে পড়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্যতা লাভ হয় বলিয়া বিবেচনা করা হয়।

এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, স্কুলের পড়ার সময় বাড়াইয়া ১২ বৎসর করিলে এবং ৩ বৎসরের ডিগ্রীকোর্স প্রবর্তন করিলে স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের শিক্ষার মানের আরও বেশী উন্নতি ঘটিত। কিন্তু স্কুলে পড়ার কালটা বাড়াইয়া ছাত্রছাত্রীদের ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত করিবার সামর্থ্য কি আমাদের আছে? মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই শিক্ষক সমিতি এবং অভিভাবকেরা একবাক্যে জানাইয়াছেন যে, দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় স্কুল ছাড়িবার বয়স ১৮ পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব নয়। আমাদের যে আর্থিক সঙ্গতি, তাহাতে ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত আবশ্যিক শিক্ষারই ব্যবস্থা আমরা এখনও করিতে পারিতেছি না। এই অবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষাকাল ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত করা কি যুক্তি সঙ্গত হইবে? অবশ্য দেশের আর্থিক অবস্থার

উন্নতি হইলে মাধ্যমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আমরা করিতে পারিব এবং তখন স্কুল শিক্ষার ব্যাপ্তিও বাড়ানো যাইবে। বাস্তবিক পক্ষে মৌলানা আবুল কালাম আজাদও ঘোষণা করিয়াছেন যে প্রত্যেক স্বাধীন গণতন্ত্রে ছাত্রদের অবৈতনিক আবশ্যিক মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্মগত অধিকার রহিয়াছে।

রাজ্য সরকারকে স্বাধীনতা দেওয়া হইল না কেন?

কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিবেন, মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপ্তি ১১ বৎসর নির্দিষ্ট না করিয়া এই শিক্ষার ব্যাপ্তি ১১ কি ১২ বৎসর হইবে—রাজ্য সরকারদের সে বিষয়ে স্বাধীনতা দিলেই কি ভাল হইত না? কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে সংবিধানে উপদেশাত্মক একটি নির্দেশ রহিয়াছে যে, ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে শিক্ষাদান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ১৭ বৎসর বয়সে মাধ্যমিক শিক্ষার সমাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া ৬ হইতে ১৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত যে পূর্ণ ১১ বৎসরের শিক্ষার পরিকল্পনা করা হইতেছে—তাহাতে সমস্ত রাজ্যে একই ধরণের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো স্থাপিত হইবে। কোন রাজ্য অবশ্য ইচ্ছা করিলে প্রাক্-প্রাথমিক স্তর এক বৎসর আগে সুরু করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার কাল বাড়াইতে পারেন। এই স্তরকে কিণ্ডারগার্টেন বা অনুরূপ কোন উপযুক্ত নাম দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু গোড়ার দিকে এই এক বৎসরের বেশী শিক্ষার দ্বারা বাধ্যতামূলক শিক্ষাকালের শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না।

১১ বৎসরের স্কুল শিক্ষা কি কলেজীয় ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার সমতুল?

বর্তমান যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহাতে কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করিবার পর প্রথম ডিগ্রী ক্লাশে (বি.এ.) ভর্তি করা হয়। ১১ বৎসর স্কুলে পড়িয়া ডিগ্রী ক্লাশে ভর্তি করিবার নূতন যে পরিকল্পনা, তাহাতে কি আগের মত বা তার চেয়ে বেশী যোগ্যতা লাভ ছাত্রদের হইবে?

এ কথা স্বীকার্য যে, ভারতবর্ষে এই সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক এমন যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ নাই যাহা হইতে এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান যাইতে পারে। তবে অন্যান্য দেশে এই বিষয়ে যে পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে যে,

১১ বৎসর একাদিক্রমে স্কুলে পড়ার ব্যবস্থায় বর্তমান ইণ্টারমিডিয়েটের চেয়ে উচ্চতর যোগ্যতার মান পাওয়া যায়। যাহা অন্য দেশে সম্ভব হইতেছে, তাহা আমাদের দেশে কেন হইবে না, তাহার কোন হেতু নাই। তাহা ছাড়া দিল্লী পলিটেকৃনিকেও এই ১১ বৎসর স্কুলের পরীক্ষায় অনুরূপ সুফলই পাওয়া গিয়াছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনুরূপ সুফল আশা করিবার সঙ্গত কারণ আছে।

প্রথমতঃ, নূতন উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্য বিষয় ও পাঠ্যক্রম সমগ্র ভাবে সমন্বয়িত হইবে। স্কুলের প্রথম হইতে শেষ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যবিষয় নির্বাচনে অনাবশ্যক পুনরুক্তি সযত্নে দূর করা হইবে। বর্তমান স্কুলের পাঠ্যসূচী হইতে উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এখন ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রথম প্রাইমারী স্তরে একবার সুরু করা হয়, মাঝামাঝি ক্লাশগুলিতে তাহা আবার পড়ানো হয়—আবার তাহাই আরও বাড়াইয়া মাধ্যমিক স্তরে পড়ানো হয়। অন্যান্য অনেক বিষয়েও অনুরূপ পুনরুক্তি ঘটে। এই জাতীয় নিপ্রয়োজন ও সময়ক্ষয়কারী ব্যবস্থার প্রতিকার নিশ্চয়ই করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, এখন হইতে ইংরেজীর পরিবর্তে ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলে স্কুলের সমস্ত পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষার মান উচ্চতর করা সম্ভব হইবে—এই আশা নিশ্চয়ই করা যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থায় ডিগ্রী ক্লাশে ঢুকিবার আগে দুইটি সাধারণ পরীক্ষা (স্কুল ফাইন্যাল ও ইণ্টারমিডিয়েট) ছাত্রছাত্রীদের দিতে হয়। নূতন পরিকল্পনায় ডিগ্রী ক্লাশে প্রবেশের পূর্বে ১১ বৎসর স্কুলে পড়ার পর একটি মাত্র পরীক্ষা দিতে হইবে। তাহাতে অন্ততঃ ছয় মাস সময় বাঁচিয়া যাইবে। কারণ এখন এ-সব পরীক্ষার ২।৩ মাস আগেই স্কুল বন্ধ হইয়া যায়, আর পরীক্ষার পরও ফল প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত দুইমাস অন্ততঃ কাটিয়া যায়। আবার ফল বাহির হইলেও কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. ক্লাশে ভর্তি হওয়ার পর ক্লাশ সুরু হইতেও অন্ততঃ একমাস কাটিয়া যায়। নূতন পরিকল্পনায় স্কুলের পড়া শেষ করিয়া ডিগ্রী ক্লাশে ভর্তি হইতে একটি মাত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকায় সময়-সংক্ষেপ হইবে এবং ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার দুশ্চিন্তা ও দুর্ভোগ কিছুটা লাঘব করা যাইবে।

তাহা ছাড়া, স্কুলে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ তিন বৎসর ছাত্রছাত্রীদের রুচি

ও নিপুণতা অনুযায়ী বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের ব্যবস্থা করা হইবে। ইহাতে শিক্ষা অধিকতর প্রীতিপ্রদ এবং লাভজনকও হইবে। রুচি ও নিপুণতা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ জীবিকার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ছাত্রেরা তাহাদের পাঠ্যবিষয় নির্বাচন করিবে। ইহাতে ছাত্রদের শিক্ষার মান অবশ্যই বাড়িবে এবং শিক্ষাও জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে সুসমঞ্জস হইয়া অধিকতর বাস্তব ও জীবন্ত হইবে। কাজেই এ সব সংস্কারের কাজে সুচিন্তিতভাবে ও সযত্নে অগ্রসর হইলে ১১ বৎসর ব্যাপী স্কুলের নূতন শিক্ষার ব্যবস্থাকে ইণ্টারমিডিয়েট হইতে উচ্চতর মানে উন্নীত করা সম্ভব হইবে। অর্থাৎ অন্যান্য দেশে ১৭+ বয়সে স্কুলে বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্ররা যে যোগ্যতা অর্জন করে এ দেশেও তাহা নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে।

পরিকল্পনায় শিক্ষকদের স্থান

অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, স্কুলে পড়ার বয়স এক বৎসর বাড়াইয়া বা সমগ্র পাঠ্য-স্চী সযত্নে সমন্বয়িত করিলেই অভীপ্সিত সুফল লাভ হইবে না। যে কোন শিক্ষার সংস্কার সফল করিয়া তুলিতে গেলে একটি প্রধান প্রয়োজন হইল উপযুক্ত শিক্ষকের। নূতন বিদ্যালয়গুলিতে যদি উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য অতিরিক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা না হয় তবে যে নতুন দায়িত্ব বিদ্যালয়গুলির উপর দেওয়া হইবে তাহা তাঁহারা সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে পারিবেন না। তাই স্কুলের কর্তৃপক্ষদের অনুরোধ করা হইবে তাঁহাদের স্কুলের সবচেয়ে উচ্চশিক্ষিত যোগ্য শিক্ষক যাঁহারা আছেন তাঁহাদেরই এই কাজে যেন নিযুক্ত করা হয়। তাহা হইলে নূতন সংস্কার যেমন অগ্রসর হইতে থাকিবে, তেমনি নূতন অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ ব্যবস্থাও করিতে হইবে। এ পরিবর্তন রাতারাতি করা যাইবে না। ধীরে ধীরে কয়েক বৎসর ধরিয়া কিছু কিছু করিয়া স্কুল নূতন ব্যবস্থাধীনে আসিবে ও উন্নীত হইতে থাকিবে।

কেন্দ্রীয় সরকার যোগ্য শিক্ষকের অভাবের সমস্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত আছেন এবং তাঁহারা রাজ্যসরকারগুলি যাহাতে নূতন শিক্ষক-শিক্ষণকেন্দ্র খুলেন এবং বর্তমান কেন্দ্রগুলির প্রসার করেন সে জন্যে যথোপযুক্ত অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। এক বৎসর ক্লাশ বাড়াইবার ফলে এবং নূতন পাঠ্য-তালিকা প্রবর্তনের জন্য স্কুলগুলিতে নূতন সরঞ্জাম ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করা

হইবে। এ বিষয়েও যাহাতে পরিবর্তন সুষ্ঠুভাবে চালু হইতে পারে সে জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিবেন। এ কথাটি কিন্তু মনে রাখা দরকার যে বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই যদি বর্তমান স্কুলগুলিকে ১১-শ্রেণী নূতন স্কুলে না বাছাই করিয়াই উন্নীত করা হয় তবে সম্পুর্ণ পরিকল্পনাই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। তাই গোড়াতে প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট স্কুলগুলিকে উন্নীত করিতে হইবে যেগুলিতে উপযুক্তসংখ্যক যোগ্য শিক্ষক আছেন এবং নূতন সরঞ্জাম ইত্যাদির সুব্যবস্থা করিতে সক্ষম। এই বাছাই করার কাজেও বিশেষ সতর্কতা একান্ত প্রয়োজন।

পরিবর্তনকালে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর ব্যবস্থা

নূতন পরিকল্পনা সম্পূর্ণ রূপায়িত হইলে সব রাজ্যেই প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের শিক্ষা ১১ বৎসরব্যাপী হইবে কিন্তু এ পরিবর্তন ধীরে ধীরে হইবে। এখন কোন রাজ্যে স্কুলের শিক্ষার ব্যাপ্তি ১০ বৎসর, কোথাও বা ১১ বৎসর, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা ১২ বৎসর। বর্তমানে যে বিদ্যালয়গুলিতে ১০ বৎসরের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে, তাহাদের অধিকাংশই শিক্ষকের অভাব, সরঞ্জামের অভাব, ছাত্রের সংখ্যাধিক্য প্রভৃতি কারণে অবিলম্বে নূতন পরিকল্পনানুযায়ী ১১ শ্রেণীর ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিবে না। তাই এই ধীর পরিবর্তন কালে নূতন ও পুরাতন ব্যবস্থা দুইটিই পাশাপাশি চলিবে। ১০ শ্রেণী বিশিষ্ট স্কুলের ছাত্ররা বর্তমান স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিবে আর নূতন ১১ শ্রেণীবিশিষ্ট স্কুলগুলির ছাত্ররা উচ্চতর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিবে। ১০ শ্রেণী বিশিষ্ট স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়া যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রী ক্লাশে ভর্তি হইতে ইচ্ছা করিবে, তাহাদের জন্য এক বৎসর ব্যাপী একটি নূতন প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় কোর্সের ব্যবস্থা করা হইবে।

এ শ্রেণীটি স্কুলগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকিবে, না কলেজগুলিতে থাকিবে তাহা নিয়া তীব্র মতভেদ আছে।

যাঁহারা স্কুলে এই বিশিষ্ট শ্রেণী খোলার পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন যে, যেহেতু এই শ্রেণী মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ শ্রেণী, কাজেই এই শ্রেণীগুলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতেই খোলা উচিত। তাহা হইলে এ শ্রেণীর ছাত্রেরা তাহাদের

উপযুক্ত মনোযোগ ও যোগ্য মর্যাদা লাভ করিবে। কলেজের সঙ্গে এই শ্রেণী থাকিলে ইহার ছাত্রেরা হইবে কলেজের সবচেয়ে নীচু শ্রেণী, তাই ইহারা যথেষ্ট মর্যাদাও পাইবে না, মনোযোগও পাইবে না। আর কলেজের সঙ্গে থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যৎ ছাত্র হিসাবেই ইহাদের দেখিবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনেই ইহাদের শিক্ষা প্রভাবিত হইবে।

স্কুলে আলাদা শ্রেণী হিসাবে ইহারা থাকিলে ইহাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, নেতৃত্বের যোগ্যতা ইত্যাদি গুণ বিকশিত হইবে এবং সমস্ত স্কুলের শাসন ও শৃঙ্খলার উপর ইহার শুভ ফল দেখা দিবে। ইংল্যাণ্ডে পাব্লিক স্কুলগুলিতে সিক্সথ ফর্ম নামে এই রকম উঁচু শ্রেণী থাকে এবং তাহার ফল ভালই হয়।

আবার যাঁহারা কলেজের সঙ্গে এই শ্রেণীটি যুক্ত রাখিবার পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন ইহাতে বর্তমান শিক্ষাকাঠামোর গুরুতর পরিবর্তন না করিয়াই নূতন পরিকল্পনা ধীরে ধীরে কার্যকরী করিয়া তোলা চলিবে। এখন অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবস্থা আছে ম্যাট্রিক বা স্কুল ফাইন্যালের পর কলেজে দুই বৎসর ইন্টারমিডিয়েট ও তাহার পর বি. এ. ক্লাশ সুরু। এখন নূতন ব্যবস্থায় ইন্টারমিডিয়েট স্তর তুলিয়া দিলে কলেজগুলি দারুণ আর্থিক দুরবস্থার সম্মুখীন হইবে। তাহাদের ছাত্রসংখ্যার একটা মোটা অংশ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে। সুতরাং যে ছাত্রবেতনের উপর তাহাদের নির্ভর, তাহা চলিয়া গেলে কলেজগুলি ভাঙ্গিয়া যাইবে, বহু শিক্ষকের চাকরি যাইবে এবং দেশে প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি হইবে। স্কুলগুলির পক্ষে এই নূতন শ্রেণীর ব্যবস্থা নিতান্তই কঠিন হইবে কিন্তু কলেজগুলিতে এই ব্যবস্থা সহজেই চলিতে পারে। এই পরিবর্তনের মুখে কিছুদিন এই ক্লাসটি কলেজের মধ্যে থাকিলে এবং ইন্টারমিডিয়েটের সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসটা বি.এ. ক্লাসের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারিবে এবং আর্থিক ক্ষতিটা সামলাইয়া উঠিতে পারিবে।

সম্ভবতঃ দুই পক্ষের যুক্তির মধ্যেই যথেষ্ট জোর আছে। সম্ভবতঃ স্কুলের সঙ্গে এ ক্লাসটি যুক্ত রাখার পক্ষে যুক্তি অধিকতর সঙ্গত কারণ এ শ্রেণীটি মাধ্যমিক শিক্ষারই অঙ্গ। তবে ইহ নিয়া জোর করিবার কোন মানে নাই। প্রত্যেক রাজ্যসরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এই বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহাদের শুধু দেখিতে হইবে পরিবর্তনটি যেন সুচারুভাবে

সম্পন্ন হয় এবং বর্তমান স্কুল ও কলেজগুলিকে যতটা সম্ভব কম নাড়াচাড়া করিয়া যাহাতে এই কাজটি করা যায়।

এই নূতন প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণী খোলার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কেহ কেহ এ আপত্তি করেন যে, কমিশন ইতিপূর্বে বলিয়াছেন যে মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষার শেষে একটি মাত্র সাধারণ (পাব্লিক) পরীক্ষা হইবে কিন্তু প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর ব্যবস্থা হইলে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার পর আবার একবৎসর বাদে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর আর একটি পরীক্ষা অর্থাৎ সেই এখনকার মত দুটি প্রধান পরীক্ষা থাকিতেছেই। কিন্তু এখানে এ কথাটি ভুলিয়া যাওয়া হইতেছে যে, এই ব্যবস্থা সাময়িক। নূতন পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্পূর্ণ হইলে, মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরের অন্তে একটি মাত্র পরীক্ষাই থাকিবে। যতদিন পর্যন্ত না সব স্কুলগুলি ১১ শ্রেণী স্কুলে পরিবর্তিত হয়, ততদিন পর্যন্তই এ ব্যবস্থা চালু থাকিবে। আর তাহাও সব ছাত্রের এই পরীক্ষা দিতে হইবে না। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. ডিগ্রী লাভের জন্য পড়িতে যাইবে শুধু তাহারাই এই পরীক্ষা দিবে।

আবার কেউ কেউ আপত্তি করেন, এই নূতন প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাশের ব্যবস্থা করিতে যে ব্যয় হইবে তাহার চেয়ে একেবারে সব স্কুলগুলি ১১ শ্রেণী স্কুলে উন্নীত করিলে খরচ কম হইবে। এই যুক্তি ঠিক নয়। পাইকারী হারে সব স্কুলগুলিকে একই সময়ে উন্নীত করা সম্ভব হইবে না। এই নূতন প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণী সেই সেই স্কুলেই খোলা হইবে, যাহাদের এই নূতন শ্রেণী খুলিবার মত শিক্ষক, সরঞ্জাম ও যোগ্যতা আছে। সেই স্কুলগুলিতে আর একটি অতিরিক্ত শ্রেণী হিসাবে এ ক্লাস খোলা হইবে। যে স্কুলগুলিতে ১১ শ্রেণী খোলা হয় নাই, সে স্কুলের ছাত্ররা এই অতিরিক্ত শ্রেণীতে আসিয়া ভর্তি হইবে। নূতন করিয়া সব স্কুলে একাদশ শ্রেণী খোলার চেয়ে নিশ্চয়ই কম অসুবিধা হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে বৃত্তিশিক্ষাদানকারী (Professional) স্কুলগুলিতে ভর্তির নিম্নতম যোগ্যতা কি হইবে, তাহা নূতন করিয়া বিবেচনা করিবার প্রয়োজন আছে। বর্তমানে এই কলেজগুলিতে ভর্তির মান হইতেছে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশ। কিন্তু এই অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে এই যোগ্যতা যথেষ্ট নয়। কাজেই স্থির হইয়াছে, এই বৃত্তিমূলক কলেজে

ভর্তি হইতে হইলে ছাত্রকে সেই বিশেষ বৃত্তি সম্পর্কে মোটামুটি শিক্ষা পাইতে হইবে। ইহার জন্য এক বৎসরব্যাপী বিশেষ বিশেষ বৃত্তি-প্রবেশিকা শ্রেণী হইবে। ইহাতে ভর্তি হইতে হইলে নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী উচ্চতর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা পাশ করিতে হইবে, অথবা বর্তমান স্কুল ফাইন্যাল পাশ করিয়া নূতন প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা পাশ করিতে হইবে। বৃত্তি-প্রবেশিকা শ্রেণীগুলি যথাসম্ভব বৃত্তিমূলক কলেজগুলির কর্তৃপক্ষরা খুলিবেন এবং উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশ বিলোপ

বর্তমান কলেজে দুই বৎসরব্যাপী ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশে পড়িয়া পাশ করিলে, বি.এ. ক্লাশে ভর্তির ব্যবস্থা আছে। ডিগ্রী ক্লাশের প্রবেশিকা হিসাবেই এই স্তরের মূল্য, না হইলে ইহার কোন বৈশিষ্ট্য বা উপযোগিতা নাই। নূতন মাধ্যমিক শিক্ষাকে দেশের প্রয়োজনের পথে অধিকতর উপযোগী করিবার জন্যেই এক বৎসর বাড়ানো হয় আর ডিগ্রী কোর্সকেও পূর্ণতর করিবার উদ্দেশ্যে দুই বৎসর হইতে বাড়াইয়া তিন বৎসর করা হইতেছে। তাই ইণ্টারমিডিয়েট স্তরটি তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। মাধ্যমিক স্তরে এক নাগাড়ে ১১ বৎসর ও ডিগ্রীকোর্সেও এক নাগাড়ে ৩ বৎসর শিক্ষার ব্যবস্থা করায় সমগ্র শিক্ষাকে একটি সুসমন্বিত রূপ দেওয়ার এবং ভারতবর্ষের শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার সুযোগ পাওয়া যাইবে।

ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশগুলি তুলিয়া দেওয়ার ফলে যে সব কলেজে উপযুক্ত শিক্ষক, সরঞ্জাম ইত্যাদি আছে সেগুলি উচ্চতর তিন বৎসর কোর্স বিশিষ্ট ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হইবে, বাকী কলেজগুলি হইতে সেকেণ্ড ইয়ার ইণ্টার-মিডিয়েট ক্লাশ তুলিয়া দিয়া উচ্চতর সেকেণ্ডারী স্কুলের সঙ্গে যুক্ত অথবা এক পর্যায়ভুক্ত করা হইবে।

এই সংস্কারসাধন করিতে হইলে প্রত্যেক রাজ্য সরকার সেই রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়, সেকেণ্ডারী বোর্ড ও অন্যান্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি নিয়া ছোট কমিটি গঠন করিবেন। এই কমিটির কাজ হইবে প্রত্যেকটি ইণ্টার-মিডিয়েট কলেজ সম্পর্কে আলাদা আলাদা ভাবে বিবেচনা করা। কোন

কলেজের বিষয় যখন বিবেচিত হইবে তখন সেই কলেজের অধ্যক্ষকেও কমিটিতে কো-অপ্ট করা হইবে।

আর্থিক ক্ষতির আপত্তি

এই আপত্তি তোলা হইয়াছে, যে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশগুলি তুলিয়া দিলে বিশ্ববিত্থালয় এবং মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডগুলির বিষম আর্থিক ক্ষতি হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি বিশ্ববিত্থালয়ের অধীন ইণ্টারমিডিয়েট ছাত্রের সংখ্যা ৮০,০০০। ইণ্টারমিডিয়েটের ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাশ তুলিয়া দিলে বিশ্ববিদ্যালয় এই সংখ্যার একতৃতীয়াংশ ছাত্রের ফিসের টাকা হইতে বঞ্চিত হইবে। তা ছাড়া এই ইণ্টারমিডিয়েট ছাত্রদের কাছ থেকে পরীক্ষার ফীস্ বাবদও প্রায় ছয় লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয় হারাইবে। সরকার এই ক্ষতিপূরণ করিবার ব্যবস্থা যদি না করেন, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে নূতন পরিকল্পনা রূপায়ণে সাহায্য করা অসম্ভব হইবে।

এই যুক্তি অগ্রাহ্য করিবার মত নয় এবং সরকার এই সম্বন্ধে অনবহিত নন। সরকার ইতিমধ্যেই একটি শক্তিশালী গ্র্যাণ্টস্ কমিশন গঠন করিয়াছেন; এঁদের প্রধান কাজই হইবে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনায় কাহার কত অর্থসাহায্য প্রয়োজন তাহা নির্ধারণ করা ও তদনুযায়ী অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করা। যদিও এখনই কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়, তথাপি নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, সরকার একথা জানেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সংস্কার করিতে গেলে প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন এবং তাঁহারা এই বিষয়ে সাধ্যানুসারে যতটা সম্ভব অর্থ-সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাণ্টস্ কমিশনও এই বিষয়টি বিশেষ যত্নসহকারে বিবেচনা করিয়াছেন।

ছাত্র কমিয়া যাওয়াতে ফিসের টাকা বাবদ আয় কমিয়া যাইবে, এই বিষয়টি নিয়া একটু আলোচনা করা যাইতে পারে। ইহা তো ঠিকই যে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশ তুলিয়া দিলে প্রথমটায় ছাত্র কমিয়া যাওয়ায় ফিসের আয় কমিয়া যাইবে। কিন্তু এটাও ঠিক যে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ছাত্র সংখ্যা বাড়িয়া বর্তমানে যে ছাত্র আছে তাহার চেয়ে বেশী হইবে।

প্রাথমিক স্তর হইতেই ধরা যাক্। গত সাত বৎসরে এই স্তরে ছাত্রসংখ্যা ৭০ লক্ষ বাড়িয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা আরো দেড়গুণ হইবে আশা করা যায়। অর্থাৎ ১৯৬১ সালে এ স্তরের ছাত্রসংখ্যা তিন কোটী ৬০ লক্ষে পৌঁছিবে। মাধ্যমিক স্তরে ১৯৪৭ সনে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩০ লক্ষ, আর ১৯৫৭ সালে তাহা দ্বিগুণ হইয়াছে। এই হারে শিক্ষা বাড়িতে থাকিলে ১৯৬১ সনে মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে ছাত্রসংখ্যা এককোটি বিশ বা ত্রিশ লক্ষে দাঁড়াইবে। আর এই সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতেও ছাত্র বাড়িবেই। এমনিতেই ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩ সনের মধ্যে গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। কাজেই কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট স্তর তুলিয়া দিলে, আর ডিগ্রী স্তর এক বছর বাড়াইয়া তিন বছরের কোর্স প্রবর্তন করিলে ছাত্রসংখ্যা খুব কমিয়া যাইবে, এ আশঙ্কা অমূলক। বরং সম্ভবতঃ এই তিন বৎসরের কোর্স প্রবর্তিত হইলেও বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে এত ছাত্র ভর্তির জন্যে যাইবে যে তাহাদের সকলকে স্থান দেওয়া সম্ভব হইবে না। তাহা ছাড়া, এখন ক্রমেই এই উচ্চতম শিক্ষা তপশিলী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মধ্যেও ছড়াইয়া যাইতেছে। কাজেই ছাত্র কমিয়া যাইবার আশঙ্কা অমূলক। হয়তো কিছুদিন এটা হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষা-সংস্কারের জন্য এ সাময়িক ক্ষতি খুব সামান্য।

তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন

এটা স্বীকৃত যে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও পরীক্ষার মান বড় নীচু। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিবার কালে একজন কলেজের অধ্যক্ষ বলিয়াছেন যে, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পাশ ছেলের বিদ্যা বৃটিশ বিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ছাত্রের চেয়ে খুব বেশী নয়। এটা হয়তো কিছু অতিভাষণ, কিন্তু ইহা মানিতে হয় যে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে তুলনায় আমাদের শিক্ষা ও পরীক্ষার মান নিম্নতর। ইহার প্রতিকারের উপায় হইতেছে আমাদের বি.এ.-র কোর্স এক বছর বাড়াইয়া দেওয়া। পর পর অনেক শিক্ষা কমিশন এই সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু এ উপদেশ অনুযায়ী সংস্কার খুব সামান্যই হইয়াছে।

বর্তমানে ইণ্টারমিডিয়েট ও বি.এ. ক্লাশে ছাত্রদের নূতন শিক্ষাপদ্ধতির (স্কুল হইতে আসিয়া বা ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করিয়া) সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া নিতে প্রথম প্রথম বেশ কিছুটা সময় অপব্যয় হয়। তা ছাড়া ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের শেষে একবার, আবার বি.এ. (ডিগ্রী) স্তরের শেষে আর একবার,—এ দুই পরীক্ষায় ক্লাশের পড়াশুনার যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়। পরীক্ষার পর ফল বাহির হওয়া পর্যন্তই কয়েক মাস বৃথা যায়। কাজেই ইণ্টারমিডিয়েট স্তর তুলিয়া দিলে, এবং ডিগ্রী স্তর এক নাগাড়ে তিন বৎসরের করিলে বর্তমানের তুলনায় উচ্চ স্তরের শিক্ষার মান প্রবর্তন করার জন্য একটি সুসমন্বিত পাঠ্যসূচী তৈরী করিবার এবং দীর্ঘতর সময় একনাগাড়ে মন দিয়া লেখা পড়া করার সময় বৃদ্ধি করার সুযোগ পাওয়া যাইবে।

অবশ্য শুধুমাত্র তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান বাড়িয়া যাইবে এমন নয়। বর্তমানে বহু ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় যাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি এত কম যে শিক্ষার মান এদের জন্যেই নামিয়া যায়। এই রকম অযোগ্য ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দূরে রাখিবার ব্যবস্থা না করিলে কিছুতেই শিক্ষার মান বাড়ানো যাইবে না।

এই শিক্ষার মান উন্নয়নের সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল এবং এ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে নানা দিক থেকেই চেষ্টা করিতে হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার এ ব্যাপারে সহায়ক হইবে। কারণ নূতন পরিকল্পনায় সেকেণ্ডারী স্তরের শেষে উচ্চতর স্কুল ফাইন্যাল্ পরীক্ষায় পাশ করিয়াই অধিকাংশ ছাত্র নানা রকম জীবিকা উপার্জনের যোগ্যতা লাভ করিবে। তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ভীড় কমিবে। তাহা ছাড়া রুচি ও যোগ্যতা অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করাতে আশা করা যায় ছাত্রদের বুদ্ধি বিকাশের উৎকর্ষ ঘটিবে। যে ছাত্ররা নূতন স্কুল ফাইন্যাল পাশ করিয়া আসবে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণে যোগ্যতর হইবে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের শিক্ষার মান উন্নয়নের চেষ্টাও করিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অযোগ্য ছাত্র ভর্তি যাহাতে না হয়, সে দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বর্তমানে অধিকাংশ ছাত্রেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ঝোঁকে। তাহার কারণ বর্তমানে অধিকাংশ সরকারী চাকরিতে গ্রহণের ন্যূনতম যোগ্যতা হইল ডিগ্রী পাশ। ইহার দুইটি কুফল।

এক হইতেছে ভবিষ্যৎ সরকারী চাকরির আশায় অযোগ্য ছাত্রদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া। দ্বিতীয় হইল, অল্প মাহিনার সরকারী চাকরি নিয়া যখন কোন ছেলে দেখে তাহার উচ্চতর কর্মচারীরা তাহার সমানই পাশ বা তাহার চেয়েও কম পাশ তখন সে স্বভাবতই ক্ষুণ্ণ হয় এবং তাহার ফলে সরকারী অফিসে অবাধ্যতা ও শৈথিল্য দেখা দেয়। সরকার এসব গুরুতর অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্য একটি শক্তিশালী কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। আশা করা যায়, এই নূতন পরিকল্পনার পর উচ্চতর স্কুল ফাইন্যাল্ পরীক্ষা পাশই সরকারী চাকরির পক্ষে ন্যূনতম যোগ্যতা বলিয়া গৃহীত হইবে। তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় কমিবে এবং অযোগ্য ছাত্ররা দূরে থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মানেরও উন্নতি হইবে।

এই সঙ্গে ইহাও আশা করা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাঁহাদের বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করিবেন এবং সমস্ত ডিগ্রী কোর্স কালে ক্লাশে উপযুক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক ছাত্র বৎসর ভরিয়া কেমন কাজ করে তাহার সম্পূর্ণ রেকর্ড রাখা হইবে। শুধুমাত্র শেষ ডিগ্রী পরীক্ষাই তাহার যোগ্যতা বিচারের মাপকাঠি হইবে না।

এই সব কথা বিবেচনা করিয়াই নয়াদিল্লীতে ১৯৫৫ সনের ৮ই জানুয়ারী তারিখে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের সভাপতিদের সম্মেলনে এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়। তাঁহারা প্রস্তাব করেন—"মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের যে পরিকল্পনা এবং যে সব সুপারিশ করিয়াছেন তাহা বিশ্ববিদ্যালয় ও বোর্ডগুলির গ্রহণ করা উচিত। এ পরিকল্পনার প্রধান দুইটি বিষয় হইতেছে—

"(১) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা ১৭+বৎসর পর্যন্ত চলিবে। সমগ্র শিক্ষার একটি সুসমন্বিত পাঠ্যসূচী তৈরী করিতে হইবে।

(২) প্রথম ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য উচ্চতর স্কুল ফাইন্যাল পাশ করিয়া তিন বৎসরব্যাপী পাঠ্যসূচী শেষ করিয়া দিতে হইবে।

বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা হইতে নূতন উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষায় পরিবর্তন করার পূর্বে কতগুলি প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রয়োজন হইবে। নূতন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত সরঞ্জাম, স্থানের ব্যবস্থা ও উপযুক্ত সংখ্যক

যোগ্য শিক্ষকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদিও এই পরিবর্তন যত শীঘ্র সম্ভব সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা হইবে, তবুও ইহা সম্পূর্ণ করিতে কয়েক বৎসর অবশ্যই কাটিয়া যাইবে। এই মধ্যবর্তী সময়ে বর্তমান মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও নূতন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই দুই জাতীয় বিদ্যালয়ই পাশাপাশি চলিবে।

এই মধ্যবর্তী কয় বৎসর দুই রকম পরীক্ষারই ব্যবস্থা থাকিবে। যাহারা উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল ফাইন্যাল দিতে পারিল না তাহারা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাদিগকে এক বৎসরব্যাপী একটি প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীতে পড়িয়া একটি পরীক্ষা পাশ করিতে হইবে। এই প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণী হয় কলেজের সঙ্গে যুক্ত থাকিবে, না হইলে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খোলা হইবে। প্রথম ডিগ্রীকোর্স তিন বৎসরব্যাপী হইবে এবং ইহার জন্য একটি সুসংবদ্ধ পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করিতে হইবে। কন্-ফারেন্সের অভিমত, এই পরিবর্তন ১৯৬১ সালের মধ্যেই সম্পূর্ণ হইবে।

কনফারেন্স এই পরামর্শ দিতেছেন যে, যেখানে সম্ভব সেখানেই ১৯৫৬-৫৭ কলেজ আরম্ভের বৎসর (academic year 1956-57) হইতে বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণী খুলিবেন এবং ১৯৫৭-৫৮ সালের কলেজ আরম্ভের বৎসর হইতে তিন বৎসর ব্যাপী ডিগ্রী কোর্সের পড়াশুনা সুরু হইবে। যাহারা উচ্চতর সেকেণ্ডারী পরীক্ষা পাশ করিবে তাহারা যাহাতে ১৯৫৮-৫৯ সালে তিন বৎসর ব্যাপী ডিগ্রী কোর্সের ফার্ষ্ট ইয়ারে ভর্তি হইতে পারে সে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কনফারেন্সের অভিমত এই যে, এই নূতন পরিকল্পনার রূপায়ণে সংশ্লিষ্ট শিক্ষায়তনগুলিকে রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত অর্থ সাহায্য করিবেন। কনফারেন্স সে জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারকে অনুরোধ করিতেছে যাহাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নকালে এ জন্য উপযুক্ত অর্থের বরাদ্দ করা হয়।"